হামেদ আবদেল-সামাদ

ইসলামি ফ্যাসিবাদ

ভাষান্তর

শ্রীজীব বিশ্বাস

মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ

হামেদ আবদেল-সামাদ

ইসলামি ফ্যাসিবাদ

ভাষান্তর

শ্রীজীব বিশ্বাস
মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ

সংশয়
চিন্তার মুক্তির আন্দোলন

ইসলামি ফ্যাসিবাদ

হামেদ আবদেল-সামাদ

ভাষান্তর

শ্রীজীব বিশ্বাস

মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ

© হামেদ আবদেল-সামাদ

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

প্রথম বাংলা ভাষান্তর প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০২১

প্রচ্ছদ ও ইবুক তৈরি: ধ্রুবক

Islamic Fascism, by Hamed Abdel-Samad

Bangla Translation, by Srijib Biswas, Abdullah Al Masud

First Bangla eBook Published in **February, 2021**

eBook Created by: Dhrubok

Disclaimer

**** Translators do not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of this book. @Srijib Biswas and Abdullah Al Masud have translated and compiled ‘Islamic Fascism’ into Bengali from English and Arabic version of ‘Islamic Fascism’ for non-profit, educational in favour of fair use.**

**** The content of the book (soft copy and hard copy) is publicly available only in the website ‘Amazon.com’.**

**** Any form of redistribution in a commercial way is prohibited and punishable.**

For the mother I love, who begged me not to write this book, knowing I could never do what she asked.

যে মাকে আমি ভালবাসি তার জন্য, এ বই না লিখতে যিনি কাতর অনুরোধ করেছিলেন, তিনি জানতেন তিনি যা বলছেন আমি কখনই তা করতে পারব না।

অনুবাদকের অনুভূতি

ধর্ম মানুষকে পালন করে না,

মানুষই ধর্মকে পালন করে।

--শ্রদ্ধেয় আরজ আলি মাতুব্বর

মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালতে শিখল সেদিনই সভ্যতার আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই আগুন মানুষের জীবনেও জ্বলল। তার কৃতিত্ব ধর্ম এবং রাজনীতির। ইতিহাসের আদিলগ্নে ধর্মের প্রবেশ ভয়কে অবলম্বন করে। প্রকৃতির আঙিনায় মানুষ ছিল একান্ত অসহায়। যেকোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে আকুল হয়ে খুঁজেছে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে, যে তাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে। নিজেরই (আতঙ্কিত) কল্পনা দিয়ে সে সৃষ্টি করেছে এক সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান (Omnipotent, Omniscient, Omnipresent) এক সত্ত্বাকে- ঈশ্বর। শুরু হয়েছে ধর্মের পথচলা। আবির্ভাব হয়েছে বহু ধর্মপ্রবর্তকের। তাঁরা তাঁদের মনীষা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মানুষের জীবন বিধান, স্থির করেছেন কর্তব্য-অকর্তব্য, আচার-ব্রত, ন্যায়-অন্যায়। তাঁরা এবং তাদের অনুসারীরা মানুষকে তাদের মতাবলম্বী করতে চেয়েছেন। এখানেই এসেছে সমস্যা। এক ধর্ম অন্য ধর্মকে সরিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে; কখনও জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে, কখনও বলপ্রয়োগ করে। একইসাথে ইতিহাসের পথ বেয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে সমাজ, রাষ্ট্র। রাষ্ট্র শাসনের প্রয়োজনে এসেছে রাজনীতি। তার বহু রূপ; ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ। শুরু হল একের সাথে অন্যের দ্বন্দ্ব। ক্ষমতার লড়াই। কখনও ধর্ম এবং রাজনীতি আলাদাভাবে চলেছে, আবার কখনও বা একে অপরকে আঁকড়ে ধরেছে। মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা, আধিপত্য।

বর্তমান পৃথিবীতে বহু দেশে বিভিন্ন ধরণের শাসনতন্ত্রের উপস্থিতি। প্রত্যেক তন্ত্রেরই কিছু মন্দ দিক আছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অধিকাংশ দেশের মানুষ দেখেছে গণতন্ত্র অপেক্ষাকৃত মন্দের ভালো

(Best among the worst)। শাসনতন্ত্র নিয়ে বহু দেশে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে এখন গণতন্ত্র গৃহীত হয়েছে। তবু বহু দেশ আজও একনায়কতন্ত্রের অধীনে, কখনওবা গণতন্ত্রের মোড়কে সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে একনায়কতন্ত্র। কোথাও ধর্ম রাষ্ট্রের সাথে হাত মিলিয়ে মানুষকে শাসন করেছে, সেখানে ধর্ম আধিপত্য বিস্তার করে সমাজে নামিয়ে এনেছে অত্যাচার, নিপীড়ন। ভূলুন্ঠিত হয়েছে মানবাধিকার, পিষে গিয়েছে নারীর সম্মান। অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, ধর্ম এবং রাষ্ট্র যদি আলাদাভাবে চলে তাহলেই সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি আসতে পারে, মানুষ নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারে তার মনের কথা, জীবনধারণ করতে পারে তার রুচি, পছন্দ এবং ইচ্ছা অনুযায়ী।

প্রতিটি ধর্মই জন্মলগ্নে আত্মপ্রকাশ করেছে শান্তির বার্তা নিয়ে, শ্বেত পতাকা উড়িয়ে। ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করেছে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যাচার, প্রতারণা। একের উপর অন্যের আধিপত্য নিয়ে হানাহানি, যুদ্ধ, নরহত্যা। যে ধর্মকে মানুষ সৃষ্টি করেছিল বাঁচতে চেয়ে, সেই ধর্মই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে তার মুণ্ড। যুগে যুগে পৃথিবীতে এসেছেন বহু সমাজ সংস্কারক। তাদের হাত ধরে বহুধর্মই আজ অনেকাংশে জঞ্জাল মুক্ত, অনেকটা সহনীয়। একমাত্র ব্যতিক্রম ইসলাম। প্রায় ১৪০০ বছর আগে এর আবির্ভাব। জন্মমুহূর্ত থেকেই তার চরিত্রে যতটা ধর্ম, তার থেকে অনেক বেশি রাজনীতি। ধর্মের মোড়কে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার। সারা পৃথিবীকে সে স্পষ্ট দু'ভাগে ভাগ করে - মুসলিম এবং কাফের। ইসলামের মতে, কাফেরদের পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার নেই; হয় সে ইসলাম কবুল করবে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইসলামের নবী মোহাম্মদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার ধর্মপ্রচারের জন্য যুদ্ধ করাকেই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন। তিনি তাঁর সাহাবী তথা অনুসারীদের বলেছিলেন: "আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর সালাত (নামাজ) কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তাঁরা যদি এ কাজগুলো করে তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের

বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। (সহীহ্ আল বুখারী, হাদিস নম্বর: ২৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

এমন ধরনের চিন্তাই তো ফ্যাসিবাদের মর্মকথা! হয় তুমি আমার অধীন অথবা তুমি অস্তিত্বহীন। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রায় ৯৯ শতাংশ মুসলমানের এটাই মানসিকতা। ইসলাম মানুষকে শেখায় ঘৃণা, হিংসা ও বৈষম্য। এ বৈষম্যটা হয় মূলত অমুসলিমদের প্রতি, এবং বিশেষত মুসলিম নারীদের প্রতি (অথচ নির্লজ্জ মুসলিম পুরুষেরা বলে 'ইসলাম নারীকে দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান'!) মানুষের দীর্ঘকালের চেষ্টা, পরিশ্রম, ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং প্রতিভার নির্যাস আজকের সভ্যতা। ইসলাম সর্বাংশে এই সভ্যতাকে ঘৃণা করে। ফিরে যেতে চায় সপ্তম শতাব্দীর অন্ধকারে, গায়ের জোরে সঙ্গী করতে চায় বাকি অংশের মানুষকে। ইসলামের ঈশ্বর আল্লাহর কথাই ইসলামিক পুরুষদের শেষকথা, এর কোন ব্যত্যয় নেই। অর্থাৎ নিখাদ ফ্যাসিবাদ। আশার কথা, অন্যান্যদের সাথে ইসলামী দুনিয়ারই বিভিন্ন কোন থেকে বহু মুখ আজ নিষ্কম্প গলায় ইসলামিক ফ্যাসিবাদ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, মৌলবাদকে চ্যালেঞ্জ করছেন। ইসলামিক তরবারির সামনে কলম হাতে দাঁড়িয়ে গেছেন অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন, অভিজিৎ রায়, নিলয় নীল, মুশফিকুর রহমান বাবু, ওয়াফা সুলতান, হামেদ আবদেল সামাদ এমন বহু মুখ। এদের অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন ইসলামিক তরবারির আঘাতে, আর অনেকেই অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন, কিংবা মৃত্যু হুমকির কারণে দেশান্তরী।

মিশরের মাটি থেকে উঠে আসা হামেদ আবদেল সামাদ তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণ, গভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস পরিক্রমা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ইসলাম আর ফ্যাসিবাদ একইসত্ত্বা। এ বইয়ে তাঁর চিন্তা প্রতিফলিত। ইতিমধ্যেই বইটি ছয়টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। একমাত্র উদ্দেশ্য, মানুষ সত্যকে জানুন। নিজে নিরপেক্ষভাবে অনুভব করুন, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। মানুষই পারে এই সবুজ সুন্দর পৃথিবীকে স্বর্গ (জান্নাত) বানাতে, আবার সেই পারে তাকে অন্ধকার নরকে (দোজখ) পরিণত করতে।

এ বইটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং এটি অনুবাদ করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের বন্ধু যুক্তরাজ্য প্রবাসী অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার রিক্তা মার্টিনেজকে ধন্যবাদ না দিলে সেটা বড় অন্যায় হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মূল আরবি বইটি থেকে ইংরাজী সংষ্করণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত না থাকায় আরবি সংস্করণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিও বাংলা সংস্করণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যাতে বাঙালী পাঠক মূল বইটির স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। অনুদিত এ বইটির প্রুফ দেখে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন প্রিয় মানস বিশ্বাস; সেইসাথে বইটির প্রচ্ছদ এবং ইবুক তৈরি করে দিয়েছেন "ধ্রুবক"। আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদের তিন’জনকেই জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা।

সত্যি বলতে কী, হামেদ আবদেল সামাদের ইসলামিক ফ্যাসিবাদ (Islamic Fascism) বইটি পড়ে মনে হয়েছে, ইসলাম সম্পর্কে যেন নতুন করে আরও অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমাদের মনে হয়েছে, এটি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে অবশ্যই পৌঁছানো উচিত। ইসলাম সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে জানার জন্য, ইসলামের ইতিহাস বোঝার জন্য, মডারেট মুসলিম কি জিনিস এবং মডারেট ইসলাম বলতে আসলে কিছু হয় কিনা সেসব প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্যেও এ বইটি সকলের পড়া প্রয়োজন। আর সেই অনুভূতি থেকেই আমাদের এটি অনুবাদ করা। একটাই চাওয়া, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য জানুন এবং নিজেরাই বিচার করুন।

সবশেষে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের একটি কবিতা দিয়ে শেষ করছি:

বই / হুমায়ুন আজাদ

বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

যে-বই জুড়ে সূর্য ওঠে
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
সে-বই তুমি পড়বে।
যে-বই জ্বালে ভিন্ন আলো
তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো
সে-বই তুমি পড়বে।
যে-বই তোমায় দেখায় ভয়
সেগুলো কোনো বই-ই নয়
সে-বই তুমি পড়বে না।
যে-বই তোমায় অন্ধ করে
যে-বই তোমায় বন্ধ করে
সে-বই তুমি ধরবে না।
বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

শুভেচ্ছা সহ—
শ্রীজীব বিশ্বাস
মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ

ভূমিকা

মৃত্যু চাই

একদিন ফেসবুকে ঘুরতে থাকা ডিজিটালি পরিবর্তিত একটি ছবি দেখলাম—তাতে দেখা যাচ্ছে একজন দাড়িওয়ালা লোক তীব্র মর্মভেদী চোখে একটি প্লাকার্ড তুলে ধরে আছে, যেখানে লেখা আছে, "যারা ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে তুলনা করে তাদের শিরচ্ছেদ কর"। এটি দেখে আমি খুবই ব্যথিত হয়ে নিজের মনেই হাসলাম। কয়েকমাস পরেই আচমকা সেই হাসি আমার গলায় আটকে গেল। আমি দেখলাম আমার নিজের ছবিই এবার ঘুরছে, যেখানে লেখা, "মৃত্যু চাই" (আমার)।

জুন ৪, ২০১৩ আমি কায়রোতে একটি বক্তৃতা করেছিলাম মিশরে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বিষয়ে। তারই ফলশ্রুতিতে এই হত্যার আহ্বান। আমি বলেছিলাম ইসলামে ফ্যাসিবাদী মানসিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থানের বহু আগে, অর্থাৎ আমি বোঝাতে চেয়েছি ফ্যাসিবাদী মানসিকতা আসলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ফসল—ইসলামের শুরুতেই এই মনোভাব আরবে ধর্মীয় বহুত্ববাদকে বিনষ্ট করে। ইসলাম আদি লগ্নেই কোনরকম বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহিষ্ণুতা না দেখিয়ে, সারা পৃথিবীর উপর প্রভুত্বের ক্ষুধা নিয়ে তার অনুসারীদের সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করে। ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্য সব বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য ফ্যাসিবাদী মানসিকতার কারণে আমি একে বলেছিলাম "ইসলামোফ্যাসিবাদ" (Islamofascism)।

বক্তৃতার অংশবিশেষ অনলাইন প্রচার করা হয়, যার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দেয়। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইসলামি পণ্ডিতদের একটি দল গঠিত হয় এবং তারা আমার যুক্তি খণ্ডন করতে সরাসরি টিভি সম্প্রচারে অংশ নেয়। কোরআনের অজস্র উদ্ধৃতি এবং নবীর জীবনী উল্লেখ করে তথাকথিতভাবে তারা প্রমাণ করতে চান, ইসলাম বহুত্ববাদ এবং বিরুদ্ধ মতকে মান্যতা দেয়। ঠিক তারপর তারা আলোচনা করেন ধর্ম অবমাননার জন্য আমাকে কত কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়। অতি দ্রুত সর্বসম্মতিক্রমে তারা সিদ্ধান্ত করলেন আমাকে

হত্যা করা উচিৎ। শুধুমাত্র মতানৈক্য হল কিভাবে তা করা হবে এবং কে আমাকে হত্যা করবে সেই বিষয়ে।

তাদের মধ্যে মাত্র একজন ইসলামিক স্কলার, আপাতভাবে নরমপন্থী, তিনি বললেন আমাকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিৎ অনুশোচনা প্রকাশ করার জন্য এবং ইসলামে ফেরার জন্য। তবে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বললেন, আমি যদি প্রত্যাখ্যান করি তাহলে আমাকে হত্যা করা হবে। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আল-গামা আল-ইসলামিয়া (al-Gama'a al-Islamiyya)-র দু'জন নেতা এবং প্রখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আমার তাৎক্ষণিক মৃত্যু দাবি করলেন, কারণ তারা দাবি করেন আমার বক্তৃতায় শুধু ইসলামেরই অবমাননা হয়নি, সেইসঙ্গে নবীকেও অপমান করা হয়েছে। তাই সামান্য অনুশোচনা প্রকাশ যথেষ্ট নয় এবং আমাকে গুলি করার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। এই মতের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদের জীবনের একটি গল্প বললেন।

একদিন নবীজী মসজিদের বাইরে এক মহিলাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি ভিতরে প্রার্থনারত মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মধ্যে কে এই মহিলাকে হত্যা করেছে। একজন অন্ধ লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রসুল, আমি করেছি। এই নারী ছিল আমার ক্রীতদাসী, এবং তার দুই সন্তান আমার কাছে মূল্যবান মুক্তার মতো। কিন্তু গতকাল সে আপনাকে অপমান করেছে। আমি তাকে অনুরোধ করলাম সে আবার যেন আপনাকে অপমান না করে। কিন্তু সে আবার একই কথা বলতে থাকল। সহ্য করতে না পেরে আমি তাকে হত্যা করি”। একথা শুনে নবী মসজিদে উপস্থিত সবাইকে বললেন, “তোমরা সবাই সাক্ষী থাক, সঙ্গত কারণেই এই নারীর রক্ত ঝরেছে”। নবীকে যারা অপমান করে, মুসলমানরা সর্বদাই এই গল্প বলে তাদের হত্যাকে বৈধতা দেয়—কোন বিচার ছাড়াই বা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ছাড়াই।

অল্প কয়েকদিন পর মিশরের প্রভাবশালী সালাফি (অতি উগ্রপন্থী ধর্মপ্রচারক যিনি বিশ্বাস করেন সমস্ত মুসলিমের উচিৎ চৌদ্দশ' বছর আগে নবী মহম্মদ এবং তাঁর প্রথম অনুসারীরা যেভাবে জীবনধারণ করতেন ঠিক তেমনিভাবে জীবনধারণ করা।) আবু ইশহাক আল-হিউয়েনি (Abu

Ishaq al-Heweny) এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে আমার অন্যায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করলেন। (আল-হিউয়েনি প্রায়ই জার্মানীতে এসে বাস করেন। তখন তিনি দেশের সালাফিদের উপদেশ-নির্দেশ দেন। তার শিষ্যদের মধ্যে একজন ধর্মান্তরিত পিয়ের ভোগেল।) সেখানে বসেই তিনি ঘোষণা করলেন তাদের দু'জনের মধ্যে একজন রক্ত-প্রতিশোধের নীতি কার্যকর করবে (কতল করবে)। এইসব পণ্ডিতরা এমন আবদ্ধ মতাদর্শের বৃত্তে ঘুরপাক খায় যে তারা কখনো বোঝেই না, তাদের এই ধরণের আচরণই আমার যুক্তিকে আরও শক্তিশালী করে। তারা তাদের মহান নেতা মহম্মদকে এত ভক্তি সহকারে এবাদত করে যে কেউ তাঁকে আক্রমণ করলে—এমন কি মৌখিকভাবেও; তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা যাকে সত্য বলে মনে করে সে বিষয়ে সামান্য দ্বিমত প্রকাশ করলেই তারা হত্যা করা উচিৎ বলে বিশ্বাস করে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণকে ইসলামি ফ্যাসিবাদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

এমনকি মিশরীয় আইন অনুসারেও যারা আমার মৃত্যু চেয়েছিল তাদের তখনই গ্রেপ্তার করা উচিৎ ছিল, কিন্তু গোঁড়া মৌলবাদী মোহামেদ মোরসি (Mohamed Morsi)—যিনি তখন দেশের প্রেসিডেন্ট—তার বিরোধীদের ভীতির মুখে রাখতে চাইলেন। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপক যিনি আমার মৃত্যু চেয়েছিলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে ওই একই ব্যাক্তি বিরোধী রাজনৈতিক নেতা মোহামেদ এলবারাদেইকে (Mohamed ELBaradei) হত্যার ডাক দিয়েছিলেন; সেক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অনলাইনে আমাকে হত্যা করার ডাক ভয়ঙ্কর গতিতে বাড়ছিল। তিউনিসিয়াতে ইসলামবাদীরা আমার বক্তৃতার কিছু অংশকে কাজে লাগিয়ে দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করে তুলল, আমারই কথা তাদের সমালোচকদের মুখে বসিয়ে দিল তাদের কণ্ঠরোধ করতে। আর বলতে লাগলো "যারা ইসলামকে ফ্যাসিজম-এর সাথে তুলনা করতে চায়, প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের উচিৎ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো"। কায়রোতে আমার দেওয়া বক্তৃতার কারণে পরবর্তী ঘটনাবলী আমাকে বাধ্য করল বেশ কয়েক সপ্তাহের জন্য লুকিয়ে থাকতে। তাই জার্মানীতে ফেরার পর থেকে আমি পুলিস প্রহরায় থাকি। এমনকি এ

দেশেও ধর্মোন্মাদরা আমাকে হত্যা করতে চায়। জার্মানীর তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী গুইডো ওয়েস্টারওয়েল (Guido Westerwelle) একটি প্রেস কনফারেন্সে আমাকে হত্যার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টির নিন্দা করেছিলেন, মিশরীয় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিলেন আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে; তবুও এক সপ্তাহ পরেই, মোরসি একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আসেম আবদেল মাজেদকে (Assem Abdel Maged) আমন্ত্রণ জানান, যিনি আমার মৃত্যুর দাবিকারীদের অন্যতম নেতা। মোরসি ক্যামেরার সামনে তাকে আলিঙ্গন করেন। মিশরের সেনাবাহিনী মোরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করলে ওয়েস্টারওয়েল "গণতান্ত্রিক যুদ্ধের" কথা মনে করিয়ে দেন, গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় শুধুমাত্র সুষ্ঠু নির্বাচন, তাহলে প্রাক্তন মন্ত্রী হয়ত ঠিক ছিলেন—কিন্তু গণতন্ত্রের অর্থ তার থেকে অনেক বেশী । গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, একটি মানসিক গঠন যার থেকে মোরসি এবং তার মুসলিম ব্রাদারহুড বহু আলোকবর্ষ দূরে ছিল এবং এখনও আছে।

মোরসির ক্ষমতাচ্যুতির পরে, যে কোন কারণেই হোক, যে দুই নেতা আমাকে হত্যার ডাক দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। যে তিনটি টেলিভিসন কেন্দ্র হত্যার জন্য উসকানি প্রচার করেছিল, সেনাবাহিনীর নির্দেশে সবকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং ভাগ্যের পরিহাসে—রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র আল-আহরামে, আসেম আবদেল মাজেদ-এর ছবি প্রচারিত হয়—যেখানে এবার লেখা হয় "সন্ধান চাই" (Wanted)।

আজ পর্যন্ত আমি মৃত্যু হুমকি পাই। ভাল হত যদি ধর্মোন্মাদরা শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকাকালীনই বিপজ্জনক হত, কিন্ত ইসলামিস্টরা যারা নিজেদেরকে সমস্ত কিছুর শিকার বলে মনে করে তারা আরও বেশী ভয়ঙ্কর এবং তাদের বিষয়ে আগে খুব কমই বোঝা যায়। নিজেকে নিয়ে আমার ভয় খুবই কম, এবং আমি লিখছি ও বক্তৃতা করছি—আমি উদ্বিগ্ন শুধু মিশরে আমার পরিবারের মানুষদের জন্য, যারা হুমকির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আর আমার জন্য নিজেদেরকেই গালি দিচ্ছে।

ধর্মোন্মাদরা আমার চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তারা কখনই আমার চিন্তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে পারবে না। আমার বিরুদ্ধে

অপপ্রচার মিশরে এবং অন্যান্য আরব দেশে বরঞ্চ আমার পাঠকসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে বিপুলভাবে, আমি অকুন্ঠ সমর্থন পেয়েছি এবং আমার ঘনিষ্ঠরা আরও বেশী আমার সাথে একাত্ম হয়েছেন। জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া থেকে বহু মানুষ একাত্মতা প্রকাশ করে আমাকে ই-মেল করেছেন; অনেকেই আমাকে তাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন। মিশর থেকে ফেসবুকে আমার যত মেসেজ এসেছিল তার মধ্যে একটি আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। একজন লিখেছিলেন, "আমাকে আপনার সাথে এবং আপনার চিন্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সন্ত্রাসীদেরকে ধন্যবাদ, এগিয়ে চলুন"।

এই বইতে আমার অন্যতম চেষ্টা থাকবে, ইসলামের সাথে ফ্যাসিবাদের সম্পর্ক তুলে ধরার, যদিও ইসলামের সাথে ফ্যাসিবাদের তুলনা আমাকে আবার ভীমরুলের চাকে ঠেলে দেবে। বস্তুত, এই বইয়ের প্রতি তারা যত বেশী হিংস্র প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তত বেশী তথাকথিত নরমপন্থী মুসলিমদের মুখোশ খসে পড়বে, সেইসঙ্গে গণতন্ত্রের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের ভানও প্রকাশিত হবে।

ইসলামি ফ্যাসিবাদে, আমি ইসলামের সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্টের সাথে ফ্যাসিবাদের তুলনা করেছি। একটি অধ্যায় বিশেষভাবে নিবদ্ধ মুসলিম ব্রাদারহুডের উৎপত্তি এবং বিবর্তন নিয়ে, বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ইউরোপে ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সাথে এর আদর্শগত এবং কর্মপদ্ধতিগত বন্ধন নিয়ে। মুসলমানদের সাথে সাথে, যারা ইউরোপের অতীতে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ, তারা এই তুলনায় বিরক্ত বোধ করতে পারেন, হয়ত অপমানিতও বোধ করবেন; বহু ইসলাম-বিরোধী এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধীও আপত্তি তুলতে পারেন এই ভেবে যে এই তুলনার দ্বারা বর্তমানকে ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত করা হচ্ছে অথবা বর্তমান পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি জার্মানীতে ঐতিহাসিক আর্নস্ট নোলট (Ernst Nolte) হলোকস্টই একমাত্র ঘটনা কি না এ প্রশ্ন তুলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এবং অন্তিম সমাধান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের গুলাগ এবং গণহত্যার প্রত্যুত্তর।

দার্শনিক জুর্গেন হেবারমাস (Jurgen Habermas) নোলট-এর তুলনার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন এই পুনর্মূল্যায়নকারী জার্মান “জাতীয়তাবোধ”কে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন এবং অনৈতিক অতীতকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। একনায়কতন্ত্রের বেশীরভাগ তত্ত্বই স্টালিনবাদ এবং নাৎসীবাদের তুলনার উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন এই দুই একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাবিন্যাস এবং বিপুল গণহত্যার প্রসঙ্গ আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটার সাথে অন্যটার তুলনা চলে আসে—কিন্তু তুলনা করার অর্থ সমান করা নয়।

যদিও প্রাথমিক বিচারে ফ্যাসিবাদের ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যকে ১৪০০ বছরের প্রাচীন একটি ধর্মের সাথে তুলনা করা একটু বেশি বেশি মনে হতে পারে, তবে এটি বুঝতে হয়ত সহজ হবে যদি লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক ইসলাম আর ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদ প্রায় একই সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল, ফ্যাসিবাদের অতীত সংস্কৃতিকে এবং রাজনৈতিক বর্তমানকে সামনে রেখে। ইটালি কিংবা জার্মানী, কোন দেশেই ফ্যাসিবাদ শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়নি, এর মূল শত শত বছরের প্রাচীন, ইসলামের মূলের ক্ষেত্রেও একই। এই বইয়ের একটি অধ্যায় ইসলামের এই ঐতিহাসিক ফ্যাসিবাদকেন্দ্রিক উৎসকে প্রকাশ করার জন্য নিবদ্ধ, ব্যাখ্যা করা হয়েছে এর প্রাথমিক ইতিহাস যা আজও ইসলামি বিশ্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, আলোচনা করা হয়েছে ইসলামের ইতিহাসে বিশিষ্ট চিন্তবিদদের সম্বন্ধে, বিশেষত সেই সময়ের কথা যখন তারা সহানুভূতি সম্পন্ন শ্রোতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জিহাদের ধারণা, এর সাথে ইসলামি যৌন নৈতিকতা, সন্ত্রাসবাদ, শিয়া ফ্যাসিবাদ, এবং ইউরোপিয়ান ইসলাম বিষয়ে—কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে রাজনৈতিক ইসলামের নীতিসমূহ, সবই ফ্যাসিবাদের প্রাথমিক ধারণার সাথে মিলে যায়।

অধ্যায় ১
বিসদৃশ জুটি?
সাম্প্রতিক ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ ও ইসলামপন্থা

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ একটি রাজনৈতিক ধর্ম (Religion)। এর অনুসারীরা বিশ্বাস করে তারাই চূড়ান্ত সত্যের অধিকারী, যে সত্যের মহামহিম অভ্রান্ত নেতা সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে পবিত্রতার বলে বলীয়ান হয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করবেন। ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ তার অনুসারীদের ঘৃণা এবং হিংসায় দূষিত করে তোলে, পৃথিবীকে ভাগ করে বন্ধু ও শত্রুতে, এবং যারা এর বিরোধিতা করে তাদের উপর কঠিন প্রতিশোধ নেয়। এটি বিরোধিতা করে আধুনিকতার, সভ্য মূল্যবোধের, মার্ক্সবাদের এবং ইহুদীদের; অথচ গৌরবান্বিত করে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে এবং আত্মত্যাগকে—এমনকি ফ্যাসিবাদের পথে শহীদ হওয়াকে।

আধুনিক ইসলামপন্থা এই সকল বৈশিষ্ট্যই বহন করে, যদিও ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯২০ দশকে। এ দুটি মতাদর্শ-ইসলামপন্থা এবং ফ্যাসিবাদ এর উৎপত্তি হয়েছে যথাক্রমে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলিমদের অপমানিত হওয়ার বোধ থেকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালি এবং জার্মানির পরাজয়ের বেদনাবোধ থেকে। ইসলামপন্থা এবং ফ্যাসিবাদকে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, যেমন একটি প্রবল প্রতিপত্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্য তৈরি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দুনিয়াজুড়ে প্রভাব বিস্তার করার স্বপ্ন, এবং একইসাথে তাদের শত্রুদের দমন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে আকাঙ্ক্ষা তাদের বিশ্বাস করায় যে, তাদের শত্রুদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। একটি আন্দোলন বিশ্বাস করে নিজ মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে, আর অন্যটি বিশ্বাস করে মানবজাতির বিরাট এক অংশের [অর্থাৎ অমুসলিমদের] উপর ইসলামের চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্বে।

বেনিটো মুসোলিনি যখন ইটালিতে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবময় দিন ফিরিয়ে আনার। সম্রাট জুলিয়াস সিজার কর্তৃক অর্ধ পৃথিবী শাসন করার

সময়কার সেই গৌরব। মুসোলিনির উত্থানের অল্প কয়েক বছর পরেই, হাসান আল-বান্না (Hassan al-Banna) ঠিক একই ধরণের ইচ্ছা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম ব্রাদারহুড, সেইসঙ্গে উসকে দিলেন নবী মহম্মদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার সেই গৌরবময় স্মৃতিকে যার সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল অর্ধ পৃথিবী পর্যন্ত। তিউনিসীয় বংশোদ্ভূত ফ্রান্সের লেখক আবদেল ওয়াহাব মেদ্দেব (Abdelwahab Meddeb) তার "ইসলামের রোগ" বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, ইসলামি বিশ্বের প্রধান সমস্যা হলো মধ্যযুগে তাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সেটির পতন হওয়াকে তারা মেনে নিতে পারছে না। তারা তাদের ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটও ফিরে পাচ্ছে না, কিন্তু সবসময়ই সেটা ফিরে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, এবং সবসময়ই তারা দুনিয়াকে শাসন করার স্বপ্ন দেখে। মুসলিমরা যে গৌরবোজ্জল অতীত নিয়ে গর্ববোধ করে তার আর আজকের দিনের কষ্টদায়ক ও হতাশাজনক বর্তমানের মধ্যে, এমন ভাবনা সুস্পষ্ট বৈপরীত্যের জন্ম দেয়। আর এটি স্বভাবতই পাশ্চাত্যের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে যারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করেছে, অথচ পৃথিবীর প্রকৃত সেরা জাতি- যাদেরকে মানুষের কল্যাণে তৈরি করা হয়েছে (অর্থাৎ মুসলিম)- তাদের বদলে ওরাই আজ পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এভাবেই ঘৃণা আক্ষরিক রূপ লাভ করে যেমনটি বলেছেন ফ্রেডরিক নিৎসে, ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এমন একদল লোকের থেকে যারা নিজেদেরকে তাদের আশপাশের এবং জগতের অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। মেদ্দেবের মতে, এ এক দীর্ঘস্থায়ী অসুখ যার উৎপত্তি হয়েছে ইতিহাস এবং পৃথিবীর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি থেকে। এক আদর্শবাদী অতীতের সাথে মিলে এই অসুখ সৃষ্টি করেছে ইসলামি ফ্যাসিবাদের অন্যতম চালিকা শক্তিকে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রত্যেক ইসলামিক আন্দোলন তার বক্তব্যের মধ্যে অসহায় মানুষের কথা আর পৃথিবীকে শাসন করার স্বপ্নের কথা বারবার তুলে ধরে।

নব্য ফ্যাসিবাদের শক্তির স্তম্ভ

ইতালীয় দার্শনিক, প্রাচীন লিপির অর্থ উদ্ধারকারী ও শিক্ষাবিদ এম্বার্তো ইকো তার Five moral pieces বইয়ে ফ্যাসিবাদের প্রাথমিক অবস্থার

চৌদ্দটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে একটি হচ্ছে “প্রথার উপাসনা করা”। আর এই প্রথার উপাসনা ফ্যাসিবাদীকে মনে করায় যে, সত্য হচ্ছে স্থির ও অপরিবর্তনীয় বিষয়। আর এর মাধ্যমে তারা বৌদ্ধিক অগ্রগতির সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় এবং সত্য জানার জন্য সংশয়, গবেষণা ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়াকেও তারা নাকচ করে দেয়। ফ্যাসিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সত্য হচ্ছে এমন জিনিস যার ওপর জাতির লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয় স্বাধীন চিন্তা কিংবা পড়াশোনা করা ব্যতিরেকেই।

প্রথার পূজা করা ইসলামি চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে যা কিছু জানার তার সবই আছে অমোঘ, অলঙ্ঘনীয় কোরআনে। কোরআনের মধ্যে মানুষের যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন তার সবটুকুই রয়েছে। এমনকি ইসলামের দ্বিতীয় সারির কিতাব যেমন সুন্নাহ, তাফসীর ও চার মাজহাবের জুরিসপ্রুডেন্স এসব কিছুকেও পবিত্র মনে করা হয়; এবং তাতেও হাত দেয়া নিষিদ্ধ মনে করা হয়। রাজনৈতিক ইসলাম মনে করে তার লক্ষ্য স্বর্গীয়, এ এমন এক আহ্বান যার ডাকে সাড়া দিতে হবে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে, যে কোন সময়ে বা স্থানে। যারা ইসলামি বক্তব্যকে সময়ের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করে, সালাফি এবং জিহাদিরা উভয়েই তাদেরকে খারাপ এবং ভয়ানক আখ্যা দেয়; তারা বিশ্বাস করে পরিবর্তনশীল ও সসীম মানুষের পক্ষে চিরন্তন ও অসীম আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। তারা ভাবে না, যে মুসলিম কোরআনের বাণীকে আক্ষরিক অর্থে নেয়, জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল আধুনিক পৃথিবীর সাথে মানিয়ে চলতে তাকে বিপরীতমুখী পরিস্থিতির সাথে লড়াই করতে হয়। একজন ইসলামপন্থীর দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে ঐশীবাণী ও ইসলামী শরীয়ার সেবাদাস। ইসলামপন্থীদের মতে, মানুষ আধুনিকতার পেছনে যত ছুটবে সে তত বেশি প্রকৃত ঈমান (ইসলামের প্রতি বিশ্বাস) থেকে দূরে সরে যাবে। আর ইকোর মতে, আধুনিকতা এবং জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্তি প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টাই ফ্যাসিবাদের প্রাথমিক কিন্তু চূড়ান্ত রূপ। এই প্রত্যাখ্যান যেন মজবুতভাবে বাঁধা রয়েছে এক পশ্চাদমুখী মূর্খতায়, যৌক্তিক সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে, বিদেশীদের ঘৃণা, যৌনতা এবং পৌরুষত্বের অহঙ্কারে। এটি তো জানা কথা যে, রাজনৈতিক ইসলামের সবচেয়ে অগ্রাধিকার হচ্ছে

আধুনিকতার বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুদ্ধ করা, এবং এটি নিয়ে তারা গর্ববোধও করে।

ইকো লিখেছেন, ফ্যাসিবাদ বেঁচে থাকে এক সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের উপর যে “অন্যেরা” তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। অত্যাচারী মানসিকতার সঙ্গে মিশে থাকে অপমানজনক প্রতারণার স্থির বিশ্বাস এবং প্রতিশোধের সীমাহীন তৃষ্ণা। আর ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এধরনের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে ইসলামের ভাবনাচিন্তার মধ্যেই। আর এজন্যই ইসলামের নবী মুসলিমদের সতর্ক করেছেন অবিশ্বাসী, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকে। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, অন্যান্য জাতির সবাই ক্ষুধার্ত কুকুরের ন্যায় মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে অচিরেই। ইকোর মতে ফ্যাসিবাদের অনুসারীরা যতটা বাঁচার জন্য যুদ্ধ করে তার থেকে বেশী বেঁচে থাকে আরও যুদ্ধ করার জন্য; এই “যুদ্ধ” যতটা না উপায় (বেঁচে থাকার) তারচেয়ে অনেক বেশি উদ্দেশ্য। ঠিক একই জিনিস অক্ষরে অক্ষরে ইসলামের জিহাদ ধারণার প্রতি প্রযোজ্য, আত্মরক্ষার জন্য সক্রিয় হওয়া নয় বরং শাশ্বত ঈশ্বরের প্রতি পালনীয় এক আবশ্যিক বিধান। ফ্যাসিবাদীরা বলবে, হয় তুমি আমাদের সমদর্শী হও নয় মরে যাও, আর ইসলামপন্থীরা বলে হয় তুমি ইসলাম মেনে নাও নয় মরে যাও। শেষের সেদিন আসবে, এই আদর্শ বিলীন হবে, নতুন পৃথিবী চোখ মেলে দেখবে তার শত্রুরা—মানবতায় অবিশ্বাসীরা, হয় মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবে অথবা শেষ হয়ে যাবে।

এদের কিছু মিল তুলে ধরা যাক, ফ্যাসিবাদ এবং ইসলামপন্থা যেন “আগামী পৃথিবী’র অসুখবিশেষ, অবক্ষয় শুরু হলে সমাজ অতীতের গৌরবময় দিনগুলিকে স্মরণ করে। জার্মানি এবং ইতালি উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল এক অসম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাঝে, আর ইসলামিক দেশ সমূহ ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। এরপর ইসলামিক সাম্রাজ্য ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে চলে যায়। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামিক দেশগুলি স্বাধীন দেশ ছিল না। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে সীমা বিস্তারের আগে, ফ্যাসিবাদ প্রথম পা রাখে ইটালিতে। অন্য দেশ ছেড়ে কেন ইটালি? সেই সময়ে দেশটি ছিল এক অসম্পূর্ণ ঐক্যবন্ধন প্রক্রিয়ার মাঝে, রাজনৈতিক দলগুলি পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত, প্যারিস শান্তি চুক্তিতে প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি

তুঙ্গে, অর্থনীতি ভূলুণ্ঠিত এবং বলশেভিক বিপ্লবের ভয় ধেয়ে আসছে। সর্বোপরি, ইটালি ছিল গভীর ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক, সেইসঙ্গে যথেষ্ট প্রভাবশালী চার্চের মূল দর্শন যার মধ্যে আছে বিভিন্ন নীতি যেমন সম্মান, যাজকতন্ত্র, ঐক্য, উজ্জ্বল নেতৃত্ব এবং চরম সত্য—সেইসব উপাদান যারা টেনে নিয়ে যায় ফ্যাসিবাদের পথে।

ঊনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদের উত্থানে, জাতীয়তাবাদী এবং ফ্যাসিবাদী আন্দোলন মাথা তুলল ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মতো দেশে যাদের একক রাষ্ট্রের অধীনে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের দীর্ঘ ইতিহাস ছিল এবং সংসদীয় গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতার ইতিহাস যার দিকে তারা ফিরে তাকাতে পারে। কিন্তু জার্মানী এবং ইটালির চিত্র এর বিপরীত। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ফ্যাসিবাদী আন্দোলন ছিল প্রান্তিক আন্দোলন যা জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদের উপর একত্রিত করতে এবং সঙ্ঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা সামান্যই প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছিল। ঐতিহাসিক আর্নস্ট নোলট (Ernst Nolte)-এর চোখে Action Francaise, ১৮৯৮ সালে ফ্রান্সে যে সহিংস ক্যাথলিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ছিল ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের অগ্রদূত যা পরবর্তীতে জেগে ওঠে ইটালী ও জার্মানীতে। এই আন্দোলনের আশা ছিল আধুনিকতাকে শেষ করে ক্যাথলিক চার্চের রক্ষণশীল খ্রীষ্টান সমাজ ফিরিয়ে আনা যাবে, কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের জাতীয়তাবাদীরা সেখানে অধিক শক্তিশালী ছিল ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই আর নাৎসী সেনাবাহিনী ফ্রান্স দখল করলে তাদের যেটুকু প্রাসঙ্গিকতা ছিল তা চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

১৯২৯ সালে ওয়াল স্ট্রিট ক্র্যাশ (শেয়ার বাজারে বিপুল ধ্বস) এর ধাক্কার তিন বছর পর অসওয়াল্ড মোসলে (Oswald Mosley) ব্রিটেন ইউনিয়ন অব ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের হিসাব অনুযায়ী এই দল গর্বের সাথে ঘোষণা করে যে তাদের সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার, মোসলে ইটালি সফর করেন ফ্যাসিবাদ বিষয়ে পড়াশোনার জন্য, পরে অ্যাডলফ হিটলারের SS বাহিনীর আদলে দলের জন্য কালো পোষাকের (Uniform) আদেশ দেন। নাইট অব দ্য লং নাইভস (Night of the long knives—হিটলারের উত্থানের প্রক্কালে ১৯৩৪ সালের ৩০ জুন থেকে ২

জুলাইয়ের মধ্যে নির্বিচারে প্রায় ১০০০ বিরোধী হত্যা) ঘটনার ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, তার আন্দোলন জনসমর্থন হারায়।

পরবর্তীকালে জার্মানী এবং ইটালীতে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করে, এর সমর্থকেরা ক্ষমতার রাশ হাতে নেয় এবং জণগনকে শত্রু দমন আর দুনিয়া শাসন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। গুসেপ্পে মাজিনি (Giuseppe Mazzini) এবং গুসেপ্পে গ্যারিবল্ডি (Giuseppe Garibaldi) উনবিংশ শতাব্দীতে ইটালীতে যে ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তার শেষ হয় ইটালিয়ান ফ্যাসিবাদে। ইটালিয়ান শব্দ fascio এসেছে ল্যাটিন fasces শব্দ থেকে যার অর্থ “গুচ্ছ”, রোমান সম্রাটদের সামনে একগুচ্ছ দণ্ড নিয়ে রাজকীয় দেহরক্ষীরা চলত, পরে তা বহন করত বেসামরিক কর্মী এবং অফিসাররা। এটা ছিল ক্ষমতার চিহ্ন এবং একই সাথে ঐক্যের চিহ্ন এবং বিরোধী বা অপরাধীদের দৈহিক শাস্তির জন্য উপযুক্ত অস্ত্রের প্রতীক। যখন মুসোলিনি (Mussolini) ১৯১৯ সালে তার প্রথম সংগঠন ফ্যাসি ডি কমব্যাটিমেন্টো (Fasci di Combattimento) স্থাপন করেন, তিনি বিশ্বশক্তি হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিলেন—তিনি প্রকৃতই পুনর্গঠন করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন।

জার্মান ফ্যাসিবাদও উঠে এসেছিল এক অবক্ষয়ের সময়ে। কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা, প্রতিষ্ঠিত দলগুলির দুর্বলতা, এবং ভার্সাই (Versailles) চুক্তি; ‘যাকে জার্মানীতে বলা হয় মিথ্যা বা অসম্ভব চুক্তি’, যেগুলি জাতীয়তাবাদী সমাজবাদের হাতে উর্বর জমি তুলে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল এই আন্দোলন উইলহেলমাইন (Wilhelmine) সাম্রাজ্যের স্বপ্ন “সূর্য্যের মাঝে একটু জায়গা” সত্যিই জার্মানীর জন্য এনে দিতে পারবে। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স দুনিয়ার অধিকাংশ উপনিবেশ শাসন করার পর জার্মানী আবার জেগে উঠল এবং সেই সব শক্তিকে আঘাত করল যারা অল্পকাল আগে তাদের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়েছিল। এটি হচ্ছে সেই প্রচেষ্টা যাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রবাহিনী নস্যাৎ করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অপমানজনক পরাজয়ের স্মৃতি ভুলে অক্ষমতা এবং সর্বক্ষমতার স্বপ্নের অদ্ভুত মিশ্রণ নাৎসী (Nazi) শক্তির উত্থানের নিখুঁত পরিবেশ সৃষ্টি করল।

ইসলামপন্থীরাও ঠিক সেই একই অক্ষমতা এবং সর্বক্ষমতার মিশ্রণে তাদের বিশ্বাস প্রদর্শন করে। আর এটিই হচ্ছে অত্যাচারিতের অনুভূতিকে ব্যবহার করে তাঁকে অনেক বেশি শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করার স্বপ্নে বিভোর করে জাতিকে তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করানোর কৌশল। অধিকাংশ ইসলামিক দেশগুলিকেই পশ্চাৎপদ দেশ বলা যায়, ঠিক যেমনটা ছিল বিগত শতাব্দীতে জার্মানি এবং ইতালি। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হওয়ার পর থেকে ইসলামিক দেশগুলি আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, পুরনো আমলের রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোনটাকেই গ্রহণ করতে পারেনি। আর তাই অধিকাংশ ইসলামি দেশ পিছিয়ে থাকে কয়েক দশক। ইসলামি দেশে শাসন ব্যবস্থায় চলতে থাকে এক ধরনের মিশ্র ও পরস্পর-বিরোধী আইন কানুন। আর এভাবেই তা হয়ে যায় এক ধরনের সামরিক একনায়কতান্ত্রিক দেশ, কিংবা আধুনিকতার চর্চা করা থেকে ভয় পাওয়া এক অদ্ভুত দেশ। এই দেশগুলিতে ইসলামপন্থীরা সবসময় চেষ্টা করতে থাকে শাসনব্যবস্থার দখল নেওয়ার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামপন্থীদের বিকল্প হিসেবে সামরিক বাহিনী ছাড়া আর কেউ থাকেনা, একইসাথে যে কোন একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবেও ইসলামপন্থীরা ছাড়া আর কেউ থাকেনা। খ্রীষ্টধর্মের মাত্র ছয় শতাব্দী পরে পৃথিবীতে এসে ইসলাম, যাকে বলা যায় বিলম্বিত ধর্ম, আজও তার মধ্যবয়সে পড়ে আছে: ইসলামি সময়কালকে ধরলে প্রকৃতপক্ষে ১৪৩৬ সাল মিলে যায় ২০১৫ সালের সাথে। বেশীরভাগ মুসলিম দেশ, যেখানে ইসলাম দেরীতে এসেছে, ঠিক যেন ১৯২০ সালের জার্মানী বা ইটালি। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর (পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষে) এই দেশগুলি দ্বিধায় পড়ল যে তারা আধুনিক রাষ্ট্র হবে না কি প্রাচীন উপজাতীয় কাঠামো এবং মোল্লাতন্ত্রে থাকবে। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি আগের শাসনব্যবস্থাগুলির বিপরীতমুখী মিশ্রণে দশকের পর দশক ধরে একই পরিস্থিতিতে স্থির হয়ে রইল। একনায়কতান্ত্রিক (সামরিক) দেশগুলি বা যারা সন্তর্পণে সাহস করে আধুনিকতার কাছাকাছি পৌঁছল, সেখানে ইসলামপন্থীরা একটি রাজনৈতিক বিকল্প সৃষ্টি করতে থাকলো।

বলশেভিকবাদ এবং ফ্যাসিবাদের পর বিংশ শতাব্দী দেখল আধুনিকতা এবং সভ্যতার মূল্যবোধের উপর ভয়ানক আক্রমণ: ঐতিহাসিক আর্নস্ট নোলট (Ernst Nolte) এবং দার্শনিক আরনেস্ট গেলনার (Ernest Gellner) উভয়েই ইসলামবাদকে দেখেছেন আধুনিকতাবিরোধী তৃতীয় শক্তি হিসাবে। তিনটিই অবশ্যই আধুনিক প্রযুক্তিগত আবিস্কারের সুবিধা নিয়েছে, তবুও তারা সভ্যতার ভিত্তিমূলে ভয়ঙ্কর আঘাত করেছে। যুক্তি, ব্যক্তিস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবাধিকার, শরীরের অধিকার, সেই সাথে বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা—তিনটিই এগুলিকে বিপদ হিসাবে দেখে।

বিশেষত, এই তিনটি আন্দোলনই সর্বদা অনুভব করেছে যে গ্রামীণ থেকে নাগরিক সমাজে পরিবর্তন সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যে সমাজ অতীত প্রেক্ষাপট এবং/অথবা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটাই একনায়কতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি। গ্রামীণ পরিবেশের রহস্যময় আনন্দ প্রায়শই এইরকম সমাজকে রক্ষা করতে সহায়তা করার মূল কারণ এবং শহুরে চেতনা বিরোধী আলোচনা তিনটি আন্দোলনকে পৃথক করে দেখায়। বলশেভিকদের কাছে, নগর হল সর্বহারাদের শোষণের জায়গা; নাৎসীদের কাছে, গৌরবময় কুড়ির দশকের ঐতিহ্যময় নৈতিকতার পতনের প্রতীক বার্লিন শহর; এবং ইসলামপন্থীরাও মনে করে নগর হল পাপ এবং নৈতিক অবনমনের জায়গা।

সমগ্র ইতিহাসে যেখানেই ফ্যাসিবাদী, কমিউনিস্ট এবং ইসলামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করেছে; সমাজ সেখানে পরিণত হয়েছে খোলা কারাগারে, যার বাসিন্দা—তাদের নিজেরই নাগরিক—চব্বিশ ঘন্টা যাদের উপর নজরদারি রাখা হয়। বহুত্ববাদকে চিরকালই এবং এখনও দেখা হয় বিপদ হিসেবে, অথচ হিংসা এবং ভীতির মাধ্যমে সামাজিক ঐকমত্য কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় নাগরিকদের উপর। তারা বিশ্বাস করে তাদের মতই (opinion) এক এবং একমাত্র সত্য আদর্শ, বিরোধীদের ভাগ্য ভাল থাকলে দাগিয়ে দেওয়া হয় স্বধর্মত্যাগী বা বিশ্বাসঘাতক বলে, অন্যথায় সরাসরি হত্যা।

যেখানেই ইসলামিক ফ্যাসিবাদ শাসনক্ষমতা লাভ করে, ঠিক যেমনটি ঘটেছে ইরান, সুদান, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, গাজা এবং আইসিসের

দখলকৃত অঞ্চলে সেখানেই শুরু হয় বর্বর একনায়কতন্ত্র। ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাবে এই অজুহাতে তারা বর্তমান সময়ের বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে। যেখানেই ইসলামপন্থীরা ক্ষমতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে সেখানেই তারা এবং তাদের সহযোগীরা চেষ্টা করে সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটানোর। তাঁরা নিজের দেশে কঠোর সব আইন প্রণয়ন করে যেমনটি এখন আছে আলজেরিয়া, আফগানিস্তান ও লিবিয়ায়। আর এটিই হচ্ছে মিশর এবং সিরিয়ারও অনিবার্য পরিণতি। এসকল কিছু ছাড়াও রাজনৈতিক ইসলাম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে, এর অনেকগুলো কারণও আছে। প্রথম কারণটি হচ্ছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া নস্যাৎ করা এবং জনগণের হীনমন্যতা ইসলামিক দেশগুলিতে কেবলমাত্র ইসলামপন্থীদেরকেই বিকল্প হিসেবে রাখে যে ইসলামপন্থীরা জাতিকে সাময়িকভাবে হলেও কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিতে পারে।

আভ্যন্তরীণ সমালোচনার শ্বাসরোধ করতে একনায়কতন্ত্র আসন্ন বিপদের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে উসকে দেয় ভীতি, দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে কোন প্রকৃত অথবা কাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। নাৎসীরা এই কাজটিই করে একটু সৃষ্টিশীলতার সাথে, জার্মানীর লোকদের প্রথমে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদেরই দেশের ইহুদী এবং কমিউনিস্টদের দেখিয়ে, পরে বহিঃশত্রু সম্মিলিত বাহিনীকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে বারবার বহিঃশত্রুর বদল ঘটেছে; প্রথমে নাৎসীরা এবং পরে গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্য। কমিউনিস্টদের মধ্যে বিরোধীরা ছিল আভ্যন্তরীণ শত্রু, ধরে নেওয়া হত তারা পাশ্চাত্যের সহযোগীতায় সামাজিক ঐক্যের ক্ষতিসাধন করবে।

অপরপক্ষে, ইসলামপন্থীরা সর্বদাই বলে এসেছে একইসাথে তিন শত্রুর কথা। পৃথিবীর অপর প্রান্তে পাশ্চাত্য, বাড়ীর কাছে ইজরায়েল; এবং প্রচলিত ধর্মের বিরোধীরা, সংশোধনবাদীরা, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তকরা ও রাজনীতিবিদরা আভ্যন্তরীণ শত্রু, এরা চিরায়তভাবে পাশ্চাত্যের পরিবর্ধিত রূপ। যেখানেই ইসলামি ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করেছে; যেমন ইরাণ, সুদান, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া এবং গাজা; সব জায়গাতেই নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্র জেগে উঠেছে, আজ পর্যন্ত তারা ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নয়। যেখানেই ইসলামপন্থীরা সরকার থেকে উৎখাৎ হয়েছে, তারা

এবং তাদের সমর্থকরা সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত হয়েছে, বিধ্বংসী হিংস্র আক্রমণ করেছে নিজের দেশের জনগণের উপরেই, যেমন আলজিরিয়া, আফগানিস্তান, মালি, এবং লিবিয়া—একই পরিস্থিতি এখন দেখা যাচ্ছে মিশর এবং সিরিয়াতে।

তবুও যেহেতু মুসলিম দেশগুলির জনগণের উপরে একটা বিস্তৃত আবরণ আছে, সে কারণে রাজনৈতিক ইসলাম একটা আশার আলো নির্মাণ করতে পারে। অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি হল এইসব দেশে জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতারা কেউই তাদের ব্যর্থতা স্বীকার করতে রাজী নয় —বিশেষত, আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের কোন বিকল্প সৃষ্টিতে তাদের অক্ষমতা। সর্বোপরি, আহত অহংকার আরব দুনিয়ার ইতিহাসের সমস্ত পুনর্মূল্যায়নকে এবং পাশ্চাত্যের সাথে ফলদায়ী সম্পর্ককে পঙ্গু করে দিয়েছে। সেই সাথে বহু আরব দেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তারা পাশ্চাত্যের দ্বারা প্রতারিত, ফলে সম্মিলিতভাবে পাশ্চাত্য-বিরোধী ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ধর্মনিরপেক্ষ একনায়কতন্ত্র এবং তাদের ইসলামি প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়েই এই ঘৃণায় পরিপূর্ণ; ফলে উদ্ভব হয় এক দিশাহারা, হতাশ এবং বিশেষভাবে ক্রোধোন্মত্ত এক প্রজন্মের। কিছু অংশ তাদের ক্রোধ প্রকাশের উপায় হিসাবে বিদ্রোহ করে অভিজাত শাসকের বিরুদ্ধে, অন্যেরা আশ্রয় এবং সান্ত্বনা খোঁজে ইসলামের মধ্যে।

এভাবেই আরব বসন্তের পশ্চাৎপটে যে একদা-শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলন ছিল তা বিলীন হয়ে যায় দুই গোষ্ঠীর নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে। যে বিবাদকে আমি বলতে চাই সভ্যতার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব—অতি আলোচিত পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামি বিশ্বের লড়াই নয়। বরং এক আরব-আভ্যন্তরীণ, ইসলামি-আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ইসলামি বিশ্বকে দেখা যেতে পারে পিঁয়াজের মতো বহুস্তরীয় একনায়কতন্ত্র হিসাবে: রাজবংশের একনায়কতন্ত্র যেমন, মুবারক, গদ্দাফি, হুসেইন, বেন আলি, এবং আসাদ পরিবার এর প্রথম স্তর; দ্বিতীয় স্তর সামরিক একনায়কতন্ত্র; তার পর ধর্মীয় একনায়কতন্ত্র যা স্থির করে দেয় কিভাবে শিশুদের বড় করা হবে বা শিক্ষা দেওয়া হবে; এবং সবশেষে সমাজে পুরুষের একনায়কতন্ত্র যা প্রাচীন লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার মাধ্যমে পরিবারের আভ্যন্তরীন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পিঁয়াজের প্রতিটি স্তরের মতোই ইসলাম বিশাল উঁচু দেওয়ালের মতো ইসলামি বিশ্বকে বাকী পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, যেন তার আত্মপরিচিতিকে সুরক্ষিত করছে। আরব বসন্তের সময় যে যুবকরা পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করত তারা একটা স্তরকে ছাড়িয়ে ফেলতে পেরেছে, মুখোমুখি হয়েছে পরবর্তী স্তরের। শেষপর্যন্ত এটা হতে পারে যে পিঁয়াজের কেন্দ্র—ধর্ম—টুকুই শুধু রয়ে গেল। এটা এখনও তর্কসাপেক্ষ যে, যদি তাই হয়, যুবশক্তি ক্ষমতার কেন্দ্রকে অপসারিত করতে পারবে কি না। তারা যদি সফল হয়, তারা দেখবে যে পিঁয়াজটি আসলে ছিল একটি ভয়ের বস্তু—তার অনেক স্তরের মধ্যে কখনই এমন কিছু ছিল না যা রক্ষা করার যোগ্য। একমাত্র তখনই আমরা “বিপ্লব”-এর কথা বলতে পারি—ততদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রাচীন একনায়কতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য তার পদচিহ্ন রাখতেই থাকবে, এমন অঞ্চলেও বিস্তৃত হবে যেখানে আগে ধর্মের ভূমিকা ছিল নগণ্য।

অধ্যায় ২

সংস্কারবাদী নাকি ফ্যাসিবাদী ইসলামপন্থী? মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড

মধ্যপ্রাচ্যের সবথেকে বেশী প্রভাবশালী সুন্নী গোষ্ঠী মুসলিম ব্রাদারহুড। ইসলামি বিশেষজ্ঞরা এদেরকে কখনও কখনও অভিহিত করেন, "সংস্কারবাদী সামাজিক আন্দোলন" হিসাবে যারা দূর অতীতের হিংসা বর্জন করেছিল। এরা সেই একই পণ্ডিত যারা "নরমপন্থী ইসলাম" কে প্রশ্রয় দিয়ে দাবি করে যে এটা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোগান (Recep Tayyip Erdogan), সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি সবসময়েই তথাকথিত নরমপন্থী ইসলামপন্থীদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন—ঠিক একই কাজ করেন তিউনিশিয়াতে রশিদ আল-ঘানুশি (Rachid al-Ghannushi) এবং তার দল এন্নাহ্‌দা পার্টি (Ennahda party), মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড এবং মরক্কোয় জাস্টিস এণ্ড চ্যারিটি পার্টি। মিশর, তিউনিসিয়া ও তুরস্কের ব্রাদারহুডের নেতৃত্ব পশ্চিমাদের বোঝাতে সক্ষম হলো যে, তারা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী; আর সেজন্যই তারা তাদের বাহ্যিক সম্বোধন ও কথাবার্তায় জিহাদের প্রচার-প্রচারণা এড়িয়ে চলার কৌশল গ্রহণ করল। একইসাথে তারা নিজেদের মজলুম (নিপীড়িত) বলে সহানুভূতি পাবার চেষ্টার পাশাপাশি 'ইসলামোফোবিয়ার' সমালোচনাও করতে লাগলো। তারা বক্তৃতাবাজি করতে থাকল যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শরিয়া আইন এবং গণতন্ত্র আসলে একই জিনিস। আর হিজাব হচ্ছে নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের (Empowerment) প্রতীক। একই সময়ে পাশ্চাত্যে টাই পরিহিত একদল প্রগতিশীল ইসলামপন্থীর উদ্ভব হলো যারা ইমানুয়েল কান্ট, রুশো, জন লক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করলো যে, তাদের কর্মযজ্ঞ অতি আধুনিক যার উদ্দেশ্য সমাজের সবার সহাবস্থান নিশ্চিত করা। এরা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অতি সন্তর্পণে ঢুকে পড়ল, বিশেষতঃ বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে; এমনকি মানবাধিকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন এনজিও সমূহের মধ্যেও তারা খুঁটি গেড়ে বসল। এভাবেই

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় তাদের পক্ষে একটি বৃহৎ ও প্রভাবশালী লবি তারা তৈরি করে ফেলল; আর এখন সেই লবির জোরেই তারা ইসলামের সমালোচনা নিষিদ্ধ করার আইন চাইছে ইউরোপ এবং কানাডায়। ওরা অর্থনীতিতেও নিজেদের চাঙ্গা রাখার জন্য ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম এবং হালাল প্রোডাক্ট উৎপাদন ব্যবসায় মনোনিবেশ করছে, ঠিক যেমন তাদের গোপন ব্যাঙ্কিং ব্যবসা পরিচালিত হয় মানি লন্ডারিং ও ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে পাচারকৃত অর্থ সংগ্রহ করার মাধ্যমে। এবার এর সাথে যুক্ত করুন বিরাট অর্থ সাহায্য যা কাতার থেকে এবং উপসাগরীয় ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে ওরা। এই অর্থই ওদেরকে সাহায্য করে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে- যেমন অক্সফোর্ড, জর্জটাউন ও Tubingen বিশ্ববিদ্যালয়- ইসলামিক স্টাডিজের উপর গবেষণার কেন্দ্র চালু করতে। আর এসব হচ্ছে এমন কিছু সেন্টার যারা মুসলিম ব্রাদারহুডের সমালোচনার কাছ দিয়েও হাঁটে না, ইসলামের সমালোচনা করা তো দূর অস্ত।

যখন প্রকাশ পেল তিনটি দলই গণতন্ত্রবিরোধী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত, তখনও ঐ পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা দৃঢ়ভাবে তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করতে অস্বীকার করল যে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও মধ্যপন্থী গণতান্ত্রিক ইসলাম আছে—ওরা ভুলতে বসে যে ইসলামপন্থীদের রং বদল বা রূপ বদল যাই হোক, ওরা রাজনীতিতে প্রবেশ করে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে: শরীয়া আইন অনুযায়ী ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, এবং ভবিষ্যতে সারা পৃথিবী দখল বাস্তবায়িত করা।

মনের গভীরে, ইসলামপন্থীরা গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে এবং একে ক্ষমতায় পৌঁছানোর পন্থা ছাড়া আর কিছু মনে করে না। কিন্তু এরদোগান তার গুরু নেকমেতিন এরবাকান (Necmettin Erbakan)-কে তুরস্কের আইন এড়িয়ে মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হতে দেখে নিজেই সে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন, এক্ষেত্রে তিনি সরাসরি বিপ্লবের পথ পরিহার করে সুকৌশলে ও অতি সন্তর্পণে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ বেছে নিলেন। প্রথমদিকে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, পাশ্চাত্যপন্থী মানুষ হিসাবে যিনি দুর্নীতি দূর করতে এবং তুরস্কের অর্থনীতিকে সংস্কার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের নেতা নির্বাচিত হওয়ার অল্প কয়েক বছর পর —দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি যখন ভিতর থেকেই তাকে তুচ্ছ করতে শুরু

করল, তার সেনাবাহিনী তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়—আর এভাবেই তিনি আবির্ভূত হলেন একনায়কতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী এবং পাশ্চাত্যবিরোধী মানুষ হিসাবে। এরপর এরদোগান শুরু করলেন তুরস্কের পাঠ্যসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, সেখান থেকে তিনি সরিয়ে ফেললেন বিবর্তনবাদের পাঠ এবং এর বদলে পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করলেন ইসলামিক পাঠ্যধারা, আর একইসাথে হিজাবের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকলেন। যেসব লেখক ও বুদ্ধিজীবী ইসলামের সমালোচনা করত তাদেরকে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এরই মধ্যে আইসিসকে প্রকাশ্যে মদত দিয়ে সিরিয়ায় তিনি তার ট্যাংক বাহিনী ঢুকিয়ে সিরিয়ার আফরিন ও কুর্দিদের এলাকাসমূহ কব্জা করে ফেললেন। তার এই কাজটিকে আইসিসের ডায়েট চার্টের অনুকরণই কেবল বলা চলে। অবশ্য তিনি পাশ্চাত্যের সাথে যে সম্পর্কের বন্ধন গুঁড়িয়ে দিয়েছেন সেটিকে আর জোড়া লাগাতেও আগ্রহী নন।

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এরদোগান সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী জাফর ক্যাগলাইয়ান (Zafer Caglayan) এর ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু বলার ছিল না, তাই তিনি বললেন, “এ একটা জঘন্য নোংরা পরিকল্পনা সরকারের বিরুদ্ধে, দলের বিরুদ্ধে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে”। ক্যাগলাইয়ান দাবি করলেন, এই কেলেংকারীর পিছনে আছে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ঠিক একই কথা এরদোগান বলেছিলেন তার বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে পরিচালিত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে, তিনি তখন দাবি করেছিলেন যে এটা তার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র। একই বক্তব্য তিনি আউড়ে গেছেন ২০১৮ সালে তুর্কি মুদ্রা পতনের পরেও। প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে না দেখে বাস্তব সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরাতে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব তুলে ধরা ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য, যেখানে দেশের যে কোন সমস্যার ব্যাপারে দায়ী করা হয় ভিন্ন রাষ্ট্র, সংগঠন বা ব্যক্তিকেই। এরপর জনমানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়, আর এটা আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই প্রায় সবগুলি ইসলামিক দেশে।

মুসলিম ব্রাদারহুড বহুবার চেষ্টা করেছে বলপ্রয়োগের দ্বারা মিশরে ক্ষমতা দখল করতে, একটা সময়ে মনে করা হয়েছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ধর্ম বা ঈশ্বরবিরোধী, কারণ চরম ক্ষমতা ঈশ্বরের হাতে, মানুষের হাতে নয়। নিষ্ঠুর

বলপ্রয়োগ কখনও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয়নি, যে কারণে সময়ের সাথে সাথে নির্বাচন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয় কিন্তু গণতন্ত্র সম্পর্কে নয়। ব্রাদারহুড ২০১২ সালে মিশরের নির্বাচনে জয়ী হয় কিন্তু এক বছরের মধ্যেই শোচনীয়ভাবে তার পতনও হয়। আরও একবার, সরকার নিজেদের ত্রুটি খোঁজার পরিবর্তে দেশের ভিতরের এবং বিদেশের ইসলামের শত্রুদের দোষারোপ করা শুরু করে। এরপর মুসলিম ব্রাদারহুডের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও সামরিক বাহিনীর লোকদের হত্যার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এখন তাদের কর্মপদ্ধতি তো খুবই পরিচিত। আর সেটা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবেই ফ্যাসিবাদীরা যে পদ্ধতির ব্যবহার করেছে তাই-ই, অর্থাৎ হয় তারা দেশকে শাসন করবে নয়তো দেশকে সন্ত্রাস এবং নিষ্ঠুরতার অগ্নিগোলকে পরিণত করবে।

১৯২৮ সালে জন্মের পর থেকেই ব্রাদারহুডের চলার পথ ফ্যাসিবাদী, এবং অন্য যে কোন ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের মতোই সে ব্যবহার করে দু’টি মুদ্রা: অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ এবং রক্ত। অষ্টাশি বছরের অস্তিত্বকালে এর সদস্যরা কখনও মিশরের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেনি, দেশের বা অন্য কোন মুসলিম দেশের সমস্যার কোন সমাধান তাদের কাছে ছিল না—তবু তারা সেই দেশগুলিকে শাসন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যারা ব্রাদারহুডের সাথে কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে এই কথা গ্রহণ করতেই হবে, “আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য; কোরআন আমাদের সংবিধান; নবী আমাদের নেতা; জিহাদ আমাদের পথ; আল্লাহর পথে মৃত্যু আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি”।

আপাতদৃষ্টিতে দলটি যে নরমপন্থী রাজনীতিই গ্রহণ করুক, এই পাঁচটি স্তম্ভই তাদের ফ্যাসিবাদী মুখের মুখোশ খুলে দিতে যথেষ্ট। এর সদস্যদের স্থির বিশ্বাস, যারা তাদের সাথে নেই তারা তাদের শত্রু। মুসলিম ব্রাদারহুডকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের জনকও বলা যেতে পারে, আল-কায়েদা (al-Qaeda) তার সরাসরি উত্তরসূরী। মুসলিম ব্রাদারহুডের গোটা ইতিহাস সেই বুদ্ধি-বৈকল্যেরই ফসল যার সর্বাঙ্গে লেগে আছে নাৎসীবাদ ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি বহু পরাশক্তির শেষ সূচিত করেছিল। হ্যাবসবার্গ-লোরেইন (Habsburg-Lorraine)-এর রাজবংশ এবং রাশিয়া পরাজিত হয়েছিল; জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরির সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন চুরমার হয়েছিল, রাশিয়ার জার (Czar) এবং তার পরিবার খুন হয়েছিল এবং দেশে রাজতন্ত্রের জায়গায় এসেছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা। ঠিক যেমন দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকা অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ১৯২৪ সালে। যে খলিফাতন্ত্র চারশ' বছর ধরে বহু ইসলামি দেশ এবং তাদের জনগণকে শাসন করেছিল, যার শাসনপদ্ধতি ছিল ইসলাম অনুমোদিত, একইসাথে তারও মৃত্যু ঘটে।

এই সব পরাভূত সাম্রাজ্যগুলিতে নতুন শাসকেরা এল যাদের নির্দিষ্ট আদর্শ ছিল, তারা রাজতন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। ইটালি এবং জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা হল। জার্মানীতে ওয়েমার রিপাবলিক (Weimar Republic)-এর স্বল্পকালীন উপস্থিতির পর জাতীয় সমাজবাদীরা ক্ষমতা দখল করে। অন্যদিকে কমিউনিজম হল রাশিয়ার নতুন ধর্ম। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলিম বিশ্বের অবস্থা হল হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো, অনাথ যে জানে না কোথায় যাবে।

তিনটি মতবাদ প্রতিযোগিতা শুরু করল স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য—ইসলামবাদ, জাতীয়তাবাদ, এবং আরব জাতীয়তাবাদ। বেশীর ভাগ মুসলিম দেশগুলি তখন ছিল ব্রিটিশ এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনে। সেখানকার জনসাধারণ নিজেদের শোষিত এবং অত্যাচারিত মনে করত। ফলে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অখ্যাতি অর্জন করল। অপরপক্ষে, কমিউনিজম অতি দ্রুত বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন সংগ্রহ করে, বিশেষভাবে সিরিয়া এবং মিশরে, কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে ধর্মকে পরিত্যাগের কারণে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হল। তবু পুনর্গঠনের এই সঙ্কটকালে পরস্পর স্বাধীন দুটি দলের আবর্ভাব ঘটল, যাদের লক্ষ্য ইসলামি খিলাফৎ ফিরিয়ে আনা। ভারতে ইসলামি ব্যক্তিত্ব আবুল আলা মওদুদী (Abul Ala Moududi) ১৯২৪ সালে এক আন্দোলনের সূচনা করেন যার উদ্দেশ্য জিহাদী আদর্শকে পুনর্জীবিত করা। মওদুদী প্রথমেই ব্রিটিশ শাসনের খোলস ঝেড়ে ফেলে উম্মাহর (Ummah) একতা বা পৃথিবীব্যাপী মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলেন। মওদুদী তার সদস্যদের আহ্বান করলেন সশস্ত্র জিহাদে, ঘোষণা

করলেন, "বেরিয়ে এস এবং জিহাদে যোগ দাও"। "নিশ্চিহ্ন করে দাও যারা ঈশ্বরে (ALLAH) বিশ্বাস করে না....যদি তুমি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস কর তাহলে তোমার একমাত্র কাজ হল তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে পৃথিবীতে ইসলামের শাসন কায়েম করা"। মওদুদীর মতবাদ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, প্রথমে ভারতে, তারপর পাকিস্তানে এবং আফগানিস্তানে, ইসলাম সম্পর্কে তার চিন্তাধারাই বর্তমানে তালিবানের আদর্শের ভিত্তি। মওদুদীর ভাবাদর্শ মিশরেও ছড়িয়ে পড়েছিল, এজন্যই তার ভাবাদর্শ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন স্বয়ং সাইয়্যেদ কুতব (মুসলিম ব্রাদারহুডের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা)।

চার বছর পর, ১৯২৮ সালে, সুয়েজ ক্যানালের তীরবর্তী ইসমাইলিয়া (Ismailia) প্রদেশে মুসলিম ব্রাদারহুড গঠিত হল। হাসান আল-বান্না, তৎকালীন বাইশ বছর বয়সী এক আরবী ভাষার শিক্ষক তার নতুন আন্দোলনের জন্য দু'টি লক্ষ্য স্থির করলেন। প্রথমত, ইসলামি সমাজ থেকে সমস্ত অনৈসলামিক বিষয় দূর করা; দ্বিতীয়ত, খিলাফৎ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা। তার দর্শন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সিরিয়া ও মিশরে। আজ সেই দল গর্ব করে বলে সারা পৃথিবীতে সত্তরটির বেশী দেশে তাদের প্রতিনিধি আছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই মুসলিম ব্রাদারহুড সক্রিয়।

মওদুদী বা আল-বান্না কারো দলই ক্ষমতায় যেতে পারেনি। কিন্তু যে অসংখ্য জঙ্গী গোষ্ঠী সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ইসলামি বিশ্বে, এশিয়া, ইউরোপ, এবং আমেরিকাতে বেশুমার সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী তারা এদের থেকেই জন্ম নিয়েছে। বিশ্বায়ন উভয় আন্দোলনকে একে অপরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। আর এজন্যই আল-বান্না এবং মওদুদীর সন্তান সন্ততিরা ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানে মিলিত হয় সৌদি টাকা আর পাশ্চাত্যের বুলেট দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আফগানিস্তানে সোভিয়েত শাসন শেষ হওয়ার পরও উভয় পক্ষের লোকেরাই এই দুই ব্যক্তির স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য হাত থেকে বন্দুক নামানোর বদলে শুরু করল দীর্ঘমেয়াদী জিহাদের মাধ্যমে নতুন আন্দোলন। আজ সেই দলেরই নাম আল-কায়েদা।

এইখানে প্রসঙ্গ থেকে সরে আমরা মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে জাতীয় সমাজবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারি।

মুসলিম ব্রাদারহুড এবং নাৎসীরা: একটি প্রেম এবং তার ফলাফল

নির্ভরযোগ্য সূত্রে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, সরাসরি হিটলারের সাথে হাসান আল বান্নার যোগাযোগ ছিল; তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, জেরুজালেমের গ্রান্ড মুফতি আল হুসেইনী সেসময় এতদুভয়ের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন ছিলেন। যেহেতু আল হুসেইনী একদিকে যেমন হিটলারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন আবার অন্যদিকে তিনি আল বান্নারও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শায়খ আল হুসেইনি যুগোস্লাভ ও সোভিয়েত মুসলিমদেরকে হিটলারের সৈন্যদের সাথে মিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এজন্যই হিটলার তার জন্য জার্মানির মিউনিখ শহরে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করার জায়গা দান করে পুরষ্কৃত করেছিলেন। এই মসজিদটিকেই হাসান আল বান্নার জামাতা ও পার্সোনাল সেক্রেটারি সাঈদ রামাদান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপে মুসলিম ব্রাদারহুডের সেন্টার হিসেবে তৈরি করেছিলেন। এই মসজিদটিকেই আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সাঈদ রামাদানের সাহায্যে ইউরোপে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহার করেছিল। এ কথাটিই লিখেছেন বিখ্যাত পুলিৎজার বিজয়ী বইয়ের লেখক আয়ান জনসন তার বই “A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Muslim Brotherhood in the West”

১৯৪৬ সালে হাসান আল-বান্না জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতি আমিন আল-হুসেইনির উদ্দেশে প্রশংসাসূচক উক্তি করে একটি শোকবার্তা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী এবং নাৎসী সহযোগী বলে চিহ্নিত আল হুসেইনি স্বল্পকাল ফরাসী জেলে থাকার পর মিশরে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন, আল-বান্নার মুসলিম ব্রাদারহুডে তিনি আশ্রয় পান।

“আমার কাছে মুফতি একটি গোটা জাতির সমান” আল-বান্না তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, “কারণ মুফতিই প্যালেস্টাইন এবং প্যালেস্টাইনই মুফতি। হে ইমানদার, তুমি কি মহান, অপরাজেয়, অবিশ্বাস্য মানুষ।

হিটলার এবং মুসোলিনির পরাজয় তোমাকে বিচলিত করেনি। তুমি কত বড় বীর—আশ্চর্য যাদুময় মানুষ। আরবের যুবসম্প্রদায় যা করতে পারত-- যা করতে পারত মন্ত্রীরা, ধনীরা, প্যালেস্টাইনের, সিরিয়ার, ইরাকের, তিউনিসিয়ার, মরক্কোর, এবং ত্রিপোলির যুবরাজরা—মোনাজাত করি, সেই কাজের জন্য তারা যেন তোমার মতো একজন বীরকে লাভ করে যে একটা সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, হিটলারের সাহায্য নিয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। হিটলার এবং জার্মানী না থাকতে পারে, কিন্তু আমিন আল-হুসেইনি যুদ্ধ করতেই থাকবে”।

আল-বান্না এবং আল-হুসেইনি দু’জনে ছিলেন দীর্ঘদিনের বন্ধু। ১৯৪১ সালে ইরাণে সরকার উৎখাতের জন্য জার্মানপন্থীদের এক তীব্র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আল-হুসেইনি জার্মানী থেকে চলে যান। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি হিটলারের ব্যক্তিগত অতিথি হিসাবে জার্মানীতে ছিলেন। ১৯২৭ সালে একটি চিঠিতে আল-বান্না (তখনও পর্যন্ত তিনি একজন তরুণ শিক্ষক ছিলেন) আল-হুসেইনিকে “মুসলিম ব্রাদ্রারহুড” প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যা প্রমাণ করে, বহু আগে থেকেই দুজনের যোগাযোগ ছিল। আল-হুসেইনি উল্লসিত হয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং এই পরিকল্পনার সাফল্যে দোয়া করেন। মুসলিম ব্রাদ্রারহুডের মহাফেজখানা থেকে পাওয়া একটি পুরানো ছবিতে দেখা যায় তাদের দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

নাৎসী সরকারের সাথে আমিন আল-হুসেইনির সম্পর্কের সম্পূর্ণ নথি আছে। “ইহুদী সমস্যার চরম সমাধান” বিষয়ে গ্র্যাণ্ড মুফতি আলোচনা করছেন মন্ত্রী জোয়াকিম ভন রিবেনট্রপ (Joachim von Ribbentrop) এবং এডলফ আইকম্যান (Adolf Eichmann)-এর সাথে এবং হিটলারের সমর্থন চাইছেন যাতে প্যালেস্টাইন মডেলে নাৎসী জার্মানীতে একটি আরব রাষ্ট্র তৈরী করা যায়-এমন বহু বিষয়ের তালিকা দীর্ঘ। এছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে যে ঐ সময়ে আল-বান্নার এই সব জায়গায় বহু বন্ধু ছিল। যদিও ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রকের নথি সত্যায়িত করে নাৎসী গোয়েন্দাদপ্তর এবং মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের (যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিকল্পনা করেছিল উত্তর আফ্রিকার উপরে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করতে) মধ্যে যোগাযোগের, কিন্তু এই যোগ কতটা গভীর ছিল তা অস্পষ্ট।

সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত যে হাসান আল-বান্না মুসোলিনি এবং হিটলার উভয়কেই যথেষ্ট সম্মান করতেন, মনে করতেন তারা প্রকৃত নেতা হিসাবে তাদের দেশকে এক নতুন যুগে পৌঁছে দিয়েছেন। যখনই তিনি এদের কাউকে উল্লেখ করতেন, তিনি তাদের দেশ ইটালি এবং জার্মানীর সম্মানসূচক শব্দ ইল ডিউস (IL Duce) এবং ডার ফুয়েরার (der Fuhrer) ব্যবহার করতেন। আল-বান্না নিজের সম্পর্কে ইমাম বা কায়েদ ("commander") উপাধি ব্যবহার করতেন না, যেটা আরবে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতারা খুব সাধারণভাবেই ব্যবহার করেন, তিনি নিজেকে বলতেন "মুর্শিদ" বা "সত্যধর্মের পথপ্রদর্শক"(guide)। পরবর্তীকালে আয়াতোল্লাহ খোমেইনি (Ayatollah Khomeini) এই একই পদবী ব্যবহার করতেন।

তার বহু লেখার মধ্যে একটিতে দেখা যায়, আল-বান্না ১৯৩৫ সালে মুসোলিনির এক বক্তৃতায় ভীষণভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ইটালি অনন্তকাল যুদ্ধের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। "আট থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সী প্রত্যেক ইটালিয়ানকে যুদ্ধের মানসিকতায় প্রস্তুত থাকতে হবে" একটি ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে কথাটি বলেছিলেন একনায়ক। "সেনাতন্ত্র একটি নতুন ধারণা, মানব ইতিহাসে এর ভাষা কেউ বুঝতে সক্ষম হয়নি, এবং যথেষ্ট কারণ আছে কেন এমন ধারণা অন্য মানুষের পক্ষে প্রয়োগ করা কঠিন। ঐতিহাসিক এবং নৈতিক দিক থেকে ইটালির মানুষ ছাড়া আর কারো পক্ষে সৈনিকের দেশ গড়া সম্ভব নয়"।

অতীতের সাম্রাজ্যগুলির কেন পতন ঘটেছে সে বিষয়ে আল-বান্না বহু কারণের উল্লেখ করেছেন। রোমান সাম্রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, "আগেকার সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়েছে যুদ্ধের মানসিকতাকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিলাসিতার জন্য চেষ্টা করার কারণে, তাদের কাছাকাছি অন্য রাষ্ট্রগুলি দৃশ্যপটে এসেছে যারা অপেক্ষাকৃত কম সভ্য, আর এটা এ কারণেই যে, তারা অধিক শক্তিশালী এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত জাতি।"

সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং উল্লেখ করার বিষয় হল আল-বান্না মুসোলিনিকে সংশোধন করে উল্লেখ করেছেন, গোটা সমাজের সামরিকীকরণ ফ্যাসিবাদ শুরু করেনি বরং শুরু হয়েছিল তেরো শতাব্দী

আগে, ইসলামের ইতিহাসের জন্মলগ্নেই। আল-বান্না আরও বলেছেন, ইসলাম মুসোলিনির মতোই সেনাতান্ত্রিক চেতনাকে শ্রদ্ধা করে, চায় প্রত্যেক মুসলিমের আত্মায় তা গেঁথে যাক। "কোরআনে খুব কম সুরা আছে যেখানে মুসলিমদের আহ্বান করা হয়নি আল্লাহ্‌র নামে জিহাদে সাহস, সহ্যশক্তি এবং জঙ্গীভাব প্রদর্শন করার"।

পরিশেষে, আল-বান্না কোরআন থেকে অসংখ্য আয়াত এবং নবীর বক্তব্য উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ইসলাম একটি সামরিক ধর্ম—কিন্তু ফ্যাসিবাদের থেকে মাত্র একটি ছোট কিন্তু নির্ণায়ক পার্থক্য আছে। তিনি লিখেছেন, "ফ্যাসিবাদীদের লক্ষ্য সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত পার্থিব বস্তু লাভ, অপরপক্ষে "ইসলামের লক্ষ্য পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা"।

আল-বান্নার আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই সশস্ত্র জিহাদের ভাবনাকে যে উচ্চ আসনে রাখা হয়েছে তা স্পষ্ট তার নিজের তৈরী প্রতীকচিহ্ন থেকে—কোরআনের নিচে দু'টি তরবারি ক্রস করে রাখা, তার নিচে একটি আয়াতের প্রথম শব্দ—"এবং প্রস্তুত হও"। সুরা ৮ এর এই আয়াতটি (নং ৬০) হল "আর তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব বাহিনী, তা দিয়ে তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্‌ তাদেরকে জানেন। আর আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না"। এই প্রতীকের ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী, অনেকে এও বলে থাকেন যে এটি স্বস্তিকা চিহ্নের ইসলামি সংস্করণ কিন্তু ব্রাদারহুডের প্রথম ঘোষণাপত্রের (manifesto) প্রথম লাইন তর্কাতীত, এখনও অবধি যেখানে সশস্ত্র জিহাদের স্পষ্ট আহ্বান, সময়ের প্রেক্ষিতে প্রসঙ্গ বদল হয় মাত্র। "আল্লাহ্‌ আমাদের লক্ষ্য, কোরআন আমাদের সংবিধান, নবী আমাদের নেতা, জিহাদ আমাদের পথ, আল্লাহ্‌র জন্য মৃত্যু আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি"।

মূলতঃ এই আহ্বান ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, সেইসঙ্গে মিশরের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে, যারা ১৯২২ সালে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রতিষ্ঠা করে। ঐ বছরের প্রথমদিকে মিশর যখন

লিখিতভাবে স্বাধীনতা লাভ করে, তখনও পর্যন্ত সে বৃটিশ শাসনাধীনেই রয়ে যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন আইনজীবি এবং রাজনীতিবিদ একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন যা মুসলিম ব্রাদারহুডের পছন্দের থেকে অনেক উদার এবং গণতান্ত্রিক—তখনও পর্যন্ত মিশরে যা প্রচলিত ছিল তার থেকে অনেক বেশী প্রগতিশীল, কারণ এটি আরও অনেক বিষয়ের সাথে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার এবং সন্দেহাতীতভাবে সংবাদ মাধ্যমের, চিন্তার এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

এই সংবিধান প্রণেতাদের একজন সদস্য ছিলেন ইহুদী ইউসেফ কাত্তাবি (Youssef Qattawi) যিনি পরে দেশের অর্থমন্ত্রী হয়ে কাজ করেছেন এবং আরব দুনিয়ায় প্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। যে সময়ে ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন উইসা ওয়াসেফ (Wissa Wassef)—একজন কপটিক চার্চের সদস্য—ছিলেন মিশরের সংসদের প্রেসিডেন্ট। মুসলিম ব্রাদারহুড একজন খ্রীষ্টান এবং ইহুদীকে তাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসার অধিকারের বিরোধিতা করে, তারা দাবি করে শুধু মুসলমানদেরই অধিকার আছে মুসলমানদের শাসন করার—তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হবে শরীয়া আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রজাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা। কাত্তাবির পৌত্রেরা বর্তমানে নির্বাসনে আছে। মিশরের প্রদেশগুলিতে কিংবা সরকারে দ্বিতীয় প্রধান হিসাবে কোন খ্রীষ্টান থাকতে পারে এ বিষয়ে ওয়াসেফ এর ততক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ ছিল না—যতক্ষণ না মৌলবাদীরা তাদের কোন চার্চ আক্রমণ করেছে বা কোন খ্রীষ্টান স্কুলে বোমা মেরেছে।

লক্ষণীয়, গণতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক সংশয় সত্ত্বেও এই সময়ে মিশরে যে নির্বাচন হয় তাতে উদারপন্থী ও বামপন্থী দলগুলি জয়লাভ করে, কারণ মৌলবাদী জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীরা ভোটারদের সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৩০ এর দশকে রাজা ফারুক (King Farouk) দেশের গণতন্ত্রকে খর্ব করতে ও সংসদের ক্ষমতার খোলস সরিয়ে দিতে পদক্ষেপ নেন, তখন সংসদ রাজার নিজস্ব কিছু বিষয় নগ্নভাবে প্রকাশ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করল। বামপন্থী এবং উদারপন্থীরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তারা ক্ষমতালিপ্সু ফারুকের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ইতিহাসে এই প্রথম দলে দলে শ্রমিক,

ছাত্ররা রাস্তায় মিছিল করল মিশরের রাজার বিরুদ্ধে। মুসলিম ব্রাদারহুড সুযোগের গন্ধ পেল।

প্রথাগত রাজনৈতিক দল না হলেও মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যরা যোগ দিল অতিজাতীয়তাবাদী মিশর আল-ফাতাহ্ (Misr al-Fatah=Young Egypt)-তে, যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৩৩ অক্টোবরে এবং গঠন ছিল NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei or National Socialist German Workers' Party)-র আদলে। মিশর আল-ফাতাহ্ তাদের দলীয় সভায় হিটলারের অভিবাদন (salute) পদ্ধতিও ব্যবহার করত। দলের দু'জন তরুণ অফিসার গামাল আবদেল নাসের (Gamal Abdel Nasser) এবং আনোয়ার সাদাত (Anwar Sadat) মিশরের ভাগ্য গঠনের কাজ শুরু করলেন, উভয়েই এই সময়ে সমর্থন করলেন ব্রাদারহুডের সাথে মেলবন্ধনকে।

মিশর আল-ফাতাহ্ এবং মুসলিম ব্রাদারহুড উভয়ে ইটালি এবং জার্মানীর ফ্যাসিস্ট দলের আদলে আধাসামরিক বাহিনী সৃষ্টি করল। গোপন শিবিরে অস্ত্র মজুদ এবং দলের প্রশিক্ষণ শুরু হল। এই সময় থেকে মুসলিম ব্রাদারহুডের যুব বিভাগ খয়েরী রঙের শার্ট পরত, ট্রেনিং এর সময় চিৎকার করে বলত, "যুদ্ধ, আনুগত্য, নীরবতা!"—এটি ধার করা হয়েছিল মুসোলিনির ব্ল্যাকশার্টদের থেকে। ইতিমধ্যে ইয়ং ইজিপ্ট পার্টির সমর্থকরা সবুজ শার্ট পরে কায়রোর রাস্তায় মশাল নিয়ে মিছিল শুরু করল, উচ্চৈস্বরে বলতে লাগল "মিশর সেরা" (Egypt First), যেন "Deutschland, Deutschland über alles."-এর প্রতিধ্বনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আনোয়ার সাদাত গ্রেপ্তার হন এবং তার জেল হয় জার্মানীর গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যোগাযোগ রেখে চলার কারণে এবং জার্মান টেলিযোগাযোগ যন্ত্র রাখার অভিযোগে। মিশরের সেনাবাহিনী সার্বিকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক ছিল, তবু রাজা ফারুক লণ্ডনের পরিবর্তে বার্লিন এবং রোমের অক্ষশক্তির প্রতি নৈকট্য অনুভব করলেন, সাগ্রহে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলেন নাৎসী সরকারের সাথে। মিশর ব্রিটেনকে কি বার্তা দিতে চাইছে তা বুঝে হিটলার কৃতজ্ঞতার সাথে রাজা ফারুকের বন্ধুত্বের চেষ্টাকে গ্রহণ করলেন, যাকে সমর্থন করল ইয়ং ইজিপ্ট এবং মুসলিম ব্রাদারহুড।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থনের ভিত্তি নগণ্য হয়ে গেল। কিন্তু যখন নাৎসী অপপ্রচার মিশরে ছড়িয়ে পড়ার পর ইহুদী-বিরোধী মানসিকতা নীলনদ অঞ্চলে বৃদ্ধি পেল, সমস্ত বিষয়টা বদলে গেল। হাসান আল-বান্না ইহুদী-বিরোধী স্ফুলিঙ্গকে জ্বালিয়ে রাখলেন, তিনি একটি পত্রিকায় লিখলেন, বার্লিন, রোম, টোকিও এর অক্ষশক্তির দেশগুলি ইতিমধ্যেই ইসলামি মনোভাবাপন্ন, বস্তুতপক্ষে আধা-ইসলামি। তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আল-আজহারকে নির্দেশ দিলেন আলোচ্য উৎসাহী দেশগুলিতে ইসলামি হাফেজদের পাঠাতে, যাতে তারা আরও গভীরভাবে ইসলাম সম্বন্ধে শিক্ষা পায় এবং পরিবর্তে তাদের কঠোর সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং তার অন্তর্নিহিত আদর্শকে আবিস্কার করতে পারে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুসলিম ব্রাদারহুড সদস্যরা গুজব ছড়িয়ে দিল হিটলার ধর্মান্তরিত হয়েছেন, গোপনে মক্কায় হজ করেছেন এবং নতুন নাম গ্রহণ করেছেন হাজী মহম্মদ হিটলার—মিশরের মানুষদের মধ্যে নাৎসী সহানুভূতি জাগাতে যা কিছু করার তা সবই তারা করেছিল, মূলত ব্রিটিশদের দুর্বল করার জন্য। যদি হিটলার মিশর আক্রমণ করতেন, তারা পাঠকদের বলত, শুধুমাত্র ব্রিটিশ ভবনগুলিই ধ্বংস হবে; মসজিদ এবং অন্য ইসলামি ভবনগুলি আল্লাহ্-ভীরু ফুয়েরার সুরক্ষিত রাখবেন।

ব্রাদারহুড নাৎসীদের পক্ষে এই অপপ্রচার করেছিল রাজা ফারুকের আদেশে, জার্মানীর সাথে যোগাযোগের পর, অথবা নিজেদের উদ্যোগেই তা অস্পষ্ট। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তাহা হুসেইন (Taha Hussein) মিশরের অগ্রণী শিক্ষাবিদ, প্রকাশ্যে ফারুক এবং ব্রাদারহুড উভয়ের সমালোচনা করলেন তাদের জার্মান পক্ষাবলম্বনের জন্য। আব্বাস এল-আক্কাদ (Abbas el-Akkad), একজন লেখক এবং সংসদ-সদস্য ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে তারা জার্মান গোয়েন্দা দপ্তর থেকে টাকা নিয়েছে মিশরে ফ্যাসিবাদের পত্তন করার জন্য। ২০০৯ এ জেফ্রি হার্ফ তার বই "আরব বিশ্বে নাৎসী অপপ্রচার" (Nazi Propaganda for the Arab World,)-এ (Jeffrey Herf) এল-আক্কাদ-এর দাবিকে সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে নাৎসীরা দেখেছিল তাদের ইহুদী-বিরোধী আদর্শকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ব্রাদারহুড সেনা-সহযোগীর চেয়ে অধিক কার্যকর।

পঞ্চাশটি বিষয়ের প্রকল্প

মিশরের গণতান্ত্রিক দলগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভক্ত হয়ে গেল; কিছু দল আগ্রহী ছিল যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষ নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে, অন্যেরা গুরুত্ব দিল মিশরের নিরপেক্ষ থাকা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে। তবুও অন্যেরা যখন নতুন করে রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে মিশরের রাস্তায় নামল, মুসলিম ব্রাদারহুড তার স্বার্থরক্ষায় দৌড়ে এল, এর সমর্থকরা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিছিল করল প্ল্যাকার্ড উঁচু করে যেখানে লেখা, "সুলতানের পক্ষে আল্লাহ" (Allah is with the king)।

হাসান আল-বান্না বহুবার প্রস্তাব দিয়েছেন খলিফাতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনে ফারুককে "আমীরুল-মুমিনীন" ("Amir al-Mu'minin"), "বিশ্বাসীদের নেতা" ("Commander of the Faithful") উপাধিতে সম্মানিত করা হোক। ১৯৩৬ সালে রাজার অভিষেকের সময়, আল-বান্না নতুন দেশ এবং আরব বিশ্বের নেতাদের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লেখেন যার শিরোনাম "আলোর পথে" (Toward the Light)। যেখানে তিনি পঞ্চাশটি পদক্ষেপের দাবি করেন যার দ্বারা কাঙ্খিত আলোকে পৌঁছনো যাবে। চিঠিটি, মুসলিম ব্রাদারহুডের একনায়কতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী আদর্শের ভয়ানক জ্বলন্ত প্রমান, আল-বান্না অন্যান্য বিষয়ের সাথে দাবি করেছেন:

১. সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তিকরণ এবং সম্মিলিতভাবে উম্মাহ-র রাজনৈতিক শক্তির পুনর্গঠন।

২. ইসলামি শরীয়ার সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে আইনের সংস্কারসাধন।

৩. বিভিন্ন যুবদলের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি, ইসলামি জিহাদকে ভিত্তি করে সৈনিকের তেজ সদস্যদের মনে জ্বালিয়ে দেওয়া।

৪. পূর্বতন খলিফাতন্ত্র ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ইসলামি দেশগুলির সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৫. সরকারী পদাধিকারীদের মধ্যে ইসলামি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

৬. গোপনে আধিকারিকদের আচরণের উপর নজর রাখা। কারণ পেশাদারী এবং ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তব পার্থক্য রাখা অসম্ভব।

৭. ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কাজের সময়ের পুনর্বিন্যাস।

৮. ইসলামি নিয়ম মেনে সমস্তরকম সরকারি পদ্ধতির (ছুটির দিন, কাজের সময় ইত্যাদি) সামঞ্জস্যসাধন।

৯. সেনাবাহিনীতে এবং শাসনবিভাগীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় আল-আজহার প্রতিষ্ঠানের স্নাতকদের নিয়োগ।

এইরকম পঞ্চাশটি বিষয়ের ঘোষণাপত্র আজও রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে কার্যকর—শুধুমাত্র মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যদের জন্যই নয়, অন্য অসংখ্য ইসলামপন্থী গ্রুপের জন্যও। ছিয়াত্তর বছর পরে ২০১২ সালে ব্রাদারহুডের নির্বাচনে জয়ের পর, এর দাবিগুলি মিশরের সংসদে বিস্তারিত আলোচিত হয়। এই দাবিগুলির প্রেক্ষিতে, আমার কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হয় কিভাবে কেউ দাবি করে মহম্মদ মোরসিকে তার পদ থেকে অপসারণ একটি গণতন্ত্রের বিচ্যুতি।

মোরসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর, মুসলিম ব্রাদারহুড মিশরের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তাদের উপস্থিতিকে শক্তিশালী করে, এই আশা করে যে আল-বান্নার কর্মসূচী যাতে মোক্ষম সময়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুযোগ বুঝে বিশাল সংখ্যক মানুষকে জিম্মি করে সহিংস পথে তাদের শেষপর্যন্ত মুক্তি দেওয়াই ছিল লক্ষ্য—এই একটিই পথ তাদের জানা আছে, সেটা গণতান্ত্রিক হোক বা না হোক।

সিক্রেট সার্ভিসের (SS) ছায়ায় সন্ত্রাস

যখন কোন দল সেনাতন্ত্রকে এবাদত করে, গণতন্ত্রকে মনে করে বিপজ্জনক, পৃথিবীকে ভাগ করে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীতে, জিহাদকে মনে করে মহত্তম লক্ষ্য, সেই দল যে তার বিরোধীকে শেষ করে দিতে হাতে অস্ত্র তুলে নেবে এটা শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রথম শত্রু ছিল মিশরের বামপন্থী দলগুলি, যদিও হাসান

আল-বান্না এই তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন যে সামাজিক ন্যায়ের ধারণা অবশ্যই ইসলামি বিষয়। মিশরের ভোটদাতারা স্পষ্টতই বামঘেঁষা এবং যতদূর অনুমান করা যায় ভবিষ্যতে তাই থাকবে, এটা জেনেও আল-বান্না তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; 'ব্যলটবাক্সে নয় রাস্তায়'; তার জঙ্গীবাহিনীকে দায়িত্ব দিলেন জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির।

নাৎসী জঙ্গীদের মতো প্রথমদিকে এদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল বাম-বিক্ষোভ এবং শিল্প ধর্মঘটের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণে। ব্রাদারহুডকে গুছিয়ে তোলার জন্য আল-বান্না এতদূর এগিয়েছিলেন যে ব্রাদারহুডের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ ছিল, যার নাম আল-জিহায আল-সিররি (al-Jihaz al-Sirri), "গোপন শক্তি"। এই দল এত অল্প সময়ে কিভাবে অস্ত্র, অর্থ, ব্যবহারিক দক্ষতা (know- how) অর্জন করল আজও সে এক রহস্য; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নিয়মিত সৌদি আর্থিক সাহায্য এখানে ছিল, কিন্তু বহু অভিজ্ঞরা মনে করেন, বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তা ছাড়া এমন পেশাদার সেনা প্রশিক্ষণ, সেইসঙ্গে প্রশাসনিক এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থার পরিকাঠামো থাকা সম্ভব ছিল না। আল-জিহায আল-সিররির প্রথম দিকের নেতাদের একজন এবং পরে দল থেকে পলাতক আলি আশমাউই (Ali Ashmawi), তার বই মুসলিম ব্রাদাহুডের গোপন ইতিহাস (The Secret History of the Muslim Brotherhood)-এ লিখেছেন 'গোপন শক্তি' গঠন করার আগে হাসান আল-বান্না শুধু নাৎসী ও গেস্টাপো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই পড়াশোনা করেননি, তিনি ইহুদীদের গোপন গঠনতন্ত্রও পড়েছিলেন। প্রভাবশালী দলগুলির সাফল্যে একটি বিশেষ প্রভাব থাকে, এক্ষেত্রে সেটি অবশ্যই মধ্যযুগীয় ইসলামি দলগুলির প্রভাব, যারা ১০৮০ থেকে ১২৭০ সালের মধ্যে অসংখ্য সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক আক্রমণ ঘটিয়েছিল, ইতিহাসে যা "হত্যা" (assassins) নামে পরিচিত। মার্কো পোলোকে ধন্যবাদ, তিনি একটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন যার সদস্যরা ড্রাগের প্রভাবে থাকা অবস্থায় হত্যা করত। ঐ দলের ল্যাটিন নাম এখন পৃথিবীর হত্যাকারীদের প্রবাদনামে পরিচিত হয়ে গেছে। শব্দটির বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি আছে। একটি হল আরবী হাশিশ ("the herb" or "hemp") এবং হাশাশিন ("হাশিশ ধূমপায়ী")। সিরিয়াতে একটি সুফী সম্প্রদায় গুপ্তঘাতক (asasin)

নামে পরিচিত ছিল, পরবর্তীকালে ঘৃণাভরে ঐ লোকদের বলা হত “বেহেড-মাতাল” (off their heads)।

কথিত আছে, হাসান-ই সাবাহ (ca. ১০৩৪-১১২৪), গ্রুপের পার্শিয়ান প্রতিষ্ঠাতা তার অনুসারীদের সংগ্রহ করেছিলেন আলামুট পর্বতের দুর্গ ধ্বংস করার জন্য, এই মৃত্যু অভিযানের আগে তাদের স্বর্গসুখ দেওয়ার জন্য লোভ দেখানো হয়েছিল আফিম এবং হাশিশের, দেওয়া হয়েছিল উত্তম খাদ্য এবং সুন্দরী নারী। এই অনুসারীরা তাকে এমন প্রশ্নাতীতভাবে সমর্থন করত যে তিনি আদেশ করলে তারা স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দিত। তার দুই পুত্রকে হত্যা করা হয়েছিল “বিপথগামী” হওয়ার জন্য।

আজকের অনেক জিহাদ প্রচারকারী ধর্মপ্রচারক যারা ভীতিপ্রদ প্রতিশ্রুতি ও বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে তাদের ভক্তদের আত্মহত্যায় প্ররোচণা দেয় সেগুলি এমন কি মনে করিয়ে দেয় পর্যটক মার্কো পোলো যে গুপ্তহত্যাকারীদের বর্ণনা দিয়েছেন সেই গল্পকথাকে। একইভাবে আয়াতোল্লা খোমেইনি (Ayatollah Khomeini) একবার সাদ্দাম হুসেইনের (Saddam Hussein) বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশের আগে তার নাবালক সৈন্যদের বেহেস্তের চাবি বলে প্লাস্টিকের চাবি দিয়েছিলেন।

হাসান আল-বান্না অবশ্যই এমন এক বাহিনীর স্বপ্ন দেখেছিলেন যার সদস্যরা প্রশ্নহীন হয়ে নির্ভয়ে তাকে অনুসরণ করবে, মধ্যযুগের হত্যাকারীদের মতো বা হিটলারের সিক্রেট সার্ভিসের (SS) মতো তার স্বপ্নপূরণ করবে, সেই পূর্ণ আনুগত্যই আজকের মুসলিম ব্রাদারহুডের মূলনীতি। ‘গুপ্ত বাহিনীর’ সদস্য নির্বাচনের জন্য আল-বান্নার হুকুমে অত্যন্ত যত্নসহকারে ঝাড়াই-বাছাই করা হত; ব্রাদারহুডের সদস্যপদে তাদেরকেই যোগদানে অনুমতি দেওয়া হত যাদেরকে বিশেষ গোষ্ঠীর নির্বাচিত পরিবারের সম্পূর্ণ ঈমানদার সন্তান বলে গণ্য করা হত; তাদেরকে যেতে হতো নানা রকম প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে এবং পালন করতে হতো সকল ধর্মীয় রীতিনীতি।

ব্রাদারহুডের আর এক পলাতক সদস্য এবং লেখক থরওয়ার্ট আল-খিরবাউই (Tharwat Khirbawi), তার “মসজিদের রহস্য”(The Secret of the Temple) বই-এ প্রকাশ করেছেন ব্রাদারহুডের গুপ্ত-শাখা পরিচালিত হয় স্বৈরাচারী এবং মাফিয়া মানসিকতার মানুষদের নিয়ে, উপরন্তু

সদস্যদের মেনে চলতে হয় দলের আভ্যন্তরীন পদবিন্যাসের প্রতি আনুগত্য এবং করতে হয় প্রারম্ভিক অনেক কষ্টসাধ্য এবং অপমানজনক কাজ। তিনি বর্ণনা করেছেন পিস্তল হাতে নিয়ে নতুন সদস্যকে কোন গোপন জায়গায় আসতে বলা হয়, কিছু নেতৃস্থানীয় ‘গোপন শক্তি’-র নেতার সামনে কোরআন ছুঁয়ে শপথ নিতে। তারা কসম করে যে চিরকাল প্রশ্নহীনভাবে আন্দোলন এবং শীর্ষনেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকবে। এ কথা বলেই দ্রুত অস্ত্রটি খুলে আবার বন্ধ করে ফেলে।

১৯৪৫ এর প্রথম দিকে হাসান আল-বান্না মিশরের সংসদ নির্বাচনে দাঁড়ান। হেরে যেতেই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন, আল-বান্না হুমকি দিলেন তিনি ২০০,০০০ সমর্থককে নিয়ে সংসদ অভিযান করবেন, যেমন মুসোলিনির কালোশার্টরা ১৯২২ সালে করেছিল এবং পরের বছর হিটলার করতে চেয়েছিলেন তার সরকার উৎখাতের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর। অল্পকাল পরেই বামপন্থী প্রধানমন্ত্রী আহমদ মাহির (Ahmad Mahir) নিহত হন মুস্তাফা এসাউই (Mustafa Essawy) নামে এক জাতীয়তাবাদী যুবকের গুলিতে, কয়েক বছর পর জানা যায় সে ব্রাদারহুডের গুপ্ত বাহিনীর সদস্য ছিল। সংসদে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাব আনার পর মাহির নিহত হন; ব্রিটেন মিশর সরকারকে জানায় যে পয়লা মার্চ, ১৯৪৫ এর আগে যে সমস্ত রাষ্ট্র অন্তত একটি অক্ষশক্তি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যুদ্ধের পর সেই রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে কমনওয়েলথ অব নেশনস (Commonwealth of Nations) গঠন করা হবে।

ব্রিটেন আশা করেছিল মিশর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, কিন্তু রাজা ফারুক বারবার এর বিরোধিতা করলেন, পরিবর্তে জাপানকে বেছে নিলেন। “হাসান আল-বান্না, এক অচেনা মানুষ” (“The Hassan al-Banna No One Knew”) বইয়ের লেখক ইসলাম বিশেষজ্ঞ হিলমি নামনাম (Hilmi Namnam) অনুমান করেন, প্রধানমন্ত্রীর হত্যা সংঘটিত হয়েছিল জার্মানীর সহযোগীতায়, (আমিন আল-হুসেইনিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যুক্তি দিয়ে লিখেছেন) সবাই যেমন ভাবত তার চাইতে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে নাৎসীদের সম্পর্ক ছিল অনেক গভীর। আল-বান্না যে কোন মূল্যে জার্মানীর জয় আশা করেছিলেন—আদর্শগত কারণ এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে মিশরের মুক্তি, এই উভয় কারণে। সর্বোপরি তার

দেশের উদারপন্থী এবং বামপন্থী দলগুলির হাত থেকেও রেহাই পাওয়া, যারা তার মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

জার্মানী এবং তার সহযোগীরা যুদ্ধে পরাস্ত হল, কিন্তু আল-বান্নার লক্ষ্য এবং সন্ত্রাসী আন্দোলন বেঁচে রইল, শুধু ফারুক সময়ের সাথে সাথে তাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেললেন। ১৯৪৭ সালে মুসলিম ব্রাদারহুড বহু জাতীয় স্থাপত্য এবং সিনেমা হলের উপর আক্রমণ করে, যার ফলে মৃত্যু হল দু'জন ব্রিটিশ নাগরিক ও একজন বিচারপতির, যিনি অনেক ব্রাদারহুড সদস্যের ফাঁসির রায় দিয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি ঘটানোর একটা সুযোগ এসেছিল ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে। মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, ইরাক, এবং লেবানন সবাই খুব দ্রুত নবজাত ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে অগণিত যোদ্ধা প্যালেস্টাইনে মিশরীয় বাহিনীর সাথে যোগ দিল, বিজয়ী বীরের বেশে বাড়ী ফিরবে এই আশা নিয়ে—কিন্তু আরবের গর্বিত বাহিনী করুণভাবে পরাজিত হল, দেশে ফিরল "অপমানিত" হয়ে।

এই ব্যর্থতার পর ব্রাদারহুড তার সন্ত্রাসী আক্রমণ তীব্রতর করে। প্রাথমিক লক্ষ্য হল জাতীয় স্থাপত্য এবং মিশরের ইহুদীরা। যখন নতুন প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আন নুকরাশি (Mahmoud an Nukrashi) ১৯৪৮ সালে ডিক্রী জারি করে ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং বল প্রয়োগ করে ভেঙে দিলেন, তিনিও নিহত হলেন ব্রাদারহুডের এক সদস্যের দ্বারা। শাসকপক্ষ কঠোর প্রতিআক্রমণ করল, বহু সদস্য গ্রেপ্তার হল। ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৪৯ হাসান আল-বান্না প্রকাশ্য রাস্তায় গুলিতে নিহত হলেন। সম্ভবত মিশরের রাজ পরিবারের নির্দেশে এ ঘটনা ঘটে। রাজ পরিবার তার গতিবিধি এবং কর্মকাণ্ডের উপর নজর রাখত এবং তীব্র অস্বস্তি বোধ করত—তবুও তার পরের বছরেই মুসলিম ব্রাদারহুড পুনর্জীবন লাভ করে।

গণতন্ত্র যেন ট্রয়ের ঘোড়া

আল-বান্না তার অনুকরণীয় আদর্শ হিটলারের মতো বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দলগুলি যেভাবে লড়াইয়ের ময়দানে কামড়াকামড়ি করে, তাতে তিনি মনে করতেন গণতন্ত্র কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে সামান্য কিছু বেশী। ১৯২৩ সালে সরকার ফেলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা হিটলারকে দীর্ঘ ঘুরপথে ক্ষমতালাভ করতে বাধ্য করেছিল। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও হিটলার কখনো তার মনোভাব গোপন করেননি। তার মতে, গণতন্ত্র ক্ষমতার লাগাম হাতে পাওয়ার একটি উপায়, যেখানে প্রধান দলগুলি তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে কিন্ত তারই দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত হবে। রাজনীতিবিদ ফ্রানজ ভন পাপেন (Franz von Papen) খারাপভাবে বলেছিলেন, হিটলারকে যারা ছোট করে দেখছে শীঘ্রই তারা এমন বাঁশ খাবে যে কেঁদে কূল পাবে না।। চ্যান্সেলর হিসাবে হিটলারের নিয়োগ প্রতিষ্ঠিত দলগুলিকে একটি শিক্ষা দিয়েছিল, তবে যে ভাবেই হোক, তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, গণতন্ত্রেরই নিয়মগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার করে, একে একে সেই নিয়মগুলিকেই শেষ করেছিলেন এই একনায়ক।

মুসলিম ব্রাদারহুডের গণতন্ত্রের সাথে বোঝাপড়া এবং সম্পর্ক ছিল সবসময়েই ঠিক একই রকম। আল-বান্নার মৃত্যুর পর, ব্রাদারহুডও ক্ষমতালাভের পথে জোটের বাস্তবতা অনুভব করল। গামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে মার খেয়ে ফিরে আসা চাকরিচ্যুত অফিসারদের আন্দোলনের সাথে প্রথমে তারা ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করল। ইজরায়েল রয়ে গেল অবিজিত, অথচ ব্রিটিশ শাসন চলতেই থাকল; রাজা কারো বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ নিতে হয় অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক ছিলেন।

মুসলিম ব্রাদারহুড এবার প্রকাশ্যে ফারুকের বিরোধিতা করল এবং ১৯৫২ সালের জুলাই-এ রাজাকে সরাতে সেনা অভ্যুত্থানকে সমর্থন করল। রাজা বাধ্য হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে ইটালিতে পালিয়ে গেলেন। এর পরেই মিশরে শুরু হল ক্ষমতার লড়াই, ব্রাদারহুডের সাথে নাসেরের আন্দোলনের জোট ভেঙ্গে গেল। নাসের চাইলেন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা —ব্রাদারহুড দাবি করল মোল্লাতন্ত্র আর উদারপন্থী ও বামপন্থীরা চেষ্টা করল গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে। নাসের প্রস্তুত ছিলেন কিছু ছাড় দিতে, কিন্তু ব্রাদারহুড বিদ্রোহ করল, আবার দেশে শুরু হল সন্ত্রাস। ১৯৫৪

সালে অক্টোবর মাসে নাসেরকে হত্যার একটি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এই ইসলামপন্থী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো; কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল এবং ব্রাদারহুড মিশরের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের জন্য নিষিদ্ধ হল, হাজার হাজার সদস্যকে পাঠানো হল বন্দীশিবিরে।

বন্দী অবস্থায় ব্রাদারহুড আরও বেশী মৌলবাদী হয়ে উঠল, বাইরে ছোট ছোট গ্রুপের সন্ত্রাসী আন্দোলন শুধু মিশরকে নয়, গোটা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিল সন্ত্রাসের প্রকৃত অর্থ কি। এই সময়ে মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট গ্রুপ গুলির মধ্যে তিনটি ছিল অতি ভয়ঙ্কর; হরকত-উল-জিহাদ আল-ইসলামি (Harkat-ul-Jihad al-Islami), আল-গামা আল-ইসলামিয়া (al-Gama'a al-Islamiyya) এবং তকফির ওয়াল-হিজরা (Takfir wal-Hijra)।

সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের একটি নতুন ধাক্কা মিশরে আছড়ে পড়ে ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি। আক্রান্ত হয় কল-কারখানা এবং সেনাবাহিনী, ইসলামপন্থীরা সেগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ফলস্বরূপ এই আন্দোলনের মাস্টারমাইণ্ড সাইয়্যেদ কুতব (Sayyid Qutb)-এর মৃত্যুদণ্ড হয়। তবুও তিনি যে নব্য-জিহাদী মানসিকতা প্রচার করেছিলেন আজও তা সারা পৃথিবীর ইসলামপন্থীদের প্রভাবিত করে (পরবর্তী কালে আরও বেশী)। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধ, মিশরের দ্বিতীয় সেনাপরাজয়, মিশরের ইসলামপন্থীদের আদর্শগত সাফল্য এনে দিল। নাসেরের ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা দেখে তারা মোল্লাতন্ত্রের পুনর্জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। মুসলিম ব্রাদারহুডের নতুন শ্লোগান জন্ম নিল, "Al-Islam hual hal"—"ইসলামই একমাত্র সমাধান"।

শব্দবন্ধটি মিশরের জনগণের ব্যাপক সমর্থন আদায় করে নিল, যদিও নাসেরের পুলিশ-রাজত্বে ব্রাদারহুডের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার ছিল না। ফলে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃস্থানীয় বহু শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার সৌদি আরবে চলে গেলেন। প্রথমে যাকে মনে হয়েছিল পিছু হটা, সেটাই বিশেষ ভাল ফল দিল। যারা স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়েছিলেন তারা সাইয়্যেদ কুতব-এর মতাদর্শ প্রচার করলেন অক্ষরে

অক্ষরে। কয়েক দশক পর সৌদি ওয়াহাবিজম-এর সাথে মুসলিম ব্রাদারহুডের দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হল।

১৯৭০ সালে গামাল আবদেল নাসেরের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পর তার সহকারী আনোয়ার সাদাত (Anwar Sadat) মিশরের ক্ষমতার লাগাম হাতে নিলেন, চেষ্টা করলেন একটা পরিবর্তন আনতে। সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে তিনি পাশ্চাত্যের সাথে সম্পর্ক গড়তে চাইলেন। নাসেরপন্থী এবং মার্ক্সবাদীরা একইসাথে বিদ্রোহ করল। গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলন শুরু হল সাদাতকে অভিযোগ করে যে তিনি গণতন্ত্রবিরোধী। তিনি তখনও নাসেরের রেখে যাওয়া স্বৈরতান্ত্রিক শাসনই চালু রেখেছিলেন। সমস্ত দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে সাদাত শক্তিবৃদ্ধি করতে চাইলেন এবং তা খুঁজে পেলেন মুসলিম ব্রাদারহুড এবং তার ইসলামি সহযোগীদের মধ্যে।

ব্রাদারহুড আরও একবার রাজা নির্ণায়কের ভূমিকা লাভ করল, প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে সাদাতকে ক্ষমতায় রেখে দিল। যদিও এর সমর্থকরা সেই হাতটিই কামড়াল যে তাদের খাইয়েছিল। মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হরকত-উল-জিহাদ আল-ইসলামি ইজরায়েলের সাথে শান্তি চুক্তি করার কারণে হত্যা করল প্রেসিডেন্ট সাদাতকে, ব্রাদারহুড এবার সাদাতের উত্তরসূরী হোসনি মুবারককে (Hosni Mubarak) দেশে পুলিশ-রাজ কায়েম করতে নির্দেশ দিল।

বারবার মুবারক কঠোর দমনকে যাথার্থ্য দিলেন এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারকে পিছিয়ে দিলেন এই যুক্তিতে যে এর ফলে ইসলামি হুমকি কোণঠাসা হয়ে পড়বে। এই ঘটনা ব্রাদারহুডের ইতিহাসে বারবার ঘটে। এর সদস্য সমর্থকরা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাথে জোট গড়ে ক্ষমতা দখল ক'রে তদেরকেই আক্রমণ করে, তারপর ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, তারপর পুনর্বাসনে যায় এবং আবার শক্তিবৃদ্ধি করে ফিরে আসে।

ইতিপূর্বেই মিশরের কিছু ইসলামপন্থী যোদ্ধা দেশ থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে যায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আর এখানেই মুসলিম ব্রাদারহুড তার তৃতীয় পরিণয় সুসম্পন্ন করল ওয়াহাবিদের সাথে। আফগানিস্তানে পুলিশ ও পর্যটকদের উপর আক্রমণ

করে, এবং বিদেশী অবকাঠামো ধ্বংস করে সন্ত্রাসবাদের জোয়ার এনে সেই একই ইসলামপন্থীরা ঘরে ফিরল মিশরে, আলজিরিয়ায়, সৌদি আরবে। ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা এই সময়কালে মিশরে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল, বাইরে মৌখিকভাবে অহিংসার কথা বললেও পর্দার আড়ালে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে পৃথিবীজোড়া এক গোপন জাল গড়ে তুলতে। ১৯২০ সালে দলের গ্রহণ করা প্রথম নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এটা করা হয়েছিল—প্রথমে আরব অঞ্চলের ইসলামিকরণ করা, তারপর বিশ্বজয়।

বাইরে থেকে মনে হয়েছিল মুবারকের ত্রিশ বছরের শাসনকালে মুসলিম ব্রাদারহুড গুটিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, কিন্তু এই স্থবির সময়ে ইসলামপন্থীদের মতো লাভ আর কেউ করেনি। যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি সরকার অবহেলা করেছিল, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেখানে ইসলামপন্থীরা উদয় হলো। তারা তাদের মতো করে গড়ে তুলল—স্কুল, হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এমন আরও কিছু। যদিও বাস্তবে তাদের কোন ইচ্ছা ছিল না জনসাধারণের জন্য শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উন্নতি করার—দারিদ্র দূর করার জন্য আরও কম—বহু মিশরীয়দের এই ধারণা জন্মাল যে ব্রাদারহুড প্রকৃতই একটি রাজনৈতিক বিকল্প।

ডিসেম্বর ২০১০, আরব বসন্ত শুরু হওয়ার পর, মনে হয়েছিল মুসলিম ব্রাদারহুড তার প্রকৃত লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। মিশর এবং তিউনিশিয়ায় ২০১১ এবং ২০১২ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তারা বিদ্যুৎগতিতে তাদের ইসলামি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন শুরু করল। এই কর্মসূচীতে ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য ছিল, সেইসঙ্গে আল-বান্নার পঞ্চাশ দাবির প্রকল্প আলোচিত হল সংসদে, যা আগেই বলা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট মোরসির আদেশানুসারে দেশের বিচার ব্যবস্থার ইসলামিকরণ করা হল, নির্বাচন আইন পরিবর্তিত হল এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা হ্রাস করা হল--ব্যবস্থা নেওয়া হল ঠিক যেমনটি হিটলার নিয়েছিলেন ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর।

১৯৩০ এর জার্মানীর মতো এখানে কোন রাজনৈতিক বোধযুক্ত সমাজ কোনওদিন চিরকালের জন্য নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনী এবং মৌলবাদীদের সীমাহীন ক্রুদ্ধ সংঘর্ষ

দেখতে রাজী ছিল না, আবার তারা কোন পক্ষ জয়ী হয় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতেও অনিচ্ছুক। উভয়পক্ষের এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে আরব বসন্তের সুফলটাই ধ্বংস হয়ে গেল। দিনের পর দিন মোরসি সরকারের অত্যাচার এবং পুরুষতান্ত্রিক আচরণ মিশরবাসীর কাছে এত অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে তাকেও ক্ষমতাচ্যুত করল। আর এটা করে তারা কি গণতন্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল? আমি তা মনে করি না—বরং ঠিক তার উল্টো।

মিশরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা আঁচড় কাটতে পারলো না, বরং বিশ্রীভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে বিশাল সাফল্য লাভ করল, বিশেষত মিশরের দরিদ্র রাজ্যগুলিতে—শুধুমাত্র সংসদীয় নির্বাচনে নয়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও। যদিও মোরসি উদারপন্থীদের একাংশের সমর্থন পেয়েছিলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তিনি সকল মিশরবাসীর জন্যই কাজ করবেন। নির্বাচিত হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই সেই লোক "দাড়িওয়ালা মুবারক" হিসাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন, গণতন্ত্রকে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন এবং ডিক্রী জারি করে নিজের চরম ক্ষমতা নিশ্চিত করলেন। সমস্ত সংগঠিত বিরোধীদল নিষিদ্ধ হল, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অকেজো করে দেওয়া হল এবং সমালোচনাকারী গণমাধ্যমকে আদালতের সাহায্যে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হলো। মোরসির ক্ষমতালাভের এক বছরের মধ্যেই মোহভঙ্গ হওয়া লক্ষ লক্ষ হতাশ মানুষ রাস্তায় নামলেন, সেনাবাহিনীকে বাধ্য করলেন ক্ষমতা থেকে মোরসিকে সরিয়ে দিতে।

মোরসিকে ক্ষমতা থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হল কি না তা নিয়ে প্রচুর উত্তপ্ত বিতর্ক হল—অনেকেই বললেন, সব সত্ত্বেও মোরসি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। আমার অভিমত, জোর করে উৎখাৎ করা তো দূরের ব্যাপার, তার অপসারণ জরুরী ছিল গণতন্ত্রের স্বার্থে, এবং আমি একাই শুধু এমন মনে করি না।

কিভাবে মিশরের সংসদকে ভাঙ্গা সম্ভব? অনাস্থা প্রস্তাব আনা অসম্ভব; বাকী রইল গণপ্রতিবাদ-প্রতিরোধ। এরপর যা ঘটল তা যথেষ্ট ভয়াবহ, সেনাবাহিনীর পক্ষে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না। অবশ্যই সেনার হস্তক্ষেপে ব্যক্তি-স্বার্থ জড়িত ছিল। প্রায় প্রথম থেকেই সিরিয়া

বিষয়ক নীতিতে মোরসি এবং তার ভক্তদের সাথে সেনাবাহিনীর সমস্যা ছিল। সিরিয়াতে মুসলিম ব্রাদারহুড হামাসের সাথে জোটবদ্ধ ছিল—যা মিশরের সেনাকর্তাদের কাছে ছিল অস্বস্তিকর—এবং ব্রাদারহুড মিশরীয়দের আহ্বান জানিয়েছিল সিরিয়ায় জিহাদে অংশ নিতে। ২০১২-র গ্রীষ্মে ষোলজন মিশরীয় সৈন্য সিনাই-এ হামাস সংযুক্ত জঙ্গীদের দ্বারা নিহত হয়। ব্রাদারহুডের জিহাদের ডাক সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে অসন্তোষ সৃষ্টি করল। একসময়, মোরসি যখন সরকারে ছিলেন, ব্রাদারহুড জঙ্গী গ্রুপ আনসার বেইট আল-মাকদিস (Ansar Bait al-Maqdis)-কে সিনাই-এ জিহাদের অনুমতি দিয়েছিল (গ্রুপটি বর্তমানে নিজেদের ইসলামিক স্টেটের অংশ বলে ঘোষণা করেছে)। সর্বোপরি মোরসির অপেশাদার অর্থনীতি দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

মিশরের ভাগ্য অনিশ্চিত অবস্থায় ঝুলে আছে, বহু সম্ভাবনার কথা অনুমান করা হচ্ছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ব্রাদারহুডের ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। মিশরের সর্বস্তরের মানুষ, সেনাবাহিনী, পুলিস এবং বিচার বিভাগ মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরোধিতা করে, কারণ অধিকাংশ মিশরীয় মনে করে ইসলামিক স্টেট (Islamic State) এবং আনসার বেইট আল-মাকদিস (Ansar Beit al-Maqdis) উভয়েই ব্রাদারহুড আদর্শের স্বাভাবিক সন্তান। যখন শত শত সদস্যদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, জনসাধারণের প্রতিবাদ ছিল অতি সামান্য; মিশরের মানুষের কোন স্বাধীন বা গণতান্ত্রিক শাসনের অলীক কল্পনা ছিল না, তবু তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইচ্ছুক ছিল।

একটা কথা সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল উদারপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সংসদ নির্বাচনে ব্রাদারহুডের জয়ের পরে, "গাজওয়াত-আল-সানাডিক" (ghazwat-al-sanadiq) অর্থ "ব্যালট-বাক্স জয়"। গাজওয়া (ghazwa) শব্দটি মনে করিয়ে দেয় সপ্তম শতাব্দীতে নবী মহম্মদের জয়ের কথা। সেই জয় ছিল অবিশ্বাসী মক্কাবাসী, আরবের ইহুদী আদিবাসীদের বিরুদ্ধে। আক্রমণ করা হয়েছিল মক্কার বাণিজ্য কাফেলা, লুঠ করা হয়েছিল তাদের মালপত্র, তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বা হত্যা করা হয়েছিল এবং ইহুদীদের দাসদাসী বানানো হয়েছিল— এই আচরণকে ন্যায্য ভাবা হয়েছিল কারণ ইহুদী বা মক্কাবাসী উভয়েই ছিল অবিশ্বাসী। মোরসির

শাসনকালে ইসলামপন্থীরা তাদের বিরোধীদের সাথে প্রায় একই আচরণ করল, তাদেরকে তকমা দিল অবিশ্বাসী এবং মিশরের নতুন সংবিধানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিতে দিল না—প্রকৃতপক্ষে, আল-কায়েদা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণের নাম দিয়েছিল “গাজওয়াত নিউ ইয়র্ক” (ghazwat New York)। যখন মোরসি-বিরোধী আন্দোলনকারীরা সেনাবাহিনীর সাথে মিলে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিল যে তাদের কোন ইচ্ছে নেই পদচ্যূত প্রেসিডেন্টকে ফিরিয়ে আনার, মুসলিম ব্রাদারহুড আবার সন্ত্রাসের পথে ফিরে গেল, ডাক দিল তাদের বিরোধীদের শেষ করার। এটাও এক পরিচিত ছবি, শেষবারের মতো জানিয়ে দেওয়া হল দলটি কতটা স্বৈরতন্ত্রী। জানুয়ারী, ২০১৫ মিশরীয় হৃদয় মন জয় করার সমস্ত আশা হারিয়ে ব্রাদারহুড তার সদস্যদের নির্দেশ দিল দীর্ঘ, যন্ত্রণাময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে; পরদিনই মিশরের সর্বত্র বোমা পাওয়া গেল, জ্বালিয়ে দেওয়া হল ব্যাঙ্ক, ব্যবসাকেন্দ্র। মনে হল, দলটি ঠিক সেই কাজেই ফিরে গেছে যে কাজটি তারা সবচেয়ে ভাল করতে পারে।

ব্রাদারহুড কখনোই সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি, এর শক্তিশালী অতীত প্রমাণ করেছে এর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। এর অবশিষ্ট সমর্থনের পরিমাণকে ছোট করে দেখা যাবে না, ইতিহাসে তাদের যে মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাকেও উপেক্ষা করা যাবে না; সেটাই মিশরের অতীত—কারণ মুসলিম ব্রাদারহুডের আদর্শ দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যায় ৩

ইসলামি ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক আদিকথা, আব্রাহাম থেকে সাইয়্যেদ কুতব

প্রতি বছর মুসলমানরা পৃথিবীজুড়ে ইদ উৎসব পালন করে, বাইবেল এবং কোরআন উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আব্রাহাম এবং তার পুত্রের কাহিনী স্মরণ ক'রে। কথিত আছে সকল ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলিমদের আদি পূর্বপুরুষ আব্রাহাম স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি নিজে তার পুত্রকে আল্লাহর জন্য কোরবানী করছেন। কোরআন অনুসারে, পরদিন সকালে উঠেই আব্রাহাম একটি ছুরি নিয়ে দৌড়ে তার পুত্রের কাছে গিয়ে তার স্বপ্নের কথা বললেন। বললেন, "পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করছি (জবাই করছি): এখন বল তোমার মত কী"। পুত্র উত্তরে বলল, "পিতা, আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পালন করুন: ইনসাল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন, এ স্থির সত্য"।

কোরআনে আছে, যখন তারা দু'জনে [আল্লাহর ইচ্ছাকে] সম্মান জানিয়ে নিজেদের সমর্পণ করল এবং আব্রাহাম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন তখন "[আল্লাহ] তাকে বললেন, 'হে আব্রাহাম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ!' নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। অবশ্যই এটি ছিল একটি পরীক্ষা। আমি তার কাছে স্মরণীয় কোরবানী দাবি করেছিলাম: আমি তার জন্য এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আশীর্বাদ রেখে দিয়েছি: 'আব্রাহামের জন্য শান্তি ও অভিনন্দন!' প্রকৃতপক্ষে এভাবেই আমি পুরস্কৃত করি যে সঠিক কর্ম করে। নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত"। অতঃপর আল্লাহ পুত্রকে কোরবানী করা থেকে আব্রাহামকে নিরস্ত করলেন, তার ধর্মপরায়নতা এবং আদেশ পালনের মানসিকতার প্রশংসা করলেন, এবং ভিন্ন একটি প্রাণী জবেহের মাধ্যমে তাকে (আব্রাহামের পুত্রকে) মুক্ত করলেন।

এই গল্পের বিভিন্ন বিষয় আজকের মানুষকে বিস্মিত করে। আব্রাহাম স্বেচ্ছায় তার ফুয়েরার (ফুয়েরার একটি জার্মান শব্দ, অর্থ: নেতা বা পথপ্রদর্শক)-এর আদেশ পালন করেছিলেন—অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশের

যৌক্তিকতা বা নৈতিকতা বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করেই, এমনকি যখন তার নিজের পুত্রকে কোরবানী করতে বলা হয়। শিশুর অধিকার এবং পিতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য ও সেই মায়ের সাথে পরামর্শ করার কোনো যৌক্তিকতা তিনি অনুভব করলেন না যে মা এই শিশুটিকে জন্ম দিয়েছে এবং দুধপান করিয়েছে। প্রশ্নহীন আনুগত্য এবং আত্ম-বলিদান ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতপক্ষে আব্রাহামের আগ্রহের সাথে আদেশ পালন এই দুই বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে—ইসলামের মূলনীতির প্রকাশ এই দুই বৈশিষ্টের মধ্যেই। (ইসলাম শব্দটি এসেছে আরবী ক্রিয়াপদ আসলামা [aslama] থেকে যার অর্থ একের প্রতি অন্যের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন।)

তার শিশু পুত্রের আল্লাহ্ বা তার উদ্দেশে বলিদান বিষয়ে কোন ধারণা না থাকলেও আব্রাহাম পুত্রের সাথে তার আসন্ন মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করেন। ফ্যাসিবাদীরাও ঠিক এই কৌশল প্রয়োগ করে, জনসাধারণকে তাদের পছন্দ জানাতে বলা হয় অথচ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বহু আগেই —যোশেফ গোয়েবলস (Joseph Goebbels) তার সমস্ত কাজে এই চতুর প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। বার্লিনে তার কুখ্যাত বক্তৃতায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা কি সর্বাত্মক যুদ্ধে যেতে চান”? জার্মান জনতা গর্জে উঠল “হ্যাঁ” (Ja!)। যে যুদ্ধের কথা তিনি বলেছিলেন নিশ্চিতভাবে সে যুদ্ধ জেতা অসম্ভব, অথচ জনতাকেই পরাজয়ের জন্য দায়ী করা যাবে, বলা যাবে তাদের আত্মোৎসর্গের ঘাটতির জন্যই জার্মানীর পরাজয় ঘটেছে।

কয়েকটি বিষয়ের প্রেক্ষিতে, ফ্যাসিবাদকে একেশ্বরবাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় বলা যায়। যে ধর্মগুলি একাধিক দেবতায় বিশ্বাসী, তারা মোটামুটিভাবে, তিন মহান একেশ্বরবাদের চেয়ে অনেক বেশী সহিষ্ণু এবং নমনীয়: বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের মধ্যে, বিভিন্ন দেবতাদের উপর দায়িত্ব ভাগ হয়ে যায়, এক একজন দেবতা বা দেবী এক একটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন যেমন জীবন, মৃত্যু, প্রজনন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। দেব-দেবীরা পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পর নির্ভরশীল, এবং বিশ্বাসীরা পরিস্থিতি অনুসারে কাকে আরাধনা করতে হবে স্থির করেন। সম্পূর্ণ বিপরীতে আব্রাহামের আল্লাহ সর্বদাই ঈর্ষাকাতর, অন্য কাউকেই তার ধারেকাছে আসতে দেন না।

একক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ আমাদের জীবনের সমস্ত ঘটনাকেই নিয়ন্ত্রণ করেন—যে দেবতা আমাদের উপর চব্বিশ ঘন্টা নজরদারি করেন, গোপনে আমাদের চিন্তা এবং স্বপ্নকে জানেন, জীবনে আমাদের কি করা উচিৎ আর কি উচিৎ নয় সে বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা নেন, সীমালঙ্ঘনের জন্য আমাদের দোজখের আগুনে অনন্তকাল পোড়ান; এমন ভাবনাই ধর্মীয় একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি, যা অন্য সর্বপ্রকার একনায়কতন্ত্রেরও ভিত্তি। সমস্ত একনায়কতন্ত্রের শীর্ষে থাকেন একজন চরমতম সত্যের মালিক, যিনি সবাইকে পথ দেখান, পরিবর্তে চান; তারা স্বকীয়তা এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ ক'রে প্রশ্নহীন অনুসারী হবে। তাদের দাবি এই যে, একমাত্র চিরন্তন অদ্বিতীয় সত্য পথ ছাড়া মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই, যে চিরন্তন সত্যের মালিক কেবল তিনিই।

আব্রাহাম, মহম্মদ এবং ভিন্নমতের ভয়

আব্রাহামের প্রকৃত ঈশ্বরের সন্ধান এক দীর্ঘ কাহিনী। বাইবেলে আছে যখন তার অন্তরে ধর্মীয় সত্ত্বা জেগে উঠল, তিনি কিভাবে তার গোত্রের মানুষদের থেকে নিজেকে পৃথক করে নিলেন, পরিত্যাগ করলেন তার পিতাকে, যাত্রা করলেন তার নতুন ঈশ্বরের আরাধনার জন্য এবং সবাইকে তার কথা জানানোর জন্য। কোরআনে আছে, আব্রাহাম তার নিজ গোত্রের সঙ্গেই রয়ে গেলেন, তার পিতা আজর-এর সাথে তার ঝগড়া হল, যিনি ছিলেন প্রাচীন দেবতাদের উপাসক। আব্রাহাম প্রাচীন দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে চূর্ণ করে দিলেন। যখন তিনি সবাইকে তাদের প্রাচীন দেবতাদের ত্যাগ করতে বললেন তখন ক্রুদ্ধ জনতা তাদের দেবতাদের অপমান করার কারণে আব্রাহামকে আগুনে নিক্ষেপ করল—তখন কথিত আল্লাহ্ সেই আগুনকে শীতল করে দিলেন এবং অলৌকিকভাবে আব্রাহামকে রক্ষা করলেন।

একজন তরুণ ব্যবসায়ী হিসাবে মহম্মদকে দামাস্কাসে যাতায়াত করতে হত, দেখা হত অনেক খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের সাথে, যাদের কাছ থেকে তিনি কিতাবুল মুকাদ্দাস (বাইবেল) থেকে বহু গল্প শুনেছিলেন। মহম্মদ তার একমাত্র পুত্রের নাম রাখেন ইব্রাহিম, আব্রাহামের আরবী রূপ। গল্পগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র যে মানুষটি, তার দর্শনকে পরবর্তীকালে মহম্মদ

নাম দিলেন ইসলাম। খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদেরকে আকর্ষণ করার জন্য মহম্মদ দাবি করলেন ঠিক তাদেরই মতো আব্রাহাম তারও পূর্বপুরুষ, যদিও সামান্য একটু তফাৎ আছে।

কিতাবুল মুকাদ্দাস তথা বাইবেল থেকে আব্রাহামের কাহিনী আরও গভীরভাবে শোনার পর, মহম্মদ ইসমাইলের (Ishmael) কথা জানলেন, যার কথা তোরাহ্ বা তাওরাতে সবিস্তারে বিবৃত হয়নি। ইসমাইল ছিল আব্রাহামের মিশরীয় ক্রীতদাসী হ্যাগারের (Hagar)-এর সন্তান যার সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। বাইবেলে ইসমাইল এবং তার মায়ের সম্বন্ধে জানা যায় আব্রাহাম তাদেরকে সিনাইয়ের হারান মরুভূমিতে পরিত্যাগ করে আসেন কারণ তার স্ত্রী সারাহ্ (Sarah) হ্যাগার-এর প্রতি ঈর্ষা বোধ করতেন। মহম্মদ দাবি করলেন, সারাহ্-র পুত্র ইশাক (Isaac) নয়, ইসমাইল ছিল আব্রাহামের কোরবানী—ইসমাইলের বংশধররাই আব্রাহামের প্রকৃত বংশধর। মহম্মদ আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কোরআনে লেখা হল আব্রাহাম এবং ইসমাইল মক্কায় কাবা নির্মাণ করেছিলেন তাদের উত্তরসূরীদের জন্য তীর্থস্থান রূপে। এটা নিতান্তই একটি ঘটনামাত্র নয়, মহম্মদ আশা করেছিলেন এভাবেই অতি প্রাচীন মূর্ত্তিপূজারী আরব উপজাতির ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থানকে জয় করবেন।

দামাস্কাস এবং ইয়েমেন-এর মধ্যে বাণিজ্যপথকে ঘিরে যে নগরগুলি ছিল সেখানকার মানুষদের কাছে সেই সময় কাবা ছিল আরবের ধর্মস্থান। ইসলামের আবির্ভাবের আগে থেকেই উপজাতির মানুষেরা তাদের বিভিন্ন দেবতার পূজা করত কাবার ভিতরে বা কাছাকাছি জায়গায় — বহুত্ববাদীদের একটি কেন্দ্রীয় উপাসনালয়—এমনকি খ্রীষ্টানরাও সেখানে যীশু বা মেরীর প্রতীক ঝুলাত। সেই সময়ে সকল আরব বণিকদের কাছে কাবা ছিল মিলনস্থল, এবং এই ব্যবস্থা ছিল বাস্তবেই অতি প্রয়োজনীয়। তৎসত্ত্বেও, ইসলামের জয়যাত্রার পরে এই সহিষ্ণুতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যখন মহম্মদ তার নতুন দর্শন প্রচারের ইচ্ছায় মক্কায় এলেন, সেখানকার নগরবাসীরা কাবার বাইরে তাকে সেটা করতে দিলেন। প্রথম দিকে, মহম্মদ নিজেকে খোলামনের মানুষ হিসাবে পরিচয় দিলেন, সে সময় তিনি মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেননি এবং আরবের দেবদেবীদের নিন্দে মন্দ করেননি। কোরআনে ঘোষণা করলেন, “তোমার জন্য তোমার ধর্ম,

আমার জন্য আমার ধর্ম”। কিন্তু যখন তিনি তার ঈশ্বর ছাড়া অন্য সমস্ত দেবতার মূর্ত্তি কাবাতে নিষিদ্ধ করতে চাইলেন তখনই উপজাতি নেতাদের সাথে তার দ্বন্দ্ব শুরু হল, যারা সঙ্গত কারণেই তাদের প্রথা বা আচার নিয়ে ভয় পেল।

ইসলাম-পূর্ব আরবে উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত, তাতে ইন্ধন দিত সীমান্তের দুই পাশে দুই বৃহৎ শক্তি--বাইজান্টাইন এবং সাসানিয়ান সাম্রাজ্য, বিশেষত উভয়েই ভালমতো জানত ঐ অঞ্চলে ছায়াযুদ্ধ চালানোর জন্য আরব উপজাতিদের কিভাবে বোড়ের মতো ব্যবহার করা যায়। মহম্মদের স্বপ্ন একটি বৃহৎ আরব সাম্রাজ্য গড়ার, যার ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দু হবে কাবা—যে স্বপ্ন তার পরিবারেই বয়ে আসছিল। মহম্মদের পিতামহ কুশাই ইবন কিলাব (Qusai ibn Kilab) চেষ্টা করেছিলেন মদিনার মানুষদের নৈকট্য পাওয়ার, এই আশায় যে আরবের যুদ্ধরত উপজাতিদের একত্র করা যাবে। কুশাই-এর উচ্চাশা পূরণের আগেই তিনি মারা যান, কিন্তু মহম্মদ তার পিতামহের মদিনার সাথে জোট গড়ার চেষ্টার ফল লাভ করেছিলেন, তখন মদিনার নাম ছিল ইয়াথ্রিব (Yathrib), যেমনটি দাবি করেছেন প্রফেসর সৈয়দ আল কামনী তার বই “আল হিজবুল হাশিমী”-তে। তের বছর ধরে মহম্মদ মক্কার পথে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, কিন্তু খুব বিশেষ ফল হয়নি; অল্প কয়েকশ’ মানুষ তার অনুসারী হয়েছিল—তাদের বেশীর ভাগই ছিল ক্রীতদাস। একমাত্র যখন তিনি ও তার অনুসারীরা মদিনায় গেলেন তখনই তিনি সাফল্যলাভ করলেন। তিনি মধ্যস্থতা করলেন যুদ্ধরত অজ (Aws) এবং খাজরাজ (Khazraj) গোত্রের মধ্যে; অবশেষে মদিনার সামাজিক নেতা হলেন। এরপর মোহাম্মদ বিভিন্ন দলছুট লোকদের সাথে আপোষ মীমাংসায় এসে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। এই দলছুট লোকেরা হচ্ছে তারাই যারা তাদের নিজেদের গোত্র থেকে অপরাধ করার কারণে বিতাড়িত হয়েছে। এরা ডাকাতি এবং অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের কাজে লিপ্ত ছিল। এদেরকে নিয়ে মোহাম্মদ নতুন সৈন্যদল গঠন করলেন। এই দলছুট লোকদের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন কাকতালীয় ভাবেই হয়ে গিয়েছিল যারা তার মতাদর্শ প্রচারের এক বিরাট সহায়ক শক্তি।

প্রথমদিকে মহম্মদ মদিনার ইহুদীদের একত্রিত করার চেষ্ট করেছিলেন, মনে করেছিলেন তাদের আচার-অনুষ্ঠান ঐতিহ্য গ্রহণযোগ্য, যেমন

ইহুদীদের কর্তব্য এবং অকর্তব্য যেসব প্রথা ওজু করা, প্রার্থনা, রোজা রাখা, শূকর-মাংস পরিত্যাগ ইত্যাদিকে তার আন্দোলনে যুক্ত করলেন—এমনকি মুসলমানরা যেদিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে তার জন্য নির্দিষ্ট করলেন জেরুজালেমকে। মহম্মদ এইসব করণীয় এবং অকরণীয়কে নাম দিলেন শরীয়া (Sharia); ইহুদী শব্দ "হালাখা" (halakha)-র সরাসরি অনুবাদ। যে শব্দটি ইহুদীদের আইনি ঐতিহ্য এবং আচরণ-বিধানের নাম; দু'টি শব্দেরই হিব্রু এবং আরবী অর্থ "পথ"।

মহম্মদ এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে তিনি বাহান্নটি বিষয় সম্বলিত একটি সংবিধান রচনা করেন, সেখানে ব্যাখ্যা করেন কিভাবে ইহুদী ও মুসলমানরা সহাবস্থানে থাকতে পারবে। এই সংবিধান বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহুদীদের অবস্থানগত নিরপেক্ষতাকে বিনষ্ট করেছিল। যেমন, ইহুদীদের মহম্মদকে সেনাসাহায্য দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে মক্কার মূর্ত্তিপূজারীদের (Pagan) সাথে সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ করতে হবে। কোরআনে আব্রাহামের উল্লেখ এবং বাইবেলের বিভিন্ন গল্প ও নবীদের কথা যোগ করে মহম্মদ আশা করেছিলেন ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা তার নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে। তবু অন্য ধর্মের বিশ্বাসীরা বেশীর ভাগই দূরে রইল, বিশেষত মদিনার ইহুদীরা আরব গোত্রগুলির সাথে তাদের নিরপেক্ষতা এবং নমনীয়তার সম্পর্ককে নষ্ট করতে চাইল না। যখন মক্কার সাথে মহম্মদের যুদ্ধ শুরু হল তখন এই ইহুদীরা অনেকেই প্যাগানদের পক্ষ অবলম্বন করল। মহম্মদ এর প্রতিশোধ নিলেন খায়বারের সমস্ত ইহুদীকে হত্যা ক'রে। আজ পর্যন্ত ইসলামপন্থীরা সারা পৃথিবীতে বিক্ষোভ দেখানোর সময় চিৎকার করে, "খায়বার খায়বার, ইয়া ইয়াহুদ, জইস মহম্মদ, সা ইয়াঊদ" (Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa yau'ud)—"মনে রেখো খায়বার এবং ইহুদীরা; মহম্মদের সৈন্য আবার ফিরে আসবে"।

এরপর থেকে, মহম্মদ অন্য পথ ধরলেন। তিনি তার "সত্য পথ"-এর প্রতিষ্ঠা করতে হিংসার পথ ধরলেন, যারা ইসলাম কবুল করবে না তাদের নির্বিচারে হত্যা করলেন। তিনি তার নিজের নগর মক্কা দখল করে তার নিজেরই তৈরী নীতি "তোমার জন্য তোমার ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম" সম্পূর্ণ বাতিল করলেন। আব্রাহামের মতোই মহম্মদ কাবাঘরের সমস্ত দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করলেন, যারা বাধা দিল তাদের হত্যা করলেন।

এমন কি মহম্মদ একজন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেছিলেন যে কাবাঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, যদিও দীর্ঘকালের প্রথা অনুযায়ী মক্কাবাসীরা মনে করত কাবা অহিংসার স্থান, সেটা লঙ্ঘন করেছিলেন।

মহম্মদ তার নগরকে সম্পূর্ণভাবে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানমুক্ত করেছিলেন, এজন্য তিনি বিশেষ দল গঠন করেন, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিরোধীদের হত্যা করা। নিহতদের মধ্যে ছিল ইহুদী কবিরাও যারা তাকে নিয়ে সমালোচনামূলক বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখেছিলেন, সেইসঙ্গে বিভিন্ন গোত্রের নেতারা যারা তার বর্বর নীতির বিরোধিতা করে অস্ত্র ধরেছিল। তার নিষ্ঠুরতার একটি বিশেষ উদাহরণ; মহম্মদ তার পালিত পুত্র জায়েদের (Zayd) নেতৃত্বে বিশেষ দল পাঠিয়েছিলেন এক বৃদ্ধা নারীকে হত্যা করার জন্য যে তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তার চল্লিশজন পুত্র-পৌত্রকে মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেছিল। জায়েদ সেই বৃদ্ধার সব সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করে, মাত্র একজন সুন্দরী নারীকে মহম্মদের ব্যক্তিগত দাসী বানানোর জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। এরপর সেই বৃদ্ধার দুই পা দু'টি ঘোড়ার সাথে বেঁধে বিপরীত দিকে চালিয়ে দিয়েছিল, সেই নারীর দেহ জীবিত অবস্থায় ছিঁড়ে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

বিরোধীদের আতঙ্ক ও ত্রাসের মধ্যে রাখা ছাড়াও মহম্মদের হিংস্রতা ইসলামের অন্তরে এমন এক অসহিষ্ণুতার বীজ বপন করেছিল—যে বীজ শিকড় ছড়িয়েছে দীর্ঘ ইতিহাসের পরিক্রমায় এবং আজ পর্যন্ত পচা ফল সৃষ্টি করে চলেছে। আর এ কারণেই একটি ধর্মীয় বহুত্ববাদী এলাকা কট্টর একেশ্বরবাদীতে পরিণত হয়েছিল। ঠিক সেজন্যই ইসলামের আল্লাহ পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী, দুর্বোধ্য, ক্রুদ্ধ এক সুউচ্চ মিনারে থাকা শাশ্বত একনায়কে, যে কোন যুক্তি মানে না, তার ধর্মবিরোধীকে অনন্তকাল দোজখে পোড়ায়, স্থির করে কে বাঁচবে আর কে মরবে—ক্ষমতালোভী দেবতা যে সকলের বিরোধীরা করে, তাকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না এবং তার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করার মতো কিছু করা যাবে না।

প্রতিটি যুদ্ধের পরে মহম্মদ মক্কার উপজাতিদের উপর আক্রমণ করতেন। আরব উপদ্বীপ এর বিভিন্ন প্রান্তে মোহাম্মদ যতগুলি যুদ্ধ করেছেন তার অনেকগুলোই ছিল বিভিন্ন ইহুদি গোত্রের বিরুদ্ধে, যে গোত্রগুলো তার

নিয়মকানুন তথা ধর্ম মানতে অস্বীকার করেছিল। সে সময় ইহুদীদের সম্বন্ধে কোরআনের বক্তব্য আরও বেশী নিন্দামূলক এবং হিংস্র হয়ে উঠল। একসময়ে ইহুদীরা ছিল “কিতাবে বিশ্বাসী মানুষ”, তারাই হয়ে উঠল “কিতাবের প্রতারক”। যতদিন না কোরআনে ইহুদীদেরকে “বানর” এবং “শূকর” আখ্যা দেওয়া হল, এই ধরণের হিংস্রতা বেড়েই চলল। মহম্মদের নির্দেশে মদিনার তিনটি ইহুদী গোত্রকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল, চতুর্থ দলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হল। তাদের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করা হয়, নারী ও শিশুদের দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মদিনা সম্পূর্ণভাবে ইহুদীমুক্ত হয়ে গেলে মুসলমানরা জেরুজালেমের পরিবর্তে মক্কার দিকে মুখ করে নমাজ পড়তে শুরু করল।

সুরা ৮-এ ইহুদীদের সাথে মহম্মদের দ্বন্দ্বের কথা লেখা আছে। সেখানে ইহুদীদের অভিশপ্ত জানোয়ার বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে তারা চিরকালই পিছন থেকে ছুরি মারা প্রাণী। “প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর চোখে নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা অবিশ্বাস করে, এবং তারা [কখনোই] বিশ্বাস করবে না—যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছিলে তারা বারবার চুক্তিভঙ্গ করেছে, এবং তারা আল্লাহকে ভয় করে না। সুতরাং যদি তুমি [হে মহম্মদ] যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত কর, তাহলে তাদের এমন শিক্ষা দাও যে, যারা তাদের পিছনে রয়েছে তারাও যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।

শুরু হল আরবের ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ। ঐ অঞ্চল থেকে সমস্ত অবিশ্বাসীদের বিতাড়িত করা হল এবং ক্রমবর্ধমান ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। এর প্রাথমিক সময়েই জন্ম হল ইসলামি ফ্যাসিবাদের। মৃত্যুর পর মহম্মদ মুসলমানদের জন্য রেখে গেলেন কোরআন এবং হাজার হাজার হাদিস (hadith), এতে আছে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ; এমন কি মুসলমানরা কিভাবে শৌচালয়ে পবিত্রভাবে বসবে সেই বিষয়েও নির্দেশ। যা তিনি অনুসারীদের বলে যাননি তা হল তার পর কে নেতা হবে, সেইসঙ্গে পরবর্তী শাসক হিসাবে তার কি কি গুণ থাকতে হবে। ফলে মহম্মদের মৃত্যুর পর অল্পকালের মধ্যেই মুসলমানদের মধ্যে শুরু হল তীব্র দ্বন্দ্ব। মুসলিমদের কিছু কিছু গোত্র মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ত্যাগ করল আর কিছু গোত্র ইসলাম ত্যাগ করেনি কিন্তু তারা বায়তুলমাল তথা ইসলামিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থায় যাকাত দিতে অস্বীকার করল।

একারণেই তখন রিদ্দার যুদ্ধ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজ ভাগ হয়ে গেল সুন্নী এবং শিয়া এই দুই ভাগে। সে সময়ে দু'পক্ষের মধ্যে মূল পার্থক্য ছিল; শিয়ারা মহম্মদের বংশের সরাসরি কোন উত্তরাধিকারীকে পরবর্তী নেতা হিসাবে চাইল, সুন্নীরা চাইল মক্কার দশটি উপজাতি থেকে আসা কোন নেতাকে। শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব রূপ নিল নিষ্ঠুর গৃহযুদ্ধের, যার ফলে ইসলামি আন্দোলন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হল তার প্রতিষ্ঠাতার মুত্যুর পর কয়েক দশকের মধ্যেই।

সময়ের সাথে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করল হাকিমিয়াহ-র ধারণা, "পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন"। এর মূল কথা হল ঈশ্বর ক্ষমতাবান শাসক পাঠাবেন অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তার ইচ্ছাপূরণ করবেন এবং পৃথিবী শাসন করবেন। হাকিমিয়াহ অনুযায়ী সমস্ত মুসলমান শাসকের আদেশ পালন করবে, কোনপ্রকার বিদ্রোহ বা সমালোচনাকে ধরা হবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা। হাকিমিয়াহ দু'টি ইসলামি ধারণার জন্ম দিল: শিয়াদের জন্য ইমামের শাসন; সুন্নীদের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের শাসন। প্রধানত সুন্নীদের মতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সমান, যা সমগ্র উম্মাহ্‌কে (Ummah) বিভেদ এবং অনিশ্চয়তায় ফেলে। কোরআনের দু'টি বাণীকে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একটি মুসলমানদের নির্দেশ দেয়, "আল্লাহ, তার রসুল এবং তোমাদের শাসকের আনুগত্য কর," অপরটি বলে, "ফিৎনা" [বিরোধিতা] খুন করার থেকেও খারাপ"।

ঠিক একই ধরণের বিশ্বাস ফ্যাসিবাদী আন্দোলন এবং একনায়কতন্ত্রের কেন্দ্রীয় চিন্তাধারা। যারা সেই বিশ্বাস বা আদর্শ থেকে সরে যায় তাদের অবিশ্বাসী বা পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে দেগে দেওয়া হয়, তারপর হয় বহিস্কার অথবা হত্যা।

মিশর, মরক্কো, এবং জর্ডনের মতো সুন্নী দেশে মোল্লাতন্ত্র এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়, বিতর্ক আছে, মুসলমানরা সমস্ত পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা; জাতীয়তাবাদ থেকে মার্ক্সবাদ, ধনতন্ত্র সব কিছুই চেষ্টা করেছে; কিন্তু কোন পদ্ধতিই ইসলামের জগতে ফলপ্রসূ হয়নি, সম্ভবত হয় তারা তীব্র অশান্তি সৃষ্টিকারী অথবা অনৈসলামিক। ইতিহাস থেকে উদাহরণ দেখিয়ে বলা হয় জাতির গৌরবের দিন ছিল যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীতে পালিত

হত, সে কারণে ধর্মীয় গোঁড়ামি নিজেকে প্রকাশ করে একমাত্র সত্য বিকল্প হিসাবে। বর্তমানের সালাফি এবং জিহাদীরা স্বপ্ন দেখে সময়কে ঘুরিয়ে দিয়ে মহম্মদ মদিনায় যে শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ করেছিলেন ঠিক সেটাই ফিরিয়ে আনতে। একটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামি সমাজ যারা আল্লাহর ইচ্ছা মান্য করে। তাদের তীব্র যুক্তি, একমাত্র নবীর শিক্ষাই প্রয়োজন আকস্মিক এবং কঠিন আঘাতের মাধ্যমে পৃথিবী জয় করার জন্য।

ইবন হানবল, সালাদিন, এবং ঐক্যের স্বপ্ন

(Ibn Hanbal, Saladin and The Dream Of Unity)

ফিকাহ্ (fiqh) বা ইসলামি আইনব্যবস্থার চারটি আলাদা ধারা আছে, যার মধ্যে তিনটি নরমপন্থী। মালিকাইট (Malikite), শাফিআইট (Shafi’ite), এবং হানাফিস্ট (Hanafist) এই তিনটি ধারা অল্প পরিমাণে কোরআন এবং ইসলামি ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা করা অনুমোদন করে। যে সব মুসলমান এগুলির বিধান অনুযায়ী চলে, তাদের কিছুটা সুযোগ আছে ইসলামি বিধির বাইরে না গিয়ে বিভিন্ন আচরণবিধির মধ্যে পছন্দ করার, যার ফলে আধুনিক পৃথিবীর সাথে মানিয়ে চলা কিছুটা সহজ হয়। তিনটিই অবশ্যই রক্ষণশীল, ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত করা একমাত্র তখনই অনুমোদনযোগ্য, যখন কোরআন বা নবীর বয়ানে বিশেষ কোন বিষয়ে পরিস্কার নির্দেশ পাওয়া যায় না। যেহেতু নবী হাজার হাজার জীবন্ত বাণী রেখে গেছেন, কোন মুসলমান যত রকমের সমস্যা কল্পনা করতে পারে তার সমাধান ঐ বাণীতে পাওয়া যাবে। ফলে ব্যাখ্যার সুযোগ নেই বললেই চলে।

চারটি ধারার মধ্যে সবথেকে বেশী রক্ষণশীল হল হানবলবাদ, নবম শতাব্দীতে বাগদাদে আহমদ ইবন হানবল (৭৮০-৮৫৫) যার প্রতিষ্ঠা করেন শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের পর। শরীয়া আইনের শাসন থেকে বহুদূরে, বাগদাদে তখন ছিল স্বাধীন খোলামেলা জীবন; মদ, সঙ্গীত, নাচ ইত্যাদি ছিল দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। খলিফার প্রাসাদে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত যেখানে ইহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টান কবিরা অংশগ্রহণ করত, তাদের রচনায় একে অপরের ধর্মের সমালোচনা করত, এমন কিছু রচনাও থাকত যা নবী মহম্মদকে সরাসরি আক্রমণ করে, তবু কখনও কেউ অপমানিত বোধ করেনি।

উল্লেখ্য, সেই সময়ে কিছু ‘ফিকাহ’-এর উদ্ভব হয় যার মধ্যে বেশ কয়েকটি স্বাধীনভাবে কোরআনের স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং অভ্রান্ততা বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। এদেরই একটি ধারা মুতাজিলিজম (Mu’tazilism), যারা বলে কোরআনের লেখা বিশেষভাবে সপ্তম শতাব্দীর জন্য প্রযোজ্য। তর্ক শুরু হয়, “কোরআন কি সত্যিই চিরকালের জন্য স্বর্গীয় রচনা”—অথবা তার স্রষ্টার সময়ের একটি নথিমাত্র, পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে যার কোন উপযোগীতা নেই। মুতাজিলিস্টদের চোখে নবম শতাব্দীতে বাগদাদের জীবন থেকে সপ্তম শতাব্দীতে মক্কা এবং মদিনার জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। নবম শতাব্দীর বাগদাদ কখনই মহম্মদের প্রণীত আইন অক্ষরে অক্ষরে পালন করার দায় অনুভব করেনি। বাগদাদে খলিফার প্রাসাদে যে পারস্পরিক আস্থা এবং বন্ধুত্বের পরিবেশ দেখা যেত বর্তমান ইসলামি বিশ্বে তেমন পরিবেশ অচিন্ত্যনীয়।

ইসলাম যখন পার্শিয়ান এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করল, মুসলিম চিন্তাবিদেরা পরিচিত হলেন গ্রীক দর্শন এবং ইহুদী ও পার্শিয়ান ঐতিহ্য, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদির সাথে। সৃষ্টি হল এক নতুন ইসলামি ধর্মবিশ্বাস, যা যৌক্তিকভাবে আলোচনায় আগ্রহী যাতে অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সাথে বাস করা যায়। এই ঘটনা রক্ষণশীল শক্তির গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল। ইবন হানবল আশঙ্কা করলেন মুসলমানদের মধ্যে এই মত বা বিশ্বাসের ভাগাভাগি চলতেই থাকবে, নতুন ধর্মীয় মত লাগাতার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতেই থাকবে, যতদিন না আক্ষরিক অর্থে কোরআন এবং নবীর বাণী প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি ভাবলেন, ব্যাখ্যার সুযোগ দিলে নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন ভাগের ইসলাম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরী হবে, যার ফলে ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। সে কারণে ইবন হানবল এক অতি রক্ষণশীল আইনব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন যা বর্তমানের মৌলবাদী ইসলামের মূলকেন্দ্র।

সমৃদ্ধ বাগদাদে, প্রথমদিকে ইবন হানবলের তত্ত্ব কেউ কানেই নিল না। এটা শুধু তার পক্ষে বাধাই সৃষ্টি করল না: তার কঠোরভাবে গোঁড়া তত্ত্বের কারণে হানবলের কারাদণ্ড হল। অপরপক্ষে, তুলনামূলকভাবে নরমপন্থী ফিকাহ ইসলামি সাম্রাজ্যে শক্তি এবং উন্নতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, আন্দালুসিয়া, বাগদাদ, এবং কায়রোতে আইনব্যবস্থা নতুন রূপ দিল। হানবলের তত্ত্ব বিভিন্ন সমস্যা, ভঙ্গুরতা, পরাজয় এবং বিভেদের মধ্যে

ঘোরাফেরা করতে লাগল। যখন ক্রুসেড শুরু হয়, ইসলামি বিশ্বে গোঁড়া ইসলামের জোয়ার আসে, সমাজে পরিবর্তন ঘটে কারণ মানুষ এমন বিশ্বস্ত শাসকের স্বপ্ন দেখে, যে শাসক সমস্ত মুসলমানকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং খ্রীষ্টান আক্রমণের প্রত্যাঘাত করবে। সালাদিন (১১৩৭-১১৯৩) এই বিষয়গুলির খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন, জিহাদ ঘোষণা করে, ক্রুসেড শক্তিকে পরাজিত করে ১১৮৭ সালে তিনি খ্রীষ্টান শাসন থেকে জেরুজালেমকে মুক্ত করেন। মুসলিম ঐক্য এবং পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে জয়ের স্বপ্ন সেই থেকে ইতিহাসে বয়ে চলেছে। প্রত্যেক ইসলামি নেতা সালাদিনের সাফল্যকে ঈর্ষা করেন এবং নতুন সোনালী ইসলামি যুগের স্বপ্ন দেখেন।

ইবন তাইমিয়াহ (IBN TAYMIYYAH) এবং জিহাদের ধারণা

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বে মঙ্গোল আক্রমণের পর গোঁড়ামি পুনর্জীবন লাভ করে এবং একজন পণ্ডিত ইবন তাইমিয়াহ-র দ্বারা হানবলের গোঁড়া আইনি অনুশাসন পুনরুত্থিত হয়, যিনি আধুনিক যুগের সালাফি এবং ওয়াহাবিদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষ। ওসামা বিন লাদেন প্রায়ই ইবন তাইমিয়াহকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতেন, বিশেষত তার জিহাদের ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা।

ইবন তাইমিয়াহ (১২৬৩-১৩২৮) মনে করতেন শরীয়াকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা শাসকের প্রধান কর্তব্য এবং জনগণ পালন করছে কি না তা নিশ্চিত করা। যারা সেটা করতে ব্যর্থ তারা প্রজাদের আনুগত্য পাওয়ার অযোগ্য। ইবন তাইমিয়াহ চরম কঠোরতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন "তওহিদ"(tawhid) "এক এবং একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস" এর ধারণা, অভিযোগ করেছেন সুফি মুসলমানরা প্রকৃত একেশ্বরবাদী নয়, কারণ তারা শুধু আল্লাহকেই শ্রদ্ধা করে না, সেইসঙ্গে সমস্ত শায়েখদেরও শ্রদ্ধা করে, যাদের কবর তারা নিয়মিত দর্শন করে। তার মতে, এই কবরপূজা কুফর (heathenry) এর থেকে কিছুমাত্র কম নয়। স্বাভাবিকভাবেই তিনি শিয়া পাণ্ডিত্যকে বলেছেন ইসলামের মিথ্যারূপ, কারণ শিয়ারা দাবি করে তাদের ইমামরা অভ্রান্ত। ইবন তাইমিয়াহ সিরিয়ার আলাওয়াইটদের বলেছেন ধর্মত্যাগী, তাদের শাস্তি মৃত্যু। তিনি মধ্যযুগীয় ইসলামি দর্শনকে

বাতিল করেছেন এবং বলেছেন যুক্তির মাধ্যমে নয়, জ্ঞানের সন্ধান পাওয়ার একমাত্র পথ হল ইসলামের নীতির সত্যতায় বিশ্বাস।

ইবন তাইমিয়াহ্-র মতবাদ তার সময় এবং ঘটনাবলীর ফসল—যখন মঙ্গোলরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে দামাস্কাস অধিকার করে, নতুন শাসকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে এবং অত্যাচার করে। ইবন তাইমিয়াহ দামাস্কাস ছেড়ে মিশর ও আরব ভ্রমণে যান, আশা করেন ঐ অঞ্চলের মুসলিম শাসকদের জিহাদের আহ্বান জানাবেন। তিনি এটাকে শুধুমাত্র অবিশ্বাসী হত্যার কারণ হিসাবেই দেখেননি, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য বলেও ভেবেছিলেন। অ-মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসীদের চিরকাল এমন আচরণই করা উচিৎ।

ইবন তাইমিয়াহ মিশরের সুলতান ইবন কালাউন (Ibn Qalawun)-কে রাজী করাতে পেরেছিলেন মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে, তাদের দামাস্কাসে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি শুধু ইসলাম প্রচারই করেননি, তার থেকেও অনেক বেশী করেছিলেন। তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তার জঙ্গী ধর্মতত্ত্ব কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অজানা ছিল, অন্য একজন আরবের ধর্মপ্রচারক নতুন করে তা জাগিয়ে তোলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ইবন আবদ আল-ওয়াহাব (Muhammad ibn Abd al-Wahhab ১৭০২-১৭৯২) ওয়াহাবিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা, ইবন তাইমিয়াহ্-র শিক্ষা অনুসরণ করতেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ইসলামি বিশ্ব থেকে সমস্ত অনৈসলামিক বিষয় সরিয়ে দিতে। শুরু করেছিলেন সারা আরবে সুফি কবরগুলি ধ্বংস করতে যেগুলি তার পূর্বসূরীদের বিরক্তির কারণ ছিল এবং জিহাদকে মুসলিমদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য বলে দাবি করেছিলেন। ইবন আবদ আল-ওয়াহাবের শিক্ষা, মূলত ইবন হানবল এবং ইবন তাইমিয়াহ্-র দুর্বল অনুকরণ, যা বর্তমান সৌদি আরবের বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি, সেইসঙ্গে আধুনিক জিহাদ সম্পর্কে ইসলামপন্থীদের ধারণার।

সাইয়্যেদ কুতব এবং ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ

সাইয়্যেদ কুতব (১৯০৬-১৯৬৬) জীবন শুরু করেছিলেন সাহিত্য সমালোচক হিসাবে—কিন্তু পৃথিবী এখন তাকে মনে রাখে সম্পূর্ণ অন্য

কারণে। বস্তুত সাহিত্য জগৎ তাকে ধন্যবাদ জানায় মিশরীয় লেখক নাগিব মাহফুজ (Naguib Mahfouz)-কে আবিস্কার করার জন্য, যিনি নোবেল প্রাইজ জয় করেন। ১৯৪০ থেকে মাহফুজের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে কুতব প্রথম তার প্রতিভা লক্ষ্য করেন। কুতব, একজন পাশ্চাত্যমুখী চিন্তাবিদ, যিনি গভীর আত্ম-পরিচিতি সমস্যায় পড়েন ১৯৪০ দশকের শেষদিকে যখন তিনি আমেরিকায় ছিলেন।

মিশরের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় কুতবকে দু'বছরের জন্য আমেরিকায় পাঠায় সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে। সেখানে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলি ঘৃণিত হচ্ছে দেখে তিনি ক্রুদ্ধ বোধ করেন। বর্ণবৈষম্য, যৌন-বিশৃঙ্খলা, এবং অর্থ-লালসা সেখানে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। এসব কুতবের আগের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল এবং তারমনে তীব্র ধর্মীয় বোধ জেগে উঠল। তিনি পড়তে শুরু করলেন ভারতীয় তাত্ত্বিক আধুনিক ইসলামী আন্দোলনের গুরু আবুল আলা মওদুদীর রচনাসমূহ।

মওদুদী নিজে মনের গভীরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ১৯২৪ সালে ইসলামি খিলাফত-এর পতনে। তিনি দুনিয়ার মুসলমানদের আহ্বান জানান আধুনিকতা পরিত্যাগ করে মূল ইসলামে ফিরে যেতে। আবদুল-ওয়াহাবের মতোই তার মতে জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার উপায় নয়—বরং এর চেয়ে বেশী কিছু। বস্তুত, যা কিছু ইসলামি আইন এবং সমাজিক নিয়মের বাইরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হাতিয়ার হচ্ছে জিহাদ। মওদুদী ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসাবেই দেখেননি, প্রকৃতপক্ষে তিনি একে দেখেছিলেন একনায়ক শাসকের মতো, যে মানুষের জীবনে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে; রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন থেকে বিজ্ঞান, মানবতা, স্বাস্থ্য, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব পর্যন্ত। ইতিহাসের পথ বদলে দিতে পৃথিবীজুড়ে ইসলামি বিপ্লবের প্রয়োজন জানিয়ে তিনি মুসলমানদের ডাক দিলেন সেই কাজে অংশ নেওয়ার জন্য, তারা মুসলিম দেশে বাস করুক বা না করুক। মুসলিম চিন্তাবিদ এবং শিক্ষাবিদরা সেই বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করে দেবেন, মওদুদী জোরের সাথে বলেন, "জার্মান জাতীয় সমাজবাদ কখনও সফল হত না ফিকটে (Fichte), গ্যেটে (Goethe), নীটসে (Nietzsche) এদের তৈরী

ধারণার সাহায্য ব্যতীত; যা গ্রহণ করেছিলেন প্রতিভাবান এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের অধিকারী হিটলার ও তার সহযোদ্ধারা”।

সমসাময়িক ফ্যাসিবাদীদের মতোই মওদুদী মুসলমানদের আত্মোৎসর্গের ইচ্ছাকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিয়েছিলেন। মুসলিমদের “প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের” কথা বলে এক বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন, “একবার ইসলামের সত্যকে গ্রহণ করলে তোমার কাছে সমস্ত শক্তি দিয়ে ইসলামকে পৃথিবী শাসনে সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, জয়লাভ করা অথবা যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দেওয়া”। এই বিষয়ে কুতব মওদুদীর সাথে পুরোপুরি একমত। মওদুদীর জিহাদের আহ্বান শাশ্বত আবেদনের মতো মুসলিম যুবমনে এমন উদ্দীপনা তৈরী করল যার মধ্যে তারা তাদের অক্ষমতা এবং অসহায়তার অনুভূতি কাটিয়ে বিজয়ী হওয়ার কৌশল খুঁজে পেল। সুতরাং বৈশ্বিক পরিবর্তনের মধ্যে তারা হয়ে গেল কেবল দাবার ঘুঁটি যাদের নিজেদের কোনো শক্তি সামর্থ্য না থাকলেও মনের মধ্যে রয়েছে অগাধ বিশ্বাস যে, অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা হয় সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, নতুবা শহীদ হয়ে মরে জান্নাতে গিয়ে অমরত্ব লাভ করবে—বলতে গেলে উভয়তই জয়লাভ (win-win situation)।

মওদুদীর চোখে হত্যাও গ্রহণযোগ্য। তিনি লিখেছেন, “আল্লাহর পথে জিহাদে প্রত্যেককেই সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে হবে, যারা যুদ্ধ করে তারা অন্যের জীবন এবং পার্থিব জিনিস কেড়ে নেয় সেইসঙ্গে নিজেদের জীবনও বিসর্জন দেয়। এটা নিশ্চিত যে নিজেকে বড় ক্ষতি থেকে বাঁচাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ত্যাগ করা ইসলামের মূল নীতির অন্যতম। ভালর বিরুদ্ধে শয়তানের জয়ের মতো মহাদুর্যোগ যদি মানবজাতির উপর নেমে আসে বা যদি আগ্রাসী নাস্তিকতা আল্লাহর ধর্মের উপর বিজয়ী হয়, তার তুলনায় কিছু মানুষের মৃত্যু কি এমন ত্যাগ—এমনকি তা যদি কয়েক হাজারও হয়।

মওদুদীর বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাইয়্যেদ কুতব আমেরিকায় বসে লিখতে শুরু করলেন। “আমি যে আমেরিকাকে দেখেছি” (The America I have seen) শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে তিনি অভিযোগ আনলেন পাশ্চাত্যের অত্যধিক বিলাসিতার কারণে নৈতিক অধঃপতন এবং ভোগবাদের

বিরুদ্ধে, উল্লেখ করলেন এর জন্য প্রয়োজন ইসলামি সামাজিক শৃঙ্খলা। কুতব আমেরিকায় থাকা কালে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি আরব বাহিনীর পরাজয়ের খবর শুনলেন, পরের বছরেই শুনলেন হাসান আল-বান্নার হত্যার সংবাদ, তিনি ফিরে এলেন কায়রোতে। ১৯৫১-সালে যোগ দিলেন আল-বান্নার মুসলিম ব্রাদারহুডে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন এর প্রধান পরিকল্পনাকারী। (তার দু'টি বই Signposts on the road এবং The Future of This Religion বর্তমানে ইসলামপন্থীদের প্রধান পাঠ্য)। একজন বামঘেঁষা ইসলামপন্থী হিসাবে কুতব প্রথমদিকে প্রেসিডেন্ট নাসেরের সমাজবাদী রাজনীতিকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ১৯৫৪ সালে নাসেরকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন তিনি ব্রদারহুডকে নিষিদ্ধ করলেন, কুতব নাসেরের শাসনকে অনৈসলামিক গণ্য করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ইবন তাইমিয়াহ্-র শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ঘোষণা করলেন যেহেতু মিশরের প্রেসিডেন্ট শরীয়া আইন চালু করেননি, তাকে মান্য করা বা শাসকের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই সময় থেকে কুতব মনে করতেন কিছু কিছু ধর্মীয় সংস্কারের প্রেক্ষিতে মিশরকে আর ইসলামি রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। বরং ইসলামি অভিযানের জন্য উপযুক্ত একটি "কাফেরের দেশ"। কুতব-এর চিন্তায় বিশেষ ভূমিকা আছে "জাহিলিয়াহ"-র (Jahiliyyah) ধারণার, অর্থাৎ ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগের সময়ের মানুষের "অজ্ঞতা"। ইবন তাইমিয়াহ তার সময়ে এই তত্ত্বকে বিস্তৃত করেছিলেন, সমাজে ইসলাম থেকে বিচ্যুত যে কোন বিষয়কেই তিনি বলতেন জাহিলিয়াহ। কুতবও দাবি করলেন মুসলমানরা সব অনৈসলামিক বিষয় থেকে নিজেদের মুক্ত করুক। তার মতে, প্রকৃত স্বাধীন সমাজ সৃষ্টি একমাত্র তখনই সম্ভব যখন তিনি যাকে সত্য বলে মনে করেন প্রতিটি মানুষ সেই প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাসকে হৃদয়ঙ্গম করবে। কুতব আশা করেছিলেন একটা দেশে ধর্মীয় জাগরণ শুরু হলে তা সমগ্র ইসলামি বিশ্বে তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়বে (Domino effect), আর মুসলিম উম্মাহ পৌঁছে যাবে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে।

সেইসঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মওদুদীর হাকিমিয়াহ্-র ধারণাও, পৃথিবীতে সম্পূর্ণ আল্লাহর শাসন, যেখানে থাকবে না গণতন্ত্র, জনগণের

সরকার বা জাতিভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা। কুতব-এর মতে, সরকার সার্বভৌমত্ব লাভ করে আল্লাহর রহমতে এবং শাসন করে তাঁরই নামে; আইন-কানুন, রীতি-প্রথা যদি পবিত্র ইসলামি মতে না চলে তাহলে তা সম্পূর্ণ অনৈতিক। কুতব বলেছেন শরীয়া শাসন চালু হওয়ার আগে জাহিলিয়াহ্ যুগে সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল জনগণের হাতে; যা আল্লাহর বিরোধীতারই নামান্তর।

ইবন তাইমিয়াহ্-র দীর্ঘমেয়াদী জিহাদের ভাবনা বিশাল প্রভাব ফেলে সাইয়্যেদ কুতব-এর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। কুতব বলেন পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাকে দীর্ঘজীবী করতে প্রত্যেক মুসলমানের জীবন-পদ্ধতি এবং কর্তব্য হিসাবে জিহাদকে উন্নত করতে হবে। প্রকৃত অর্থে এটাই ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ। (প্রথম পাঁচটি—ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত)।

সাইয়্যেদ কুতব-এর চিন্তা, যদিও রক্ষণশীল এবং মৌলবাদী আবার এক অর্থে বিপ্লবাত্মকও বটে। তার আগের যুগে ইসলামবিদরা অনেক সময়েই অত্যাচারী এবং নীতিহীন শাসককে মেনে নিয়েছিলেন গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য। সেইসব শাসকেরা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে শক্তিশালী রাখতে হবে, বিশেষ ক্ষেত্রে জিহাদ থাকবে বিকল্প হিসাবে, যখন মুসলমানদের জমি আক্রান্ত হবে বা নতুন জমি জয় করতে হবে। অপরপক্ষে, কুতব জিহাদকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, এটা বিশ্বাসীদের দায়িত্ব যে সকলে একত্রিত হয়ে নিজেরাই জিহাদ ঘোষণা করবে অবৈধ শাসককে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, যার রাষ্ট্র মোল্লাতান্ত্রিক নয়।

বিশেষত এই ধরণের ধারণার জন্য এবং নাসেরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৬৬ সালে কুতব-এর মৃত্যুদণ্ড হয়—কিন্তু তার লেখা ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। ইসলামপন্থী দল হরকৎ-উল-জিহাদ আল-ইসলামি, আল-গামা আল-ইসলামিয়া এবং আল-কায়েদা (Harkat-ul-Jihad al-Islami, al-Gama’a al-Islamiyya, and al-Qaeda), এদের কাছে তার লেখা যেন সন্ত্রাসের নিয়মাবলী।

মিশরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার তিন বছর আগে মোহামেদ মোরসি (Mohamed Morsi) ১৩ অগষ্ট ২০০৯ মিশরীয় টিভি চ্যানেল আল-

ফারাইন (al-Fara’een) এ প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে সাইয়্যেদ কুতব সম্পর্কে বলেছিলেন, “আমি তার লেখা পড়েছি এবং সেখানে সত্য ইসলামকে নতুন করে আবিস্কার করেছি”। আজ মুসলিম ব্রাদারহুডের অধিকাংশ নেতারা কুতবপন্থী, তারাই সংগঠনের অভ্যন্তরে সব থেকে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী, এবং কুতব-এর জিহাদ-দর্শনে নিবেদিত প্রাণ। এর বিরোধীরা হল সালাফি এবং আজহারী দলগুলি। আজহারীরা ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয় আল-আজহারের স্নাতক। এ ছাড়াও আছে তথাকথিত সংস্কারবাদী দল। তবুও ব্রাদারহুড যখন মিশরে ক্ষমতা দখল করে, কেবলমাত্র কুতবপন্থীরাই সেখানে তাদের উপস্থিতির ছাপ রাখতে পেরেছিল।

অধ্যায় ৪

আমার লড়াই (MEIN KAMPH) থেকে আমাদের লড়াই

—

আরব এবং ইহুদী-বিদ্বেষ

আন্তন চেকভ-এর একটি ছোট গল্পে দু'জন রোগী হাসপাতালের একই ওয়ার্ডে থাকত, তারা পরস্পরকে তীব্রভাবে ঘৃণা করত। একটা দিনও তাদের পরস্পরের ঝগড়া ছাড়া কাটত না। একদিন নার্স একজনকে জানালেন অপরজন মারা গেছেন, নার্স ভেবেছিলেন তিনি আনন্দে সারা ঘর নেচে বেড়াবেন। পরিবর্তে তিনি পরদিন দেখলেন ভদ্রলোক মরে মেঝেতে পড়ে আছেন। রোগী ভদ্রলোকের অপরজনের সঙ্গে ঝগড়া তার নিজের জীবনকে অর্থময় করে তুলেছিল এবং অপরজনের মৃত্যুর পর তা একেবারেই অর্থহীন। তারা দু'জনে কখনও পাশাপাশি থাকতে পারে না, আবার একজনকে ছাড়া অপরজনের চলেও না। মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে চেকভের গল্পকে ইহুদী-ইসলামি সম্পর্কের একটু অতিরঞ্জিত রূপ বলা যেতে পারে।

আরব দুনিয়ার থেকে বেশী শক্তিশালী ইহুদী বিদ্বেষ আর কোথাও নেই। এর আধুনিক রূপকে দেখতে পাওয়া যায় ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবং তারপর ইহুদী রাষ্ট্রটির সাথে আরব সেনার বহু যুদ্ধ দেখে, আর সেইসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী অপপ্রচারও আরবের মানুষের সহানুভূতি অর্জন করেছিল। বর্তমানে আরবের ইহুদী বিদ্বেষ কোরআনের থেকেও বেশী ঋণী Mein Kamph-এর কাছে। নাৎসীরা ইহুদীদের যে ছবি তুলে ধরেছিল তা আরবদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল ইজরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের বহু আগেই। হিটলারের জার্মান সমর্থকরা যেমন তার পৃথিবীজুড়ে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের বিকৃত কাহিনীর প্রশংসা করত, ঠিক তেমনিভাবেই আরবরা গভীর ঘৃণার তত্ত্বকে বিশ্বাস করত। Mein Kamph এবং The Protocols of the Elders of Zion দুটি বইই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নিষিদ্ধ হয় এবং যথারীতি আরব রাষ্ট্রগুলিতে কয়েক দশক ধরে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইএর সম্মান লাভ করে। এখনও হামাস তাদের অফিসিয়াল ওয়েসাইটে The Protocols থেকে বহু

উদ্ধৃতি প্রকাশ করে থাকে, যদিও এই পুস্তিকাটি রাশিয়ার জার এর পক্ষ থেকে বানানো একটি জাল পুস্তিকা যা বানানো হয়েছিল ইহুদীদেরকে রাশিয়া থেকে তাড়ানোর পক্ষে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। আর বাস্তবিক পক্ষে, এই বইটিই হচ্ছে সারা দুনিয়ায় ইহুদীদের কল্পিত 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বের' মূল ভিত্তি।

এই মুহুর্তে, আমরা সততার সাথে এক পা পিছিয়ে এসে প্রশ্ন করতে পারি: আরবদের ইহুদী-বিদ্বেষ সত্যিই কি কোন বাস্তবসম্মত আধুনিক প্রক্রিয়া না কি এর ঐতিহাসিক উৎস অনেক গভীরে?

ইহুদীদের প্রতি ঘৃণার কারণ হিসাবে ইহুদীদেরকে দায়ী করার থেকে মুসলমানদের আত্মোপলব্ধি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সেমিটিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার ক্ষেত্রে যেমন একই কথা প্রযোজ্য, তেমনি জার্মানিতেও এটিই ঘটেছিল। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের ফলে তাদের ভাবমূর্তি এমন ভয়ানকভাবে আহত হয়েছিল যে সেটি তাদের মনের মধ্যে তৈরি করেছিল এক মারাত্মক বিষফল। ইহুদীরা জার্মানিতে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বসবাস করেছে, কিন্তু তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা বা তাড়িয়ে দেয়ার ঘটনা কেবল তখনই ঘটেছে যখন জার্মান জাতি পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানিতে ডুবেছিল এবং বিশ্ববাসীর সামনে পরিচয় সংকটে ভুগছিল।

ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে নাৎসীদের থেকে আরবরা অনেক আলাদা। তবু সবাই মানবে যে উভয় পক্ষই প্রায় একই চরিত্রের, অথচ তারা একে অপরকে চিনত না। উভয় পক্ষই গত দু'ই শতাব্দী ধরে পরস্পরের বিপরীত দিকে চলেছে—বিশেষ করে আরবরা ছুটছে পিছনের দিকে।

ইহুদীরা লোভ করেনি যে, খ্রিস্টান এবং মুসলিমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ করুক, কারণ ধর্মান্তরকরণ তাদের ধর্মের শিক্ষা নয়; এমনকি আল-কুদস অধিকার করে নেওয়ার ব্যাপারটি জায়নবাদী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশের পূর্বে তাদের ভাবনায় কখনো ছিল না। কারণ মুসা (মোজেস, ইহুদী ধর্মের প্রধান পুরুষ) কখনো আল-কুদস এ প্রবেশ করেননি, আর ইহুদীরা আল কুদস অধিকার করে নেওয়াকে শেষ জমানার (ইহুদী ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মমতে, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার অল্পকাল

পূর্বের সময়টা হচ্ছে শেষ জমানা) একটি নিদর্শন হিসেবেই গণ্য করে। এজন্যই ইহুদীরা দীর্ঘকাল যাবত ছোট্ট একটি জাতিতে সীমাবদ্ধ থেকে অন্যদের শাসনের অধীনে বসবাস করছে।

যদিও ইসলামের সমগ্র ইতিহাসে বারবার অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তবু মুসলমান এবং ইহুদীরা অনেক সময়েই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বাস করেছে। ঐতিহাসিকভাবে স্পষ্ট শত্রুতা থাকলেও ধর্মীয় তত্ত্বগতভাবে ইসলামে ইহুদী-বিরোধীতা কখনো ছিল না, যেমন ছিল খ্রীষ্টধর্মে। ইহুদীদের উপর খ্রীষ্টানদের অভিযোগ যে তারা যীশুকে হত্যা করেছিল, সেই সাথে মধ্যযুগের সময়কালে ইউরোপের ইহুদী-বিরোধিতার আর একটি অজুহাত সৃষ্টি হয়: যে বিষয়গুলিতে ইহুদীদের একাধিপত্য ছিল যেমন; টাকা ধার দেওয়া, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য খ্রীষ্টানরা অসন্তুষ্ট ছিল, তা সত্ত্বেও ইহুদীদের এই কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। আরবদের কাছে এটা কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি, যাদের ধর্মে যীশুর ভূমিকা খুব সামান্য এবং তারাও সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী ছিল এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল না। দেশের সীমানা এবং চরম সত্যের উপর পরস্পরের দাবি মুসলিম-ইহুদী সংঘর্ষের মূল অন্তর্নিহিত বিষয়, যেখানে মুসলমানরা সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করে দু'টি ক্ষেত্রেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

অন্যদের ধর্মান্তরিত করার কথা কখনও না ভেবে ইহুদীরা একটা ছোট্ট জনগোষ্ঠী হয়ে রয়ে গেল। এদিকে মুসলমানরা আন্দালুসিয়া (Andalusia) থেকে পারস্য পর্যন্ত জয় করে ফেলল মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে। ষোড়ষ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চলে যে ইহুদীরা বাস করত তার শতকরা ৯৫ ভাগ ইসলাম-পূর্ব সময় থেকে স্রোতের মতো অভিবাসী হয়ে আরবে চলে যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আন্দালুসিয়া থেকে ইহুদীরা মিশরে এবং উত্তর আফ্রিকায় চলে যায় যখন খ্রীষ্টানরা তাদের জমি পুনর্দখল করে নেয়। সেখানে তাদের দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানানো হয়, কারণ অটোমান সাম্রাজ্য ইহুদীদের ইস্তানবুল এবং থেসালোনিকিতে (Thessaloniki) গিয়ে বসবাস করার জন্য দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল। পরবর্তীকালে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হাজার হাজার ইহুদী ইউরোপীয় ইহুদী-বিদ্বেষের কবল থেকে বাঁচতে ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এবারে কিন্তু ইহুদীরা

দেখল তারা সেখানে অবাঞ্ছিত। ইসলামি খলিফাতন্ত্রের অবসানের পর মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক মাত্রাছাড়া ঘৃণা সৃষ্টি হল—যে ঘৃণাতে আজও লাগাম পরানো যায়নি। মুসলিমদের সমৃদ্ধির সময়ে মুসলিমদের দেশে ইহুদীদের স্বাগত জানানো হয়েছে, আর মুসলিমদের ভঙ্গুর ও বিপদসংকুল সময়ে ইহুদীরা হয়েছে অবাঞ্ছিত এবং পরিত্যাজ্য। আর এটাই আমি বলতে চাইছি যে, মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের সম্পর্কের সমস্যাটা ইহুদীদের মধ্য হতে উদ্ভূত নয় বরং মুসলমানদের নিজেদের মধ্য হতেই উদ্ভূত।

মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে শত্রুতা একটা পারিবারিক দ্বন্দ্ব। যার মূলে আছে আব্রাহামের বিতর্কিত উত্তরসূরী সমস্যা এবং দুই একেশ্বরবাদের সর্বোচ্চ একাধিপত্য। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে (70 CE) রোমানদের দ্বারা জেরুজালেমের মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা চলে যায় এবং আরব নগরী ইয়াথ্রিব-এ বসবাস শুরু করে, পাঁচশ’ বছর পর মহম্মদ যে নগরীর নামকরণ করেন মদিনা। প্রথম শতাব্দীর ইসলাম-পূর্ব আরবরা কখনও ইহুদীদেরকে বিপদের কারণ বলে ভাবেনি। প্রকৃতপক্ষে মদিনার ইহুদীরা বহুত্ববাদী আরবদের সাথে পাশাপাশি দীর্ঘদিন শান্তিতে সহাবস্থান করেছে, অস্ত্র, মদ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবসা করেছে এবং নগরীর রাত্রিজীবনকে সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। যুদ্ধের সময়ে নিরপেক্ষ থেকে তারা আরবদের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থেকেছে, এমনকি বিভিন্ন সময়ে জলের উৎস বা জমি সংক্রান্ত বিবাদে তারা মধ্যস্থতা করতেও আসেনি।

তারপর মহম্মদের আবির্ভাব।

উপরে যেমনটি বলা হয়েছে, এরপর নবী মহম্মদ এক চরমপন্থী চিন্তার আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়ে তুললেন। সময়ের সাথে সাথে তিনি ইহুদীদের বিশ্বাস এবং প্রথার প্রশংসাকারী থেকে ইহুদীধর্মের (Judaism) কট্টর শত্রু হয়ে উঠলেন, আদেশ দিলেন পুরো ইহুদী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে কিংবা বিতাড়িত করে দিতে। মহম্মদ কখনো ইহুদীদের সাথে তার যুদ্ধকে ইতিহাসের এককালীন ঘটনা হিসাবে দেখেননি। প্রকৃতপক্ষে, এভাবে বললে তার নেতৃত্ব এবং রাজনীতিকে ছোট করে দেখা হয়।

পরিবর্তে, তিনি একে দেখেছিলেন এক চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে—যদি না চিরকালীন হয়—যে যুদ্ধের জন্য তার অনুসারীরা আদিষ্ট, যে যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় হবে মুসলিমদেরই এবং সেটি শেষ জামানায়। মহম্মদ তার সাহাবীদের বলেছিলেন, “কেয়ামৎ (The [last] hour) আসবে না যদি না তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং কোন পাথরের পিছনে যদি কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকে, পাথরও বলবে, ‘হে মুসলমান! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, তাকে হত্যা কর’”।

মনে হয় যেন এই ভবিষ্যদ্বাণী বহু আধুনিক ইসলামপন্থীদের বর্ণিত গণহত্যার কাহিনীর পূর্বাভাস। তাদের চোখে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এক পবিত্র কর্তব্য। কোন শান্তি চুক্তি বা অধিকৃত জমির পুনরুদ্ধার ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয়, যাদের মুসলমানরা মনে করে চিরকালীন বিশ্বাসঘাতক। এই যুদ্ধ তাদের আল্লাহর পরিকল্পনার অংশবিশেষ, ইহুদীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার আগে সে যুদ্ধের সমাপ্তি অসম্ভব।

এমন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে হিটলারের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়না। হিটলার জার্মানিতে বসবাসকারী ইহুদীদেরকে জার্মান জাতির ক্যান্সার মনে করতেন এবং তিনি মনে করতেন, ইহুদীদের নির্মূল করা ছাড়া জার্মান জাতিকে শোধরানো সম্ভব না। কোরআনে যেমন ইহুদীদের বানর এবং শুকরের সাথে তুলনা করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে নাৎসিরাও ইহুদীদের ইঁদুর ও কীটপতঙ্গের সাথে তুলনা করত। এই চিন্তাগুলিই মানুষের মধ্য থেকে মানবিকতাকে উপড়ে ফেলে, আর সেজন্যই এরা যখন কোন জাতি নির্মূল অভিযানে নামে তখন মনের মধ্যে ন্যূনতম সহানুভূতিও জেগে ওঠে না। এটিই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

মহম্মদের মৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামের জয়যাত্রার ফলে অবিশ্বাসীদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের বাস্তবতা আবার নতুন চেহারায় ধরা দিল। মুসলমান বিজেতারা খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের সহযোগীতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ডাক্তার, কায়িক শ্রমিক, অনুবাদক যাদের জরুরি প্রয়োজন ছিল নতুন ইসলামি সাম্রাজ্যের। আব্বাসিদ (Abbasid) খলিফাতন্ত্রের

তথাকথিত সোনালী দিনে, প্রাথমিকভাবে নবম এবং একাদশ শতাব্দীর মধ্যে, উভয় সংস্কৃতিই পরস্পরের চিন্তার কাছাকাছি আসে, অনেক ইহুদী নিজেদের পরিচয় দিতেন; খলিফার উপদেষ্টা, পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক বলে এবং ইসলামি-দর্শন শিক্ষাও দিতেন। বাগদাদে খলিফার প্রাসাদে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের লেখা একে অপরের আধা-সমালোচনামূলক কবিতা প্রতিযোগিতা হত, সাধারণ মানুষ তা দেখত। তারা কখনও কোন প্রতিবাদ করেনি বা তাণ্ডবও সৃষ্টি করেনি। ইসলামি বিশ্বে গত এক হাজার বছরে পরিবর্তন বিচার করতে নবম শতাব্দীর মুসলমানদের সহিষ্ণুতার সাথে একুশ শতকের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনাই যথেষ্ট। আমি শুধু ডেনমার্কে মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র এবং তার প্রকাশের ফলাফলের ঘটনাটি উল্লেখ করতে চাই।

ইহুদী এবং আরব সংস্কৃতি পরস্পরকে প্রভাবিত এবং উন্নতি সাধন করেছিল, তোরাহ্ (Torah) অনূদিত হয়েছিল আরবীতে এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকদের সাথে বিতর্ক ইহুদী চিন্তাজগতে নবজাগরণ এনেছিল। ইহুদীধর্মের উপর আরবের প্রভাব শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ঊনবিংশ শতক থেকেই ইহুদীধর্মের উপর ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

আন্দালুসিয়ার পৌরাণিক গল্প

অতি সাম্প্রতিক আবিস্কার হলেও অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেকার আন্দালুসিয়ায় ইহুদী এবং মুসলমানদের ভালবাসাপূর্ণ শান্তির সহাবস্থানের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শুরুর সময় থেকে ইউরোপে ক্রমবর্ধমান ইহুদী-বিরোধীতায় হতাশ এবং শঙ্কিত হয়ে ইহুদী বুদ্ধিজীবিরা ইতিহাস থেকে প্রমাণ খুঁজতে চাইলেন যে তাদের মানুষেরা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের সাথে পাশাপাশি বাস করতে পারে। তারা হঠাৎই খুঁজে পেলেন আন্দালুসিয়ার ইতিহাসে ভালবাসাপূর্ণ গৌরবময় দিনগুলির কথা। আর তখনই চালু হলো এক কিংবদন্তি: ঐ অঞ্চলের মুসলমান, খ্রীষ্টান, এবং ইহুদীরা আটশ' বছর ধরে সমান মর্যাদায় শান্তিতে বাস করেছে, সৃষ্টি করেছে এক উন্নত সংস্কৃতি এবং সহিষ্ণুতার মরূদ্যান।

নবম শতাব্দীর বাগদাদের মতো আন্দালুসিয়াতে শরীয়া আইন প্রয়োগ করা হয়নি; প্রকাশ্যে মদ পান করা হত, এবং সঙ্গীত, নৃত্য, ও কামোত্তেজক কবিতা ছিল প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। ইহুদীরা সরকারী উচ্চপদে, রাজনীতিতে এবং সেনাবাহিনীতেও কাজ করতেন। অবশ্য এটি সহিষ্ণুতার কারণে হয়েছে এমনটি নয় বরং এটি হয়েছে এই বিশিষ্ট পদে ইহুদীদের বসিয়ে তাদের মেধা দিয়ে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে।

একাদশ শতকে, ইহুদী কবি এবং ধর্মতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল ইবন নাঘ্রিলাহ (Samuel ibn Naghrillah) গ্রানাডায় বার্বার (Berber) সুলতানের প্রাসাদে প্রধান ভিজিয়ার (Vizier) বা সরকার-প্রধান হন, প্রধানমন্ত্রী হন বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। যখন ইবন নাঘ্রিলাহকে সেনাবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক করা হল তখন আন্দালুসিয়ার মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্য থেকে প্রতিরোধ উঠে এল, এমন কি নরমপন্থী ধর্মপ্রচারক ইবন হাজম(Ibn Hazm)-ও মনে করলেন ইবন নাঘ্রিলাহ-র নিয়োগ ইবেরিয়ান উপদ্বীপে ইসলামের শক্তির পক্ষে বিপদস্বরূপ। তার আপত্তি উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা মুসলিমদের বিশেষ সহানুভূতি লাভ করল। এই মুসলিমরা প্রধানত ইবন হানবলের মৌলবাদী ধর্মের অনুসারী। একই সাথে অধিকাংশ অভিবাসী জনগোষ্ঠী প্রবল প্রতিবাদ করল ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে, সেইসঙ্গে যে মুসলিমরা শরীয়া মানে না তাদের বিরুদ্ধেও।

যখন স্যামুয়েল ইবন নাঘ্রিলাহ-র মৃত্যুর পর তার ছেলে যোশেফ প্রধান ভিজিয়ার হন, মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদরা জনসাধারণকে আহ্বান করলেন সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে পদচ্যূত করতে; প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ধর্মীয় জনতা গ্রানাডার ইহুদী অধ্যূষিত অঞ্চলে তীব্র আক্রমণ চালাল, বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হল, প্রত্যেক ইহুদীকে দেখা মাত্র হত্যা করা হল। এই তাণ্ডবে চার হাজার ইহুদী প্রাণ হারায়, তাদের মধ্যে প্রধান ভিজিয়ার যোশেফ ইবন নাঘ্রিলাহও ছিলেন।

দ্বাদশ শতকে, মৌলবাদী তৌহিদী তথা একত্ববাদী আলমোহাদরা (Almohad) আন্দালুসিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে, তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে যাওয়া বর্বর মুসলিম অভিবাসীদের সহিষ্ণুতার মরূদ্যান

বলে পরিচিত অঞ্চলটিকে আমূল বদলে ফেলার সুযোগ করে দেয়। সঙ্গীত, নৃত্য, প্রকাশ্য মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অমুসলিমদের সাথে বসবাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে মহম্মদ যে জিম্মি (Dhimmi) আইন চালু করেছিলেন তা কঠোরতর করা হল। যেখানে খ্রীষ্টান এবং ইহুদীরা সবসময় সমান ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত, সেখানে এখন তাদের জন্য ঘোড়ার পিঠে চড়া, উঁচু গৃহ নির্মাণ করা, সরকারি গুরুত্বপূর্ণে পদে নিয়োগ পাওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। একইভাবে তাদের পোষাকের উপর তাদের ধর্মপরিচয়ের নির্দেশক চিহ্ন ধারণ করার নিয়ম তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। এই ভয়ানক অনুশাসনে বহু ইহুদী এবং খ্রীষ্টান ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়।

দর্শনকে আল্লাহর নিন্দা ও ধর্মত্যাগের সমান গণ্য করে এর চর্চাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হল। করডোবাতে (Cordoba) ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক ইবন রুশদ (Ibn Rushd—Averroes)-এর লেখা সমস্ত বই পুড়িয়ে দেওয়া হল। শিক্ষাবিদ ইবন রুশদ এ্যারিস্টটলের প্রধান রচনাগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন যা খ্রীষ্টানদের ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনকে অনেক এগিয়ে দিয়েছিল—তাকে আন্দালুসিয়ার গোঁড়া ইসলামি পণ্ডিতরা ধর্মদ্রোহী পাষণ্ড বলে দেশ থেকে বহিস্কার করে। একই পরিণতি ঘটে ইহুদী দার্শনিক মোশেহ্ বেন মাইমন (Mosheh ben Maimon)-এরও, যিনি ক্রুদ্ধ মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচতে প্রথমে ফেজ Fes) ও পরে কায়রোতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তার মতোই বহু আন্দালুসিয় ইহুদী পালিয়ে যান, আর যারা বাকী থাকে তাদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।

প্রায় একই সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসলমানরা যুদ্ধ করছিল ক্রুসেডার শক্তির বিরুদ্ধে। আগে জেরুজালেম ছিল একটা সামান্য নগরী, ইসলামের ইতিহাসে যার কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু একবার যখন বহু মুসলিম এবং ইহুদীকে হত্যা করে খ্রীষ্টান বিজেতারা একে দখল করে, নগরীটি হঠাৎ করেই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতীকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পবিত্রতার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য, বহু কিংবদন্তীর জন্ম হল, তার মধ্যে একটি হল নবী মহম্মদের একরাত্রে মক্কা থেকে উড়ুক্কু ঘোড়ার পিঠে চড়ে জেরুজালেমে যাওয়া; যেটি ইসরা এবং মেরাজ নামে পরিচিত। অথচ ইতিপূর্বে মুসলিম

জনমানসে এমন কোন ঘটনার তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাবই ছিল না।

ইতিহাস বয়ে চলে, ইসলামের শত্রু বদলায়, কিন্তু জেরুজালেমের পৌরাণিক কাহিনী রয়ে যায়।

পঞ্চদশ শতকের শেষ অবধি পুনর্দখল চলতে থাকল, আন্দালুসিয়ার প্রায় সমস্ত মুসলিম অঞ্চল খ্রীষ্টানরা পুনর্দখল করল এবং ১৪৮০ সালে ঐ অঞ্চলের ইহুদী এবং মুসলমানরা গণহারে দেশত্যাগ শুরু করল, কারণ ধর্মান্তরিতদের বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। ১৪৯২ থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত আন্দালুসিয়া প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইহুদী এবং মুসলমানমুক্ত ছিল, উভয় দলই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল। স্পেনের ইহুদীদের সাদরে গ্রহণ করল উত্তর আফ্রিকা, সেখানে তারা বেশ খ্যাতি অর্জন করল তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞানের কারণে; অন্যেরা বসতি গড়ল অটোমান সাম্রাজ্যে। ইহুদী ডাক্তার, পণ্ডিত এবং ঋণদাতারা সুলতানের প্রাসাদে বিশেষ ভূমিকা লাভ করল, কিন্তু অন্য ইহুদীরা রয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অটোমান সাম্রাজ্যে "জিম্মি" আইন বিলোপ করা হয়; কিন্তু তখনও সমতা ছিল তবে সেটি নিতান্তই কাগজে কলমে। অপরপক্ষে, বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে ইহুদীরা সমান নাগরিকের সম্মান লাভ করে।

অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়ের সাথে সাথে গোটা সীমান্ত শক্তিশালী ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের হাতে চলে যায়। উত্তর আফ্রিকা ফরাসী উপনিবেশের অন্তর্গত হয়, এবং মিশর, সুদান, ইরাক, এবং প্যালেস্টাইন অধিকার করে ব্রিটেন। আরবরা দেখল তারা বিজয়ী ইউরোপীয়দের মৃত্যুফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছে, এবং, প্রকৃত অবস্থা বুঝে ইহুদীরা বিশাল সংখ্যায় চলে গেল সভ্য ইউরোপে, স্বাধীনতা ও নাগরিকত্বের সমানাধিকার পাওয়ার আশায়। একদল চলে গেল ফ্রান্সে, আরেকদল পূর্ব ইউরোপ এবং জার্মানীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে প্যালেস্টাইনে। ইতিমধ্যে, মুসলমানরা বুঝল তাদের ধর্মীয় পরিচিতি সঙ্কটের মুখে; তারা আবার নিজেদের গুটিয়ে নিল যেন দেওয়ালের আড়ালে চলে গেল।

জনপ্রিয় গল্পের আন্দালুসিয়া, যে ছিল আরব এবং ইহুদীদের সহিষ্ণুতা এবং সাংস্কৃতিক মিশ্রণের আশ্রয়স্থল, সেখানে এই পরিস্থিতি টিঁকে ছিল

যতদিন আরব বিজেতাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলমানদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত ছিল, কারণ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে মুসলমানদের থেকে অনেক বেশী হারে কর দিত—এমন কি মিশর ও সিরিয়াতে ইসলামের বিজয়ের চার শতাব্দী পরেও সেখানকার জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ তাদের খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস বাঁচিয়ে রেখেছিল—কিন্তু শেষপর্যন্ত, প্রথমে ক্রুসেডীয় শক্তি এবং পরে মঙ্গোলদের কাছে ইসলাম বিশ্ব পরাজিত হলে তার খলিফাশাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, নাটকীয়ভাবে পূর্বের দুরবস্থা ফিরে আসে। মুসলমানদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলে তারা তীব্র প্রতি-আক্রমণ শুরু করে।

ইহুদীবাদী, ইসলামপন্থী এবং আরব জাতীয়তাবাদীরা

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে জাতীয়তাবাদের স্রোত আরব বিশ্বে এবং ইউরোপে গতি লাভ করল এবং জন্ম দিল দু'টো আন্দোলনের, যারা বিশ শতকে হয়ে উঠল মারাত্মক শত্রু, একবিংশ শতকে তাদের উপস্থিতির জানান দিল মধ্য-প্রাচ্যের ভাগ্যাকাশে। একটি ইহুদীবাদ, অপরটি আরব জাতীয়তাবাদ। দু'টি আন্দোলনই জন্ম নিয়েছিল অত্যাচারের অনুভূতি থেকে, প্রকাশ করেছিল স্বাজাত্যবোধ। দুটো দলেরই যেন তখন অহংকারী ইউরোপীয়দের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির সুযোগ মিলে গেছে।

ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা ইউরোপে ক্রমবর্ধমান ইহুদী-বিদ্বেষ থেকে মুক্তির আশায় বুক বেঁধেছিল, আর সেজন্যই তারা ইহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। অপরদিকে আরব জাতীয়তাবাদীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল কাঁধের উপর থেকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের যোয়াল ঝেড়ে ফেলে একক আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার; যেমনিভাবে ১৮৭১ সালে অটো ভন বিসমার্ক (Otto von Bismarck) জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সময়ে আশা করেছিলেন। আধুনিক ইসলামপন্থীরা এসময়ে হঠাৎ আবির্ভুত হয়ে মুসলিমদের জন্য এমন একটি স্বতন্ত্র দেশের দাবি করে বসলেন যেখানে শরিয়া আইন অনুযায়ী শাসন চলবে।

যখন এই তিনটি দলের (ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী, ইসলামিক ফ্যাসিবাদী ও ইহুদী জায়নবাদী) মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হল তখন মধ্যপ্রাচ্যই হয়ে উঠল এদের লডাইয়ের ময়দান। আরবদের সইতে হল পরাজয়ের গ্লানি -একের পর এক পরাজয়- নিজেদের ভূমিতে কখনো তাদের পরাজয়ের গ্লানি সইতে হয়েছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে, কখনো বা তাকে সইতে হয়েছে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের অপমান। আর তৃতীয়বার তাদের পরাজয়ের ধকল সইতে হয়েছে যখন ইজরায়েল দেশটি প্রতিষ্ঠিত হল আরব দেশসমূহের ঠিক মাঝখানে এবং তারা পাঁচটি সম্মিলিত আরব বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে ফেলল। ইতিহাসে এই প্রথমবার ইহুদিরা কেবলমাত্র ইসলামের অধীনে থাকা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বলে বিবেচিত থাকল না, বরং তারা হয়ে গেল মুসলিমদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিজয়ী শক্তি। আর এটিই মুসলিমদের মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে এক গভীর ক্ষতের যন্ত্রণা। এ এক বিরাট আঘাত, সত্যিই এমন আঘাত যা আজও তীব্র যন্ত্রণাদায়ক।

ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও আগে ইহুদীদের সংগঠন এবং সক্রিয়তা আরবদের এতটাই প্রভাবিত করে যে তারা ভীত হয়ে পড়ল। এটা একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন যে ইহুদীরা কিভাবে মধ্য প্রাচ্যের বাইরে থেকে শুরু করে, যা একটা বিশেষ অসুবিধা, একটি সক্রিয় গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারল, অথচ সমসাময়িক আরবরা তা করতে ব্যর্থ হল।

আরব জাতীয়তাবাদীরা তাদের আন্দোলন গড়ে তুলল পৌরাণিক কাহিনী এবং ব্যক্তিপূজার উপর নির্ভর করে, ইহুদীরা প্রয়োগ করল বিভিন্ন পদ্ধতি। ইহুদী চিন্তাধারা রূপ পেল দুই ধরণের মতের সমন্বয়ে। প্রথম, নাথান বার্ণবাম (Nathan Biirnbaum)-এর মতো গোঁড়াপন্থীদের লেখা; দ্বিতীয়, থিওডোর হার্জল (Theodor Herzl)-এর মতো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের লেখার সমন্বয়ে। ইহুদীরা বিভিন্ন আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানাল সাংবাদিক, আইনজ্ঞ, ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠিত মনের অধিকারী নারী-পুরুষদের। প্রথম থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিল যে রাষ্ট্র তারা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তার বৈচিত্রের উপর। মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক এবং ইরাণে এই সময়ে জাতীয়তাবাদী প্রক্রিয়া রূপ পেতে শুরু করল প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতাদের দ্বারা।

ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকাশ পেল দুই স্তরে। প্রথমত, রাজনৈতিক ইহুদীবাদের পতাকা তুলে ধরে। সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক কার্যক্রমে সে প্রবেশ করল শক্তিশালী দেশগুলির রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে। শুধুমাত্র অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেন নয়, অটোমান সাম্রজ্যকেও বোঝাতে বা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হল যে ইহুদী জনগণের একটি জাতীয় রাষ্ট্রের অধিকার আছে। (হার্জল নিজে এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে তিনি ইস্তানবুলে খলিফার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, আশা করেছিলেন যে তিনি প্যালেস্টাইনের জমি থেকে কিছুটা অংশ ইহুদীদের দেবেন।) দ্বিতীয়ত, বাস্তবসম্মত ইহুদীবাদের প্রয়োগ; প্যালেস্টাইনে ইহুদী অভিবাসনের সুষ্ঠু তদারকি এবং কিবুতজিম (kibbutzim) প্রতিষ্ঠা (ইজরায়েলে কৃষির যৌথ উদ্যোগ) যেখানে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রয়োগ করা হয়। অধিকন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইহুদী প্রথার সাথে সভ্যতার নীতিসমূহের মিশ্রণ নিশ্চিত করা হল সাংস্কৃতিক ইহুদীবাদ প্রবাহের মাধ্যমে।

বুদ্ধিজীবি, কৃষক, শ্রমিক এবং গেরিলারা প্যালেস্টাইনে সমবেত হল এবং ১৯৪৮-এর মে মাসে যখন ডেভিড বেন গুরিওন (David Ben Gurion) ইজরায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, সারা পৃথিবী তার সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানাল। এর আগে, বেন গুরিওন সমুদ্রে একটি জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন যে জাহাজে করে ইহুদীদের একটি গুপ্ত যোদ্ধাদল দেশের ভিতরে অস্ত্রপাচারের পরিকল্পনা করেছিল। একাধিক সংঘর্ষ এবং প্রতিবেশী আরব দেশগুলির হুমকি সত্ত্বেও, ঐ অঞ্চলের প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবল জনসমর্থনের সাথে গৃহীত হয়ে গেল। একইসাথে সবগুলো সশস্ত্র গ্রুপকে ভেঙে দেওয়া কিংবা তাদেরকে সেনাবাহিনীর অন্তর্গত করে নেওয়ার কাজও সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়ে গেল। এতদঞ্চলে গণতন্ত্রের পক্ষে এটিই প্রথম কোনো পদক্ষেপ যা শুরু হয়েছিল একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে, উচ্চমহলের কোন সামরিক বা রাজনৈতিক নির্দেশনায় নয়। ইজরায়েল সফলভাবে এক মিলনস্থলে পরিণত হল যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে অভিবাসী ইহুদীরা এসে একত্রিত হল, সময়ের সাথে মুছে গেল আফ্রিকা এবং এশিয়ার ইহুদীদের বিভেদ।

অপরদিকে আরব ঐক্য ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল। একেবারে প্রথম থেকেই এর ইহুদী বিরোধীতা ছাড়া কোন সুস্পষ্ট মতাদর্শ ছিল না। ইজরায়েলের অস্তিত্ব আরব নেতাদের কাছে অস্ত্র সংগ্রহের এবং তাদের যা শক্তি আছে তা সংহত করার একটা চিরকালীন অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ("যুদ্ধের গোলযোগ বিষয়ে একটি কথাও বলা যাবে না", একসময় একথা বলেছিলেন মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের, তিনি যুদ্ধ এবং হিংসাবিরোধী সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।) আরবের শাসকরা বেড়ে উঠেছিলেন প্রশ্নাতীত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে, অত্যাচার করেছেন সংখ্যালঘুদের এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর, সমাজ পরিবর্তনের প্রতিটি চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন ইহুদী-বিরোধীতা এবং ইসলামপন্থী মৌলবাদের নিখুঁত প্রজননকেন্দ্র। এর কোনটাই আধুনিক প্রক্রিয়া নয়; আব্রাহামের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত রেখা টেনে বিচার করলে এটাই প্রমাণিত হয়। টিউনিসীয়-ফরাসী ঐতিহাসিক আবদেল ওয়াহাব মেদ্দেবের কথায় এটিই "আসল ইসলামি অসুখ"।

মুফতি এবং নাটের গুরু: জার্মানী থেকে ইহুদী-বিদ্বেষ আমদানি

১৯৩৪ সালে আলজেরিয়ার কনস্ট্যানটাইনে ইহুদীদের উপর এক ভয়ঙ্কর গণহত্যা ঘটে। সে সময়ে আলজেরিয়া শাসন করত ফ্রান্স। নগরের ফরাসী পৌরপ্রধানের ইহুদী-বিরোধী মন্তব্য স্থানীয় আরবদের ইহুদী জনসাধারণের উপরে আক্রমণে প্ররোচিত করে। এই হত্যাকাণ্ড আরবের ইহুদী এবং ইউরোপের ইহুদীদের কাছে এক সন্ধিক্ষণ হয়ে উঠল, এই সময় থেকে তারা সকলেই পাশ্চাত্য পোষাক পরতে শুরু করে এবং যাদের ফরাসী নাগরিকত্ব ছিল তারা প্যারিসে চলে যায়। তারা এটা করলেও অসংখ্য ইহুদী ইউরোপ ত্যাগ করে মধ্য প্রাচ্যে চলে যায়। নাৎসীরা জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করার পর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ইহুদী প্যালেস্টাইনে চলে যায়।

আরব জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীরা উভয়েই একটা সুযোগ পেল পৃথিবীব্যাপী ইহুদী ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের ভাবমূর্তি তুলে ধরার, সাথে ছিলেন সিরিয়ার সালাফি রশিদ রিদা (Rashid

Rida), যিনি হাসান আল বান্নার প্রধান উপদেষ্টা। The Protocols of the Elders of Zion বহু আগেই আরবীতে অনুদিত হয়েছিল, এবং সেটিকে মনে করা হত ইহুদীদের মনোভাবের সহজ প্রমাণ। ১৯২৯ সালের কয়েক বছর পর, আমিন আল-হুসেইনি (Amin al-Husseini), জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতি, ইহুদী বিদ্বেষী অসন্তোষের আগুনকে উসকে দিলেন। ডাক দিলেন এক ইসলামি মহাসভার, তারপর আরও একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল প্যালেস্টাইনের হেব্রন (Hebron) নগরীতে। আল-হুসেইনির মহাসভাতেই প্রথম দাবি ওঠে ইহুদীমুক্ত প্যালেস্টাইনের, এবং এরপর হিটলারের সাথে যোগাযোগ করাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ।

মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড দ্রুত বুঝতে পারল যে ইহুদী-বিরোধী অস্থিরতা, জনগণ এবং দেশের রাজার মনে প্রভাব ফেলেছে। হাসান আল-বান্না তার বক্তৃতা এবং প্রবন্ধগুলিতে নবীর আয়াত যোগ করে সেগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুললেন এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে মহম্মদের প্রতিটি শব্দ নতুন করে তুলে ধরলেন, এবং নতুন মসীহা হিটলারের সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে স্বপ্নের “শেষ যুদ্ধ” লড়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন। মাইন কাম্ফ (Mein kampf)-এর আংশিক অনুবাদ করে তা লোকদের শুনিয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে তীব্রতম ঘৃণা সৃষ্টির জন্য যা কিছু করা সম্ভব তা করলেন তিনি। ধর্মোন্মাদরা শুরু করল অপপ্রচারের যুদ্ধ, এবং ১৯৩৭ এ আরব জনতা বিদ্রোহ ঘোষণা করল ইহুদী এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। ব্রিটেন ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখাল, তখনকার প্যালেস্টাইনের জাফা নগরে জঞ্জাল ফেলে ভরিয়ে ফেলল, বিদ্রোহ দমন করে সমস্ত আরব সৈন্যদের পালাতে বাধ্য করল।

এমন কি গ্র্যাণ্ড মুফতি নিজেও প্লেনে চেপে পালালেন, বিভিন্ন জায়গায় কিছুদিন করে কাটিয়ে অবশেষে চার বছর পর বার্লিনে আসলেন। তখন থেকে আল-হুসেইনি হিটলারের পক্ষে জিহাদি সংগ্রহ শুরু করলেন। এমন কি নাৎসীরা তাকে আরবী-ভাষী রেডিও স্টেশন দিয়েছিল যা তিনি ব্যবহার করতেন আরব বিশ্বে বিষাক্ত ইহুদী-বিদ্বষী অপপ্রচার চালাতে। হাইনরিখ হিমলার (Heinrich Himmler) মুফতিকে খবর পৌঁছে দিলেন যে, তিরিশ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছে এবং “চূড়ান্ত সমাধান” করায়ত্ত, মুফতি সেই সুসংবাদ বেতারে আরব শ্রোতাদের জানিয়ে দিলেন কিন্তু বিস্তারিত কিছু জানালেন না বরং প্যালেস্টাইনে “জোড়া চূড়ান্ত

সমাধান” (অর্থাৎ আর একটি এমন ঘটনা) ঘটানোর উজ্বল সম্ভাবনাকে বিশাল আকারে জানালেন, যার মাধ্যমে জার্মানি এবং প্যালেস্টাইনসহ সারাবিশ্ব ইহুদী-মুক্ত হতে পারবে।

এর অল্প কিছুকাল পর মুসলিম ব্রাদারহুড কায়রোতে বিশাল ইহুদী বিরোধী মিছিল করে, প্রকাশ্য রাস্তায় ইহুদীদের আক্রমণ করে এবং ইহুদীদের ব্যবসার স্থানগুলি তছনছ করে দেয়। পরের বছর বাগদাদে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। কয়েক বছর আগে মুফতি ঘোষণা করেছিলেন “আমরা ঐ বিদেশী ইহুদীদের শেষ লোকটি পর্যন্ত হত্যা করব। একমাত্র তরবারিই আমাদের জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে”।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৭ এ প্যালেস্টাইনকে ভাগ করার একটি প্রস্তাব পাশ করে। ইহুদীরা উল্লসিত হল, আরবরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, যদিও কেউ কেউ পরাজয়ের ভয় পেল। প্যালেস্টাইনের আরব এবং আরবের ইহুদীরা একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, বিতাড়িত হল মিশর, ইরাক, মরক্কো এবং আলজেরিয়া থেকে। আরবের ইহুদীরা নতুন বাসভূমি পেল ইউরোপে বা ইজরায়েলে, ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য লাভ করল নাগরিকত্ব। অথচ প্যালেস্টিনীয়রা বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে পৌঁছল শরণার্থী হয়ে, তখন থেকেই তারা পরিণত হল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। ভাগ্য পরিহাসে আরব ইহুদী বিরোধীতা ছাড়া অন্য কিছু তাদের প্রকৃত দুর্দশা প্রকাশ করতে পারবে না।

তারপর, ১৯৫০ সালে, সাইয়্যেদ কুতব—মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রধান মস্তিস্ক—ইসলামি ইহুদী বিরোধীতা নিয়ে পবিত্র কিতাব প্রকাশ করলেন “ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ” (Our Struggle against the Jews)। এর পাতায় পাতায় কুতব প্রকাশ করলেন চিরায়ত ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদী ষড়যন্ত্রের কাহিনী এবং মুসলমানদের সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধের কথা। কুতব লিখেছেন “আজকের ইহুদীরা ঠিক নবী মহম্মদের সময়ে তাদের পূর্বপুরুষেরই মতো, মদিনা প্রতিষ্ঠার সময় তারা যে শত্রুতা দেখিয়েছিল, আজও সেটাই করে চলেছে। প্রথম সুযোগেই তারা মুসলমানদের আক্রমণ করে, যারা তাদের মেরুদণ্ডের মতো সাহায্য করেছিল। ইহুদীরা প্রতারণা করায় অভ্যস্ত, তারা সবরকম দ্বিচারিতাসহ

মুসলমানদের আক্রমণ করে; তারা এতটাই শয়তান যে তারা চেষ্টা করেছিল কোরআন এবং সত্য ধর্ম থেকে মুসলমানদের সরিয়ে দিতে। শুধুমাত্র রক্তপাত, হিংস্রতা, এবং কুৎসিৎ নীতিহীনতা ছাড়া অন্য কিছু এই প্রাণীদের থেকে আশা করা যায় না। তারা খুন করে, গণহত্যা করে এবং নবীর প্রতি কটূক্তি করে...আল্লাহ হিটলারকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদের পরাজিত করার জন্য এবং সম্ভবত অন্যদেরও পাঠাবেন ইহুদীদেরকে শাস্তির ভয়ঙ্করতম রূপ দেখিয়ে দিতে। এই কাজের মাধ্যমে তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন”। কুতব মনে করতেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং ইহুদীদের সমূলে নির্মূল করা ছাড়া মুসলিমদের মুক্তি মিলবে না, ঠিক যেমনটি মনে করতেন এডলফ হিটলার। কিন্তু আল্লাহ তার (কুতবের) ধারণাকে বানচাল করে দিলেন, ঠিক যেমনই তিনি হিটলারের ধারণাকেও বানচাল করে দিয়েছেন। এরা দুজনেই মারা গেছে। একজন সুইসাইড করে মরেছে, আর অপরজন ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে মরেছে। ইহুদীরা এখনো পৃথিবীতে রয়েছে, আর প্যালেস্টাইনিদের দুর্দশাও বেড়ে চলছে যারা নিজেদের ভূমি আঁকড়ে পড়ে আছে।

আরব বিশ্বজুড়ে ইতিহাস পাঠ্যক্রমের প্রধান অংশ হয়ে উঠল ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা এবং সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদের অনুশীলন। পরবর্তীতে, আল-মানার, আল-আকসা টিভি এবং আল-জাজীরার মতো উপগ্রহ চ্যানেলগুলি সারা বিশ্বে প্রচার করতে শুরু করল তাদের নিজস্ব ইহুদী-বিদ্বেষী বাণী। এমনকি শিশুদের জন্য অনুষ্ঠানেও প্রচারিত হয় ইহুদী বিরোধী গল্প, জাগিয়ে তোলা হয় শহীদত্বের গৌরবগাথা এবং সেইসঙ্গে জঙ্গী অপপ্রচার।

আজ যখন প্যালেস্টিনীয় তরুণেরা ইজরায়েল বিষয়ে প্রশ্ন তোলে, তাদের আপত্তির কারণ বোঝা যায়: কারণ যুদ্ধ তাদের শহরকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের প্রিয়জনরা নিহত হয়েছে, যেহেতু ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠা সরাসরি তাদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। বোঝা সম্ভব হয় না কেন অল্পবয়সী মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী-বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়ছে যাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মধ্য প্রচ্যের সংঘর্ষের কোন সম্পর্কই নেই। যখন কাসাব্লাঙ্কায় মরোক্কানরা, লণ্ডনে পাকিস্তানিরা, বার্লিনে টিউনিসীয়রা, আমস্টারডামে ইন্দোনেশীয়রা, কোপেনহেগেনে সোমালীয়রা এবং সুইডেনের মালমো শহরে তুর্কিরা বৈঠকে বসে কেবল ইহুদি-বিদ্বেষী

ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, সেখানে আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষের বিশেষ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

এই সমস্যা গোটা ইসলাম বিশ্বেই ছড়িয়ে আছে, যা সকল প্রজন্মকে ইহুদী বিরোধী এবং পাশ্চাত্য বিরোধী ঘৃণায় দূষিত করে: পৃথিবীর প্রত্যেক কোণে মুসলমানরা Mein Kampf এবং The protocols of the Elders of Zion পড়ে খুশী হয় কিন্তু তাদের কোন ধারণাই নেই হিউম, কান্ট, বা স্পিনোজা (Hume, Kant, or Spinoza) কে ছিলেন। তারা অন্য কিছু পড়ার প্রয়োজনই অনুভব করে না। তারা যতটুকুই বা পড়ে সেটি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তো নয়ই, বরং "ঘৃণার খাদ্যসংস্থান" এর জন্যই পড়ে। আর এমন পাঠাভ্যাস মন ও মননকে কেবল বিষাক্ততা দিয়েই ভরে ফেলে। এটি ইহুদিদের যতটা ক্ষতি করে তার চেয়ে ঢের ক্ষতি করে মুসলিমদের নিজেদেরই।

মুসলিম ধর্মোন্মাদরা তালিবানের পোষাক পরে অকুতোভয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টের রাস্তায় ঘৃণাভরা বক্তৃতা দেয়, কিন্তু একজন ইহুদী পণ্ডিত বার্লিনে লাঞ্ছিত হয় শুধুমাত্র একটি কিপ্পাহ (মাথার টুপি) পরার জন্য, গোটা ইউরোপেই এই সমস্যা। আবার যখন "মুসলিম রক্ষীবাহিনী" লণ্ডনের সব এলাকায় অ্যালকোহল সেবন বন্ধ করা এবং মুসলিম নারীদের হিজাব পরতে বাধ্য করার মাধ্যমে এলাকায় শান্তিরক্ষা করে, আর ইহুদীরা সুইডেনের মালমো শহরে পালিয়ে যায়, তখন তার ফলে সমগ্র মহাদেশের সামাজিক নৈকট্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন কি ২০১৪ সালে ব্রাসেলসের একটি সিনাগগে রক্তাক্ত আক্রমণ, প্যারিসে একটি ইহুদী সুপারমার্কেটে আক্রমণ এবং ২০১৫ সালে কোপেনহেগেনের একটি সিনাগগে আক্রমণ, এই সবগুলিকেই ইসলামের ইহুদী-বিদ্বেষী আক্রমণ বলে মানতে মুসলিম সমাজ আজও অস্বীকার করে। স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ ভিকটিম হতে পারে এটা তারা মানতে নারাজ ঠিক যেমন তারা মানতে নারাজ যে তারা ছাড়া অন্য কোন জাতি থাকতে পারে যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করে। আর এভাবেই তারা উৎপীড়ক আর উৎপীড়িতের ভূমিকাকে এক করে দেখাতে চায়।

এই ইহুদী বিরোধিতা এক অতি প্রাচীন রোগের লক্ষণ, কালের পথে তার বহিঃপ্রকাশ আসে আর যায়। এই রোগ এখনও টিঁকে আছে শুধুমাত্র

মুসলিমরা আত্ম-সমালোচনায় অক্ষম বলে নয়, বহু ইউরোপীয় মানুষের ঔদাসীন্যের কারণেও বটে, যারা একে সরাসরি বাধা দিতে হয় অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম।

নিজভূমে পরবাসী: মিশরীয় খ্রীষ্টানদের জীবনের একটি দিক

দিনটা ছিল জানুয়ারী ২৫, ২০১২; বিপ্লবের দ্বারা মিশরের একনায়ক হোসনি মুবারকের পদচ্যুতির প্রথম বার্ষিকী। সামির ভোর চারটে থেকে জেগে আছে। তার আশেপাশের এলাকায়, কায়রোর দক্ষিণ-পশ্চিমে মুকাত্তম (Muqattam) পাহাড়ি এলাকায় চারিদিক অন্ধকার, একবিন্দু চাঁদের আলোও দেখা যায় না। সামিরের বয়স ঊনিশ, ক্লান্ত এবং ক্রুদ্ধ। উদ্ধতভাবে সে আমাকে বলে "আমি একজন কপ্ট (মিশরীয় খ্রীষ্টান), যেহেতু আমি এখানে জঞ্জাল পরিস্কার করি, তার মানে এই নয় যে আমি জঞ্জাল"। তারপর সে আট মাইল দূরে তার কাজের জায়গার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

এক বছর আগে, সামির ঠিক এই রাস্তা দিয়েই তাহরির স্কোয়ারে গিয়েছিল বিক্ষোভকারীদের সাথে যোগ দিতে। আজ যখন সে রাজধানীর রাস্তায় জঞ্জাল সংগ্রহ করে, তার আবার স্কোয়ারের কথা মনে পড়ে। মুসলিমরা তার কাজটাকে ভ্রূ কুঁচকে দেখে, দীর্ঘকাল ধরে এই কাজটি নির্দিষ্ট হয়ে আছে কপ্টদের জন্য যারা মিশরের জনসংখ্যার ৬ থেকে ১০ শতাংশ। খ্রীষ্টান কৃষকরা তাদের শুকরদের খাওয়ানোর জন্য বাজারের ফেলে দেওয়া অবশিষ্ট জিনিস ব্যবহার করত, কিন্তু দু'বছর আগে এই বিষয়টি হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল।

সোয়াইন ফ্লু রোগের প্রাদুর্ভাবের অজুহাতে ইসলামপন্থীরা আদেশ জারি করল দক্ষিণ কায়রোর সমস্ত পশুকে জবাই করে ফেলতে হবে। সামির নিশ্চিত, এর জন্য ধর্মোন্মাদরা দায়ী, এটা শুধুমাত্র রোগ নিয়ন্ত্রণের বিষয় নয়—প্রকৃতপক্ষে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল "কাফের"দের শাস্তি দেওয়া। সে আমাকে বলল, মুবারকের পতন তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসেনি। বরং খ্রীষ্টানরা এখন আগের থেকে অনেক খারাপ অবস্থায় আছে। সে কারণে সামির বিপ্লবের পরে এই বর্ষপূর্তির উৎসবকে ত্যাগ করছে।

তার অনেক খ্রীষ্টান বন্ধুই দেশত্যাগ করেছে। সে বলল, “আমি ধনী নই। আমি দেশ ছাড়তে পারব না। আমি যে কোন ভাবেই হোক এখানে থাকতে চাই। আমি এ দেশকে ভালবাসি—কিন্তু আজকাল যখন মুসলমানরা আমার হাতের উপর ক্রশ-এর ট্যাটু বাঁকা চোখে দেখে, তখন তাদের দৃষ্টিকে আমি সহ্য করতে পারি না”। সামির জানে সব মুসলিম খ্রীষ্টানদের ঘৃণা করে না। কয়েকজন তার বন্ধু। “তাদের অনেকেই অক্টোবর ৯, ২০১১ টিভি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিল, কিন্তু দিনশেষে তারা নিতান্তই সংখ্যালঘু”।

এইদিনে কায়রোর খ্রীষ্টানরা একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে তাদের অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেছিল। যখন সামির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ভবনের চারপাশ ঘিরে রাখা ব্যারিকেড পার হতে চেষ্টা করছিল, তখন একজন মিশরীয় সেনা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। এটা ছিল একটা ফাঁদ: ব্যারিকেডের পরে আরও দু’জন সৈনিক তাকে অভ্যর্থনা জানাল, তার দিকে একটু ঝুঁকল মাত্র। সে সময়ে সামির দেখতে পেল খ্রীষ্টানদের অন্য একটি দল অনুগত বাহিনীর যুদ্ধের ট্যাঙ্কের নীচে থেঁতলে পড়ে আছে, একজনের দেহের অর্ধেক কাটা পড়ে আছে ট্যাঙ্কের চাকার দাগে, সে তার স্ত্রীকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। তিরিশ জনের মতো খ্রীষ্টান নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল কয়েকশ’।

সামির বলে, সেনাদের নিষ্ঠুরতা সামিরকে বিস্মিত করেনি—তারা মুসলমানদেরও হত্যা করেছিল একই রকম নির্বিকারভাবে—কিন্তু কিছু মুসলিম এই খ্রিস্টান প্রতিবাদকারী দলটিকে ঘিরে রেখে সেনাসদস্যদের (বর্বর কাজে) সাহায্য করার জন্যই এগিয়ে এসেছিল। সে বলছিল, “আমি তাদের চোখে শুধু শত্রুতাই দেখিনি, সেখানে ছিল অবিমিশ্র ঘৃণা”। দু’জন অচেনা মুসলমান তাকে বারবার লাথি মারতে মারতে শেষে মাটি থেকে তুলে নীলনদে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

মাত্র ছয়মাস আগে, খ্রীষ্টান এবং মুসলমানরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, তাহরির স্কোয়ারে খ্রীষ্টানরা মানবশৃঙ্খল গড়ে ঘিরে রেখেছিল নামাজরত মুসলমানদের যা একটা বহুল প্রচারিত দৃশ্য। সে সময় সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার মুবারক সমর্থকরা নামাজরত মুসলিম এবং তাদের পাহারায় থাকা খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ করে। পরে, মুসলমান

যুবকরাও সেই ব্যবহারের প্রতিদান দিয়েছিল খ্রীষ্টানদের একটি অনুষ্ঠানে প্রহরা দিয়ে। সংক্ষেপে, মনে হয়েছিল বিপ্লব বোধহয় ধর্মের তৈরী ব্যবধানকে জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই আলেকজান্দ্রিয়াতে মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ-মাধ্যমে খ্রীষ্টানদের লক্ষ্য করে সেনাবিভাগের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার প্রত্যুত্তরে এই হাঁটু-কাঁপানো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। সামিরের মতে, ঐ ঘৃণাপূর্ণ, ক্রুদ্ধ বক্তৃতাগুলি সমর্থন লাভ করেছিল যার কারণ বিকৃত শিক্ষা-নীতি। মিশরের স্কুলগুলিতে দেশের খ্রীষ্টানদের বিষয়ে বা তাদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই পড়ানো হয় না এবং যে কোন ক্ষেত্রে অবিরাম ইসলামি অহংবোধ শুধু বিধর্মীদের মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করে।

যদিও মিশরের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশাবাদী নয়, সামির চায় সে যতটা পারে করবে। সে আশা করে সে পড়াশোনা করে পরীক্ষা পাশ করবে কিন্তু স্কুলে যাওয়ার সময় নেই, কাজের শেষে সে বাড়ীতেই পড়ে। তার আশা সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা বা আইন নিয়ে পড়বে। হয়ত মিশরের মানুষ তখন তাকে একটু সম্মানের চোখে দেখবে। সে ব্যথাভরা গলায় জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু আমি যদি কোন বড় চাকরি পাইও তবু আমার হাতের এই ক্রশচিহ্ন নিয়ে আমি কি করব?"

শুধুমাত্র মিশরে নয়, সমগ্র ইসলামি বিশ্বে খ্রীষ্টানরা ঘৃণা এবং বিদ্বেষের শিকার। বর্তমান দিনের ইরাকে, পৃথিবীর প্রাচীনতম খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে, মুসলমানরা তাদের আক্রমণ করে, আগুন লাগায় চার্চে, আদৌ কোন কারণ ছাড়াই। এমন কোন বড়দিন উৎসব (Christmas) পার হয় না, যেখানে মুসলিমদের কেউ খ্রীস্টানদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজেকে বোমায় উড়িয়ে দেয় না। ২০১৩ সালের গ্রীষ্মে মুসলিম ব্রাদারহুড সরকারের পতনের পর ব্রাদারহুড সমর্থকরা মিশরের বিভিন্ন জায়গার ৮২টি চার্চ জ্বালিয়ে দেয়। একই বছরের ডিসেম্বরে ইরাকে একট ভয়ঙ্কর গাড়িবোমা হামলার মাধ্যমে ৩৫ জন খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয় যারা চার্চে প্রার্থনা শেষে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। ইউ টিউবে প্রচারিত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একটি ভিডিওতে দেখা যায় দু'জন ইসলামপন্থী ইরাকের রাস্তায় একটি ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভার এবং দু'জন যাত্রীকে তাদের ধর্ম কি জিজ্ঞাসা করছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা বলল তারা মুসলমান এবং যেতে দিতে অনুরোধ করল। একজন ইসলামপন্থী তাদের

জোর করে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে ভোরের নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তারা উত্তর দিতে না পারায় মেসিনগান থেকে গুলিবৃষ্টি করল তাদের উপর। ফেব্রুয়ারী ২০১৫, একুশজন মিশরীয় খ্রীষ্টান পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে লিবিয়াতে যায়। ISIS তাদের বন্দী করে এবং শিরচ্ছেদ করে, সে ভিডিওটি তাঁরা ইউটিউবেও ছেড়েছে। যখনই হোক বা যেখানেই হোক, যদি বিশ্বাসের কারণে বা অতীত ইতিহাসের কারণে মানুষ খুন হয়, বুঝতে হবে সেখানে ফ্যাসিবাদ সক্রিয়।

এটা অবশ্য ভুল হবে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এক করে দেখা, তাদের অনেকেই এই ধরণের হত্যাকাণ্ডে মানসিক আঘাত পায়—কিন্তু যত সংখ্যায় মুসলমান জন্ম থেকেই ভিন্ন মতাবলম্বী এবং অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের চোখে দেখে সেই সংখ্যাকেও ছোট করে দেখা যাবে না। বর্তমানে মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ কেবলমাত্র কাফের তথা অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে খ্রীষ্টানদের বেঁচে থাকার অধিকারকেই অস্বীকার করে। আরও আরও অনেক আরবের খ্রীষ্টান আরব ছেড়ে এখন পালাতে বাধ্য হচ্ছে, যেমন ইহুদীরা এক সময়ে হয়েছিল। এই অঞ্চলের খুব অল্প সংখ্যক মানুষই একে সাংস্কৃতিক আত্মক্ষয় বলে স্বীকার করে। সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে অনৈসলামি সমস্ত বিষয়কে দূর করে দেওয়ার এই বদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন ইচ্ছা তীব্র সাংস্কৃতিক অবনমন ঘটাচ্ছে। এক কথায় বললে, এটি হচ্ছে ধর্মান্ধ জাতির পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরার কারণে তৈরি হওয়া সাংস্কৃতিক অবক্ষয় যা আজকের দিনেও টিকে আছে। ধর্ম এবং উপজাতীয় সংস্কৃতির খাদে ডুবে যাওয়া মানুষ প্রাচীন দেওয়ালের আড়ালে চলে যাচ্ছে। এই ধরণের দেওয়াল একনায়কদের জন্য সুন্দর সুরক্ষা বলয় তৈরী করে, আর জনগণকে বন্দী করে নিখুঁত খাঁচায়।

অধ্যায় ৫

গুটেনবার্গ থেকে জুকেরবার্গ - সাংস্কৃতিক একাধিপত্য এবং ইসলামের একনায়কতন্ত্র

ইসলাম তার উষালগ্ন থেকেই ইহুদী এবং খ্রিস্টধর্মের কিংবদন্তী ও কেচ্ছাকাহিনীর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আর মধ্যযুগে আরব সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল ইসলামের বদৌলতে কিংবা তার শিক্ষায় নয়, বরং সেই প্রাচীন জাতি ও সাম্রাজ্যের বদৌলতে যারা ইসলামিক শাসনের অধীনে চলে এসেছিল। মুসলিমরা তখন পারসিকদের শাসনব্যবস্থা ও বাইজান্টাইনীয়দের সামরিক পরিকাঠামোগুলো নিজেদের মধ্যে একীভূত করে নিয়েছিল। বাগদাদ থেকে দামাস্কাস, কায়রো থেকে কর্ডোভা আরবরা সংগ্রহ করেছিল সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সকল সুফল।

প্রথমদিকে ইসলাম নতুন পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পারে এটা প্রমাণ করতে পেরেছিল, বিজ্ঞান বা মুক্ত প্রশ্নের বিরোধিতা করেনি। সমৃদ্ধির সময়ে, মুসলিম শাসকরা মুক্ত জীবনযাত্রা এবং ভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাধারা সহ্য করেছে, মানুষের চিন্তাবৃত্তির উপর খুব সামান্যই হস্তক্ষেপ করেছে। ইসলামের বিরোধী মতাবলম্বীদের প্রতি এই উদারনৈতিকতা ও সহিষ্ণুতা, আরব এবং বিশাল ইসলামি বিশ্বকে দিয়েছিল শক্তি এবং সমৃদ্ধি, যা বেঁচে ছিল মধ্যযুগ পর্যন্ত। কিন্তু যখন সংকট দেখা দিল, পরিস্থিতি বদলে গেল। চলে এলো অন্ধকারের যুগ যেখানে ইসলামকেই একমাত্র পরিচয় হিসেবে সামনে তুলে ধরা হলো। ইসলামই হয়ে উঠল সমাজের সবার একমাত্র আত্মপরিচয়। এরপর ভিন্নমতাবলম্বী এবং বিধর্মীদের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হল এবং চেষ্টা করা হল সমস্ত অনৈসলামি বিষয় মুছে ফেলার। ইসলামের প্রাথমিক সহিষ্ণুতা যেমন তার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বৃদ্ধি করেছিল ঠিক তেমনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ফলে শুরু হল অবক্ষয়।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বহু অংশে এই প্যাটার্ন অবহেলিত, প্রচলিত তত্ত্ব বলে ইসলাম একাই যুদ্ধরত যাযাবরদের মধ্যে উন্নত সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বহু আধুনিক মুসলমান সব রকমের ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ হিসাবে এই ধারণাকেই তুলে ধরে দাবি করে, যে উন্নত সংস্কৃতি ইসলাম আগের দিনের অশিক্ষিত আরবদের দিয়েছিল তা যে

কোন বিচারেই ইউরোপের মধ্যযুগীয় চিন্তার থেকে এগিয়ে ছিল--এই তত্ত্বকে বাদ দিলে, ‘বিশ্বাস’ হিসাবে আরবের গৌরবময় দিনের জন্য ইসলামের কিছুই করার ছিল না। কিন্তু মুসলিমরা দুটি শতাব্দী - নবম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ করেছে আমরা যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব, ইসলাম সেখানে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যা আরব অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা এবং আন্দালুসিয়ার উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখেনি। আমরা নিরীক্ষণের মাধ্যমে একথা বলতেই পারি যে, আরব ইসলামিক সাম্রাজ্য সে সময়ের পুরো ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনে যে মহানুভবতা দেখিয়েছে তার ফলেই সেখানে সহাবস্থান এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র তৈরি হয়েছে। আবার এটিও বলা যায়, সে সময়ে আরব মুসলিমদের রাজনৈতিক/যুদ্ধনৈতিক উত্থান না হলে তারা সহাবস্থান ও বৈচিত্র্যকে স্থানও দিত না।

আরবের বিজ্ঞান এবং দর্শন উপকৃত হয়েছিল পার্শিয়ান, খ্রীষ্টান এবং গ্রীক প্রভাব থেকে, যেসব অঞ্চল নতুন করে জয় করা হয়েছিল, সেখানকার লোকেরা তাদের সাংস্কৃতিক জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে রাখত। যতদিন পর্যন্ত শরীয়ার ভূমিকা নগণ্য ছিল, যেমন নবম এবং দশম শতাব্দীর বাগদাদ এবং আন্দালুসিয়াতে ছিল, বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতি শুধুমাত্র পাশাপাশি বাসই করেনি, পাস্পরিক মিশ্রণ ঘটেছে এমন পর্যায়ে যে, মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আধুনিকতা যথেষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। তারা চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটিয়েছিল বিশেষতঃ অনারবদের সাহায্যে যেমন, ইবনে সিনা, আল-ফারাবি, মহম্মদ্ ইবন মুসা আল-খোয়ারিজমি, দামাস্কাসের জন, মোসেহ্ বেন মাইমন (Maimonides), এবং ইবন রুসদ (Averroes)। (Avicenna, al-Farabi, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, John of Damascus, Mosheh ben Maimon, Ibn Rushd)। আরব ইসলামিক সভ্যতায় আলোচিত ব্যক্তিত্বদের কেউ কিন্তু আরব ছিলেন না, আর রক্ষণশীলদের দৃষ্টিতে তো তারা মুসলিমই নন - না তখন, না এখন।

ইসলামের নতুন সামন্ত শাসকেরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে বিধর্মীদের সংস্পর্শে ভয়ের কিছু নেই। তারা বিধর্মীদের দক্ষতার সাথে অন্য সংস্কৃতির বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের সমন্বয় ঘটিয়ে আরবের প্রাচীন কর্মকাণ্ডের প্রভূত উন্নতি ঘটালেন এবং তার নাম দিলেন প্রাচীন গ্রীক

আল-কুদামা (al-qudama’a), অর্থাৎ পূর্বপুরুষ। আরব বিজেতারা ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য বিষয়ে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন শিক্ষিত, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় আলোকিত খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের সাথে। এই তর্ক থেকে জন্ম নিল ‘ইলমুল কালাম’বা তর্কশাস্ত্র পরবর্তীকালে যা রূপ নিল আরব দর্শনে। সকলে একমত হল যে যৌক্তিক এবং আধ্যাত্মিক সত্য পরষ্পর অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, যে মতবাদ পরে ইউরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডারে প্রকাশ লাভ করে। পরবর্তীকালে, যখনই মুসলিমরা বাইরের হুমকি অনুভব করল তখনই চিন্তা এবং কর্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হলো, আর শরিয়া আইন কার্যকর করার জন্য প্রচণ্ড চাপপ্রয়োগ করা হলো। তাদের দাবির ফলে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের উপর অত্যচার, দুর্ব্যবহার বাড়ল তাই নয়; জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও থমকে গেল। সেই শূন্যতা পূরণ করতে ইসলামের মূল সূত্র—কোরআনের অলঙ্ঘনীয় ঐশী বাণী, কোরআনকে সংবিধানের মর্যাদা দান, ইসলাম চিরন্তন, এবং জিহাদ আল্লাহর প্রতি কর্তব্য—এ সমস্তই বিশেষ গুরুত্বের সাথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। মুসলিমরা যতই নবীর সময়কাল থেকে নিজেরা দূরে চলে যাচ্ছে মনে করতে লাগল, কোরআন ততই পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠতে শুরু করল, বিশ্বাসীরা ততই যেন ব্যাখ্যার কোন সুযোগ না রেখে অক্ষরে অক্ষরে কোরআন পালন করতে শুরু করল, এবং এরপর তাঁরা যে-ই মোহাম্মদের সমালোচনা করেছে তাঁকেই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিয়েছে।

ক্রুসেড, সেইসঙ্গে মঙ্গোল আক্রমণ এবং বাগদাদ লুণ্ঠনের পর মুসলমানরা খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে একইভাবে কঠোর পন্থা অবলম্বন করল। বাগদাদ ছিল স্বাধীনতার অবাধভূমি, চলত মদ্যপান, সঙ্গীত এবং নৃত্য—যা গোঁড়া ধর্মনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই পরাজয়ের জন্য ইসলামিক পন্ডিতরা ইসলামি মূল্যবোধ ও শরিয়া থেকে দূরে সরে যাওয়াকে দায়ী করল, আর সেনাবাহিনীর ব্যর্থতার পরিবর্তে কারণ হিসেবে পাপকর্মকে তাঁরা দায়ী করল।

শুরুতে ফিকহ (Fiqh) এর অর্থ ছিল বোঝা বা অনুধাবন করা, কিন্তু পরাজিত হওয়ার পর এর অর্থ দাঁড়িয়ে গেল মারেফত বা আল্লাহকে পাবার জ্ঞানার্জন এবং কোরআন-সুন্নাহের বক্তব্যসমূহের সমন্বয় সাধন, যেমনটি করেছিলেন পূর্ববর্তীরা। এই নীতিকে ভিত্তি করে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব সংকীর্ণ এবং স্থবীর হয়ে গেল এবং তা হয়ে উঠল ইসলামের পুরনো

বক্তব্য সমূহের হুবহু রূপ। নতুন কট্টরপন্থীরা জোরের সাথে জানিয়ে দিল কোরআন সমস্ত জ্ঞানের আধার, সারা পৃথিবীর মানুষের চিন্তার জগৎ থেকে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের বিশ্বাসকে বাইরের নোংরা প্রভাব থেকে পবিত্র করতে হবে, তারপর দর্শন ও বিজ্ঞানকে ক্ষতিকর এবং দূষিত বলে গণ্য করতে হবে, সেই সাথে সংখ্যালঘু ও নারীদের দমন করতে হবে। অমুসলিম চিন্তাবিদদের সাথে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মৃত্যু ঘটার ফলে মুসলিম সমাজের গতি স্তিমিত হয়ে গেল। নতুন আর একটি কারণও যুক্ত হল—পর্তুগীজ অভিযাত্রী ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) ঘুরে সমুদ্রে যাতায়াতের পথ আবিস্কার করলেন—পৃথিবীর কাছে মধ্য প্রাচ্যের প্রাসঙ্গিকতা কমে গেল, ব্যবসায়ীরা ঐ অঞ্চলকে এড়িয়ে যেতে লাগল। ফলে সারা পৃথিবীতে যখন নতুন নতুন ধারণার আদান-প্রদানের একটা পথ পাওয়া গেল, তখন ঐ অঞ্চলে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের নতুন নতুন ধারণার আদান-প্রদানের ব্যাপারটা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ল। আর এরপর সারা বিশ্বজুড়ে দাস ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ মুসলমানদের প্রধান আয়ের উৎসের উপরে চরম আঘাত করল।

শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন ইসলামের স্বর্ণ যুগের সমাপ্তিকে আরও ত্বরান্বিত করল। আরবের সোনালী যুগে মাদ্রাসায় কোরআনের সাথে পড়ানো হত গণিত, দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্র, যা নতুন আবিস্কারকে উৎসাহিত করত। বাগদাদ লুন্ঠনের আগে এবং পরে ইসলাম সামাজ্য ছোট ছোট খলিফা শাসনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, যারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হল—যাদের কয়েকটির নাম সেলজুক ফাতেমী, এবং আব্বাসীয় (Seljuqs, Fatimids, and Abbasids) শাসন; পরে যুক্ত হয় মামলুক এবং সাফাভী (Mamelukes and Safavids) শাসন। ঠিক একই ঘটনা আন্দালুসিয়াতেও ঘটেছে। শাসকরা তাদের ক্ষমতা রক্ষা করত ভাড়াটে সৈনিক এবং বিশিষ্ট যোদ্ধাদের সাহায্যে, যার জন্য ব্যয় হত বিপুল অর্থ, ফলে শিক্ষাখাতে দেয় অর্থের উৎস শুকিয়ে গেল। কিছু বাদশাহ তাদের সেনানায়কদের পুরস্কৃত করলেন নগরের কিছু কিছু অংশের শাসনভার দিয়ে। ফলে প্রভাব খাটানোর সুবর্ণ সুযোগ বাদশাহদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল, কারণ সেই যোদ্ধা শাসকরা মনোযোগ দিল মসজিদ এবং মাদ্রাসা তৈরীতে, বিজ্ঞান এবং

দর্শন তুচ্ছ হয়ে গেল, রইল শুধু ধর্মীয় আদেশ-নির্দেশের চর্চা। সে সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজেকে ইসলামের নির্ভুল সেবক হিসাবে উপস্থাপিত করতে হত; তারা সেটা না পারলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হত অথবা তাদের মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হত। জ্ঞান এবং প্রশ্নের স্বাধীনতাকে সরিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি 'সম্পূর্ণ আনুগত্য এবং আদেশ পালন' হয়ে গেল নতুন শব্দবন্ধ। এই সময় থেকেই শিক্ষার অর্থ শিশুবেলায় ধর্মীয় বিধিনিষেধ শেখার চেয়ে বেশি কিছু আর থাকল না।

শেষ পর্যন্ত, শিক্ষা এবং বোধতাত্ত্বিক অনুধাবন এ দু'য়ের মাঝে তৈরি হল বিস্তর ফারাক। মুখস্থ-বিদ্যা এবং বাস্তবতা বর্জিত ধারণা বহির্জগৎ থেকে মুসলিম বিশ্বকে ক্রমেই দূরে সরিয়ে দিল। অধিকাংশ আরব দেশেই বর্তমানে বিদ্যাকে অনুধাবন করানোর পরিবর্তে প্রধান শিক্ষাদান পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আমার মতো বার বার আউড়ে যাও' এই চেহারায়, কারণ পরিপূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে নিঃসন্দেহে মানুষের সকল জ্ঞানের উৎস কোরআন এবং একথার প্রমাণ স্বরূপ অকাট্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন উপমা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে নবী মোহাম্মদকে।

অটোমান সাম্রাজ্যের গর্হিত অপরাধ

মুসলমানরা তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার জন্য প্রায়ই ক্রুসেডার ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দখলদারদের দায়ী করে। আরব দেশের পাঠ্যপুস্তকের বহু পাতা জুড়ে মুসলিমদের অধঃপতনের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকাল ও তার কুপ্রভাবের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞ কিংবা মঙ্গোলীয়দের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপার নিয়ে দু'চারটে বাক্যও লেখা হয়নি, অথচ মঙ্গোলদের হামলা আরবের ভাবনা-সংস্কৃতির বিনাশ সাধনে ঔপনিবেশিকদের চেয়েও অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক ছিল। ১২৫৮ সালে মধ্য এশীয় সামরিক শক্তি বাগদাদের গ্রন্থাগার দখল করে এবং শেষ বইটি পর্যন্ত ইউফ্রেটিসের জলে ভাসিয়ে দেয়। পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবিরা নিহত হন, সুদক্ষ কর্মীরা অপহৃত হয় এবং তাদের জাহাজে করে মধ্য এশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবু আজও আরবের স্কুলগুলিতে জেরুজালেমের যুদ্ধ এবং ক্রুসেডারদের অত্যাচারের ইতিহাস পড়ানো হয়, অথচ মঙ্গোলদের বিষয়ে সেখানে

কিছুই লেখা নেই। এটি অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল নয়, বরং মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বিচারিতা বোঝার জন্য এটি একটি প্রমাণ হতে পারে। আর মঙ্গোলরা যেহেতু শেষ পর্যন্ত ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়, সুতরাং তাদের বিজয়কে দেখা হল জিহাদের লেন্সের মধ্য দিয়ে এবং তার পরিচয় হল ইসলামের প্রসার এবং বীরত্বগাথা। এছাড়া মঙ্গোলরা এখন কোন সাম্রাজ্যের অধিকারী নয়, তাই এটিও তাদের পক্ষেই যায়।

অপরপক্ষে, আরবরা বর্তমানের ইউরোপীয়দের দেখে ক্রুসেডারদের উত্তরসূরী রূপে, যাদেরকে দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় টেনে নিয়ে আরব এবং মুসলিমদের বিপক্ষীয় আগ্রাসী ও যুদ্ধবাজ শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা ক্রুসেডের যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরই এসে হাজির হয়, শোষণ করে ইসলামি বিশ্বকে, ফলে তার দ্রুত অবনতি হয়। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, ত্রয়োদশ শতকে ক্রুসেড শেষ হওয়ার পর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte) মিশর জয় করেন ১৭৯৮ সালে, এর মধ্যে পার হয়ে গেছে ৫০৭ বছর। এই সময়কালের মধ্যে পাশ্চাত্য ইসলামি বিশ্বে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি, বরং ইউরোপ তখন দীর্ঘদিন অটোমানদের বর্বর হামলাকে প্রতিহত করতে করতেই কাবু হয়ে পড়েছিল। ইসলামি বিশ্ব এই সময়ে তার নিজের ইতিহাসেই বর্ণিত উজ্বল মেধাসম্পদের স্থবিরত্ব দূর করতে কি পদক্ষেপ করেছিল?

ইতিহাসকে ফিরে দেখলে, বাগদাদ এবং আন্দালুসিয়ার বিবদমান মুসলিম রাজ্যগুলির পতনের কারণে তুরস্কের উত্থান হল বৃহৎ শক্তি রূপে। ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল অটোমান সাম্রাজ্য, জয় করা হল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হৃদপিণ্ড স্বরূপ কনস্ট্যান্টিনোপল, যা অনেক গৌরবময় জয়ের অন্যতম। ১৫২৯ এবং ১৬৮৩ সালে দু'বার অটোমানরা ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল, সেনাসূত্রে ঘোষণা করেছিল তারা ইসলামের প্রসার ঘটাতে এসেছে। (এ থেকেই বোঝা যায় ইউরোপের দিকে অগ্রসর হতে তুরস্ক কতটা আগ্রহী ছিল।) এই সময়ে মধ্য প্রাচ্য যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তুরস্ক অভিযান চালিয়েই যাচ্ছিল, তাদের মুসলিম ভাইদের হত্যা করে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জয় করে সিরিয়া, পরের বছরেই পতন হয় মিশরের, গোটা অঞ্চল অটোমানদের অধিকারে চলে আসে। আধুনিক মরক্কো থেকে পারস্য উপসাগরের তীর পর্যন্ত চার

শতাব্দীব্যাপী অটোমান শাসন আরব (বাঁকাচাঁদ) সংস্কৃতিকে প্রতিবেশী ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, বিজয়ী তুরস্ক আরও বেশী চোখে ঠুলি পরানো গোঁড়া ধর্মীয় মতাদর্শ তুলে ধরল। বিশেষত, তুরস্কের হারেম সংস্কৃতি আরব ঐতিহ্যের লিঙ্গ-বৈষম্যকে ব্যাপক শক্তিশালী করল, নারীর প্রতি অমানবিক মানসিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

অটোমানরা তাদের গৌরবের সময়ে দুর্বল ইউরোপের দিকে অগ্রসর হতে পারত, কিন্তু নিজেদেরকে বাইরের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে গিয়ে তারা তাদের সাম্রাজ্যকেই পরিণত করেছিল দুর্বল দানবে। পঞ্চদশ শতকে জার্মানীর জোহানেস গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg) মানুষকে উপহার দিলেন এক নতুন আবিস্কার, যা পৃথিবীকে বদলে দিল: মুদ্রণ যন্ত্র। তাঁর আবিস্কার একই সাথে চূর্ণ করে দিল শিক্ষার উপর ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য এবং ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শাসক শ্রেণীর কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টাকে, আর সাধারণ মানুষ চার্চকে ডিঙিয়ে স্বাধীনভাবে জ্ঞানের জগতে বিচরণের প্রবেশাধিকার পেল। বিশাল পরিমাণে উৎপাদনের সম্ভাবনা ছাড়া মার্টিন লুথারের বাইবেল এবং তার পঁচানব্বইটি গবেষণা-পত্র যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তা সম্ভব হত না। ছাপাখানা জনসাধারণের সাক্ষরতার মান উন্নত করে দিল এবং ইউরোপের পাঠকদের পরিচয় ঘটাল ডেভিড হিউম, ইমানুয়েল কান্ট, রেনে দেকার্তে (David Hume, Immanuel Kant, Rene Descartes) এবং আরও অন্য মনীষীদের চিন্তা-ভাবনার সাথে যারা তাদের নিজ নিজ ভাষায় বিভিন্ন বই অনুবাদ করেছিলেন ও ল্যাটিন ভাষার একাধিপত্য থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করছিলেন। ল্যাটিন ভাষা তখন ছিল জমাটবদ্ধ এক পবিত্র ভাষা, যেহেতু ল্যাটিন ছিল বাইবেলের ভাষা। আর এভাবেই পুরো মহাদেশের মানুষের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে গেল, যা পরবর্তীতে চিন্তা, দর্শন ও কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রে বিপ্লবী যুগের সূচনা করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে হয় শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লবের ফলে এমন একদল মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয় যারা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি খোঁজার চেষ্টা করে শাসক ও সামন্তপ্রভুদের হাত থেকে। আর এভাবেই মধ্যবিত্তের হাত ধরে গণতন্ত্র ও উদারনৈতিকতাবাদের সৃষ্টি হয়।

অটোমান সাম্রাজ্যে গুটেনবার্গের যন্ত্র ইস্তানবুলে আমদানী করার দাবি বেড়ে চলা সত্ত্বেও, ধর্মীয় পণ্ডিতরা যারা একটা দোলাচলের মধ্যে ছিল,

তারা প্রবল আপত্তি জানাল যে এর ফলে কোরআন বিকৃত হতে পারে। বেশী পরিমাণে ছাপা হলে পবিত্র কিতাবের সমস্ত বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যাবে না। সে কারণে প্রায় তিনশ’ বছরেরও বেশী সময় ধরে ইসলামি বিশ্ব ছাপাখানা আবিস্কারের প্রভাবের বাইরে রইল, সঙ্গে রইল সামাজিক প্রতিক্রিয়া। মাত্র একটি মুদ্রণযন্ত্র ইস্তানবুলে পৌঁছেছিল ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে, সেটির ব্যবহার হত সুলতানের নিজস্ব দপ্তরে তার কর্মচারীদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে। আর একটি মুদ্রণযন্ত্র ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন কায়রোতে নিয়ে গিয়েছিলেন, শুধুমাত্র আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের জন্য, যারা সেটিকে শয়তানের যন্ত্র বলেছিলেন। এসব সত্ত্বেও যখন ফরাসীরা আলেকজান্দ্রিয়ার আবু কির (Abu Qir) বন্দরে ছাপার প্লেটগুলি নামাচ্ছিল, তখন ধর্মীয় উন্মাদরা সেগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। ইউরোপ এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে মুদ্রণ যন্ত্র নিয়ে যে তীব্র সাংস্কৃতিক মতপার্থক্য ঘটেছিল তেমন আর কোথাও ঘটেনি। একদিকে যখন ইউরোপীয়রা এই আবিস্কারের সুবিধা নিয়ে পোপতন্ত্রের ক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক একাধিপত্যকে খানখান করে বিশ্লেষণমূলক চিন্তার ধারা প্রতিষ্ঠা করল অন্যদিকে তখন ইসলামী বিশ্ব তাদের ধর্মীয় পরিচিতি হারানো এবং পবিত্র কিতাবের বিকৃতির ভয়ে একে বলল শয়তানের কল। এই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের সময়ে ইসলামের ডিক্টেটরশিপ প্রাচ্যে মানুষের উপর তার মুষ্ঠি আরও কঠিন করল।

ইউরোপ তার গতিকে নিয়ে গেল বিশ্বাস থেকে চিন্তায়, ধর্মতত্ত্বের জায়গায় বসাল জ্ঞানতত্ত্বকে। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ যখন উন্নত চিন্তাধারা এবং কারিগরি আবিস্কারের সাহায্যে শিল্পক্ষেত্রে এবং মেধার জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলল, গোটা “পাশ্চাত্য” কে কয়েক দশকে আমূল বদলে ফেলল; তখন মধ্য প্রাচ্য নিশ্চেষ্ট এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল।

আবদ আল-ওয়াহাব (ABD AL-WAHHAB) এবং “পুনর্নবীকরণ” (সংস্কার আন্দোলন)

ইউরোপীয়রা যখন ভলতেয়ার, রুশো, ইমানুয়েল কান্ট প্রমুখ মনীষীদের ভাবনাচিন্তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করছিল, সেই সময়ে প্রাচ্যে

এক ব্যক্তি এলেন যিনি সংস্কারের ডাক দিলেন, বিশেষ করে আরব চিন্তার জগতে। তিনি মহম্মদ ইবন আবদ আল-ওয়াহাব (Muhammad ibn Abd al-wahhab 1703-1792), ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মানুষের প্রাত্যহিক জীবন এবং সংস্কৃতি থেকে অনৈসলামি সমস্ত বিষয় দূর করে দিতে চাইলেন। তিনি 'কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার' ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, এমনকি সুফী মুসলমানদেরকেও বাধ্যতামূলকভাবে অক্ষরে অক্ষরে কোরআন পালন করতে হবে, কারণ তাদেরও তিনি কাফের মনে করতেন। আজ হয়ত একটু হাস্যকর শোনায় যে তিনি এবং তার অনুসারীরা এই কর্মসূচীর নাম দিয়েছিলেন তাজদীদ (tajdid) অর্থাৎ "পুনর্নবীকরণ"।

আল-ওয়াহাবের মতাদর্শের ভিত্তি মহম্মদের প্রতিশ্রুতি, যে প্রতি একশ' বছরে আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্য একজন মুজাদ্দিদ (mujaddid) পাঠাবেন 'বিশ্বাস' নবীকরণের জন্য—এখানে নবীকরণের অর্থ আদি রীতিতে ফিরে যাওয়া। কারণ দ্বীন বা ধর্ম হচ্ছে এমন সুদৃঢ় ও পবিত্র বিষয় যেখানে আলোচনা কিংবা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই, বরং এর মধ্যে ঢুকে পড়া প্রত্যেক অনৈসলামিক বিষয় দূর করে একে পবিত্র করতে হবে। মিশরের শাসক মহম্মদ আলি উনবিংশ শতকের শুরুতেই ওয়াহাবি মতবাদকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন, তার মতে এটি তার আধুনিকীকরণের চেষ্টায় বাধাস্বরূপ, কিন্তু ইংরেজরা সেই চেষ্টাকে আটকে দেয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি এবং সৌদি রাজ পরিবার নানা ভাবে এক অসাধু জোট তৈরী করে যা আজও চলছে।

আধুনিক ওয়াহাবিরা সৌদি রাজ পরিবারের প্রধান সমর্থক। রাজ পরিবারের রাজশক্তির বৈধতা মেনে নেওয়ার বিনিময়ে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবের শিশুদের শিক্ষা ও ধর্মীয় বিধি নিয়ন্ত্রণের। দেশের নৈতিক অভিভাবক হিসাবে তারা রাস্তায় নজরদারি করে, "পাপী"দের গ্রেপ্তার করে—যেসব পুরুষরা নামাজের সময়ে (নামাজ না পড়ে) বাইরে থাকে বা যে নারীদের হিজাবের ফাঁক দিয়ে একটা চুল বেরিয়ে পড়েছে তাদের।

অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্রে, ধর্মীয় কর্মীরা ঠিক একই কাজ করে তবে একটু অল্পমাত্রায়, যাতে শাসকপক্ষের ক্ষমতা অটুট থাকে। তীক্ষ্ণ নজর রাখে

দেশের শিক্ষানীতির উপর এবং যুবকদের পরিচালনা করে যেমন তারা ঠিক মনে করে। নতুন করে তাদের মর্জিমাফিক ইতিহাস লিখে তারা ইসলামকে সুমহান উচ্চতায় তুলে ধরে আর শত্রুদের চিত্রিত করে দানবরূপে। দেশের মেধাসম্পদের দিগন্তকে বিস্তৃত করার সব চেষ্টাকে শাসক ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় সমূলে ধ্বংস করে এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাবৃত্তির উপর বজায় রাখে তাদের একাধিপত্য। জনসাধারণকে সতর্ক করে উম্মাহর বিরুদ্ধে দূরাগত বিপদের বিরুদ্ধে তারা যেন লড়াই বন্ধ না করে, এর মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করতে চায় যে, বাইরের শত্রুর ভূত স্কুলের পাঠ্যবইয়ে এবং সংবাদ মাধ্যমে সদাসর্বদা হাজির থাকে।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১, এর পর বহু আরব দেশের পাশ্চাত্য বন্ধুরা চাপ সৃষ্টি করে এটা নিশ্চিত করতে যে তারা যেন স্কুলপাঠ্যবইয়ে বিধর্মীদের বা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেককারী কোন বিষয় না রাখে। আশ্চর্যজনক ভাবে আচরণগত রাজনীতি দেখিয়ে কিছু দেশ, প্রধানত মিশর এবং সৌদি আরব, এটা করল—স্কুলগুলি থেকে সব পাঠ্যবস্তু সরিয়ে নিল যেখানে অভ্রান্তভাবে ঘৃণা উদ্রেককারী বিষয় আছে। পরিবর্তে নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হলো যেখানে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে প্রমাণিত হল, এটা ছিল একটা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। কারণ যে পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল নবীর নির্দেশ এবং কোরআনকে ভিত্তি করে লেখা—সেগুলি মূলত একই রয়ে গেছে।

শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকেই নয়, এই বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র দেখা যায়। এই সমস্যা যতটা দর্শন সংক্রান্ত ততটাই বাস্তব, যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইসলাম কর্তৃক বিশ্বকে মুমিন (ইসলামে বিশ্বাসী) এবং কাফের (ইসলামে অবিশ্বাসী) কিংবা দারুল ইসলাম এবং দারুল হারব- এই দুই ভাগে ভাগ করার সাথে। একই সাথে এর মূল ভূ-রাজনীতিতে গাঁথা, হীণমন্যতায় বদ্ধ। ফলে বহু মুসলিম মনে করে সমস্যা উত্তরণে তাদের কাছে একটাই পথ খোলা—পাশ্চাত্যের হৃদয়হীন, আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

এই মনোবৈকল্য (schizophrenia) সৌদি আরবে অতি প্রকট: এর শাসক পরিবারের ওয়াশিংটনের সাথে শক্তিনীতি (energy) বিষয়ে বন্ধুত্ব, পাশ্চাত্য থেকে আমদানী, এবং আমেরিকার সেনাঘাঁটি স্থাপন এসব

কিছুই সহাবস্থান করে এক অমানবিক, উগ্র ধর্মীয় ওয়াহাবি ইসলামের সাথে, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ করে। দেশটির অত্যধিক পাশ্চাত্য জীবনধারার অনুকরণ, প্রকাশ্যে আমোদ-ফূর্তি অথচ মনে মনে তীব্র ঘৃণা পোষণ করা এর সঙ্গতিহীন আচরণকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ৯/১১ সন্ত্রাসীদের উনিশ জনের মধ্যে পনেরজনই সৌদি আরবের।

যখন সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনকে বলেন যে তার দেশের সকল পাঠ্যবই এখন "ঘৃণা মুক্ত", তখন ওয়াশিংটন পোস্ট মে, ২০০৬ সালে তাদের "সংশোধিত" ধর্মীয় পাঠ্যবই সমীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসে যে, সেখানে এখনও লেখা আছে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং অবিশ্বাসী ও বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের কর্তব্য। পত্রিকাটি তার প্রতিবেদনে এমন অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরেছে, তাদের মধ্য থেকে প্রথম শ্রেণীর একটি অনুশীলনী এরূপ:

উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর (ইসলাম, দোজখের আগুনে): প্রত্যক ধর্মই মিথ্যা, একমাত্র______ব্যতীত। যে ইসলামের বাইরে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে________প্রবেশ করে।

চতুর্থ শ্রেণীর বইতে আছে, "প্রকৃত ইমানের অর্থ...তুমি মুশরিক এবং কাফেরদের ঘৃণা করবে কিন্তু তাদের নিপীড়ন করবে না"। পঞ্চম শেণীর ছাত্রদের বলা হচ্ছে, "যে রসুল এবং এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে কখনও যারা আল্লাহ্ এবং রসুলের বিরোধীতা করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না, এমন কি তারা যদি নিকট আত্মীয়ও হয়"। অবশ্য এমন বক্তব্য বই থেকে মুছে ফেলা সম্ভবও না, কারণ এটি তো কোরআনেরই একটি সুস্পষ্ট আয়াতের প্রতিধ্বনি মাত্র, "আপনি পাবেননা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে—হোক না এ বিরুদ্ধচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোত্র" (কোরআন)। অষ্টম শ্রেণীর বইতে বলা আছে, "বানরেরাই ইহুদী, যারা সাবাথের মানুষ; শূকররা খ্রীষ্টান, যীশুর অনুগামী কাফের"। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জিহাদের সাথে পরিচয় করানো হচ্ছে এইভাবে, "আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ হল অবিশ্বাস, অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং যারা তা পালন

করে তারাই ইসলামের সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ। এই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে এবং জিহাদের মাধ্যমেই এর পতাকা সমুন্নত”।

সব দেশের মধ্যে সৌদি আরবই শিশুদের বলে জিহাদ হল অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই, যা একটি সম্পূর্ণ হাস্যকর মিথ্যা। জগতে সৌদি আরবের মতো এমন আরেকটি দেশ পাওয়া যাবে না যে তার নাগরিকদের সবসময়ে দমন করে রাখে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে। সুতরাং আমরা এমন একটি ব্যবস্থার সামনে আছি যা অতিশয় চাতুর্যের সাথে লোকদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেয় এবং মানুষের বিচারবোধকে এত দক্ষতার সাথে ঢেকে রাখে যে কারো পক্ষেই আর ওদের দ্বিচারিতা ধরে ফেলা সম্ভবপর হয় না। এই বৈপরীত্য, ফ্যাসিবাদের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য, কারণ: মানুষ অবদমন ও নিপীড়নের জোয়ালের তলায় থাকে, অথচ তারা মনে করে তারা বুঝি স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বল সময়কালে অবস্থান করছে।

এই জাতীয় বইগুলি শুধুমাত্র সৌদি আরবেই পড়ানো হয় না, ইউরোপের উনিশটি দেশে যেখানে সৌদি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানেও সৌদি ওয়াহাবী ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এমন উগ্র ও পশ্চাৎমুখী পাঠ্যসূচির অনুসরণ করা হয়। আমরা যদি ইউরোপে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব যে, প্রত্যেক সন্ত্রাসীর সাথে ওয়াহাবী মসজিদ সমূহের ওতপ্রোত সম্পর্ক। যখন ফ্রান্সের পুলিশ শার্লি এবদো পত্রিকায় হামলার পর হামলাকারীদের কার্যকলাপ তদন্ত করছিল তখন তারা আবিষ্কার করে যে, হামলাকারীরা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের একটি সৌদি সালাফি মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখত। একইসাথে যখন বেলজিয়াম আইসিসের সমর্থিত একদল সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি তদন্ত করেছিল তখন তারা দেখতে পায়, এদের অধিকাংশই ওই একই মসজিদ অর্থাৎ সৌদি সালাফি মতাদর্শের মসজিদের ধ্যান-ধারণার দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়েছে।

হয়ত ভবিষ্যতে মুখ বাঁচাতে কিংবা যুবরাজকে তুষ্ট করতে সৌদি আরবের আরও বই এভাবে “সংস্কার” করা হবে কিন্তু তখনও সেখানকার শিক্ষক, ইমাম ও যুবকদের প্রাচীন রীতিতে গঠিত মানসিকতা একই থেকে যাবে। সৌদি মন্ত্রীরা ৯/১১ এর পর সন্ত্রাসবিরোধী কর্মসূচী চালু করেছিল,

সেক্ষেত্রেও একথা সমান সত্যি। আগে মুফতিদের বক্তব্যে ইসলামত্যাগী তথা মুরতাদদের হত্যা করার এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের নিষ্ঠুর আহ্বান ছিল, তাদের বলা হল দেশের যুবকদের বলতে যে ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ, এবং সহিষ্ণু ধর্ম। কেউই ভাবতে পারেনি কর্মসূচীটি আপাতদৃষ্টিতে যে সন্ত্রাসবাদী মতাদর্শের বিরোধীতা করছে, সেই সন্ত্রাসবাদী মতাদর্শ দুই শতাব্দী ধরে মুফতি এবং ওয়াহাবিরা যা প্রচার করে আসছে তারই ফসল। আমরা অবাক হইনা যখন দেখি, অধিকাংশ আইসিস জিহাদিই এসেছে সৌদি আরব থেকে, আর তাদের সাথে পরবর্তীতে মিলিত হয়েছে ইউরোপিয়ান জিহাদিরা যাদের ধ্যান-ধারণা সৌদি নিয়ন্ত্রিত মসজিদ থেকেই পরিপুষ্ট হয়েছে।

২০০৯ সালে ইয়েমেন-এর স্কুলপাঠ্য বইয়ের উপর সানা (Sana’a) সরকারের একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয় মুসলমানরা প্রায়ই বলে “অন্যেরা”—স্পষ্টতই পাশ্চাত্য—শত্রু শক্তি এবং তাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করে। সমীক্ষাটি শেষ হয়েছে একটি অজুহাত দিয়ে যে এই প্রতিবেদনটিকে মনে করা যেতে পারে তথাকথিত “অন্যদের” ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের প্রত্যুত্তর। জর্ডনের স্কুল পাঠ্যবইয়ে সামান্য দৃষ্টি দিলেই প্রকাশ পায় সেই একই ছবি; “অন্যদের” ব্যতিক্রমহীন ভাবে দেখানো হয়েছে তাদের সমাজের প্রতিপক্ষ রূপে, মুসলমানরা যা কিছু বর্জন করে এবং করবে, সেই “অন্যরা” সেগুলির পক্ষেই বলে। পাশ্চাত্যের কিছু কিছু বিষয় যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি গ্রহণ করলেও, রহস্যজনকভাবে সভ্য গণতন্ত্র, আধুনিক শিক্ষার আলো, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাওয়া পাওয়া সেখানে অবহেলিত। আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আরব একনায়কতন্ত্র তার ছেলেমেয়েদের এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এক উঁচু দেওয়াল তুলে রাখে; কারণ গণতান্ত্রিক দেশকে আদর্শ বলে মানতে তারা পছন্দ করে না। যদি আবার ওরা গণতন্ত্র চেয়ে বসে?

একদিকে, পাঠ্যবইয়ে তাদের সমাজের বিশেষ দিকগুলি তুলে ধরা হয়; অন্যদিকে যারা শাসনক্ষমতায় আছে তারা মানুষের চিন্তাভাবনাকে যে আদলে গড়তে চায় তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে। একনায়করা সমাজের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে এবং ব্যবহার করে, মানুষের প্রতিদিনের চিন্তা এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে আরও “পরিশোধ” ক’রে

তাদের শাসনক্ষমতাকে ও পছন্দের রাজনীতিকে পুষ্ট করে। এই পাঠ্যবইগুলির মতো আরও অনেক বইতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে ইসলামি বিশ্ব তাদের সংস্কৃতিকে কোন দৃষ্টিতে দেখে, সেই সাথে তাদের সন্তানদের জন্য কেমন পৃথিবী তারা রেখে যেতে চায়, পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বহু প্রজন্মের উপর পাশ্চাত্য যে অত্যাচার করেছে তার অক্ষম অসন্তোষের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা ছাড়াও ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা মসজিদে তাদের প্রভাব প্রয়োগ করে, এমন কি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ আরব একনায়কতন্ত্র তাদের ক্ষমতা দেয় শাসকের স্বার্থ রক্ষার। উদাহরণ স্বরূপ, গামাল আবদেল নাসের মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন, এবং সেই সময় থেকেই প্রতিটি বিভাগে নিজে ইমামদের বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সংবাদ মাধ্যমকে বাধ্য করা হল সম্পূর্ণভাবে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী চলতে, সরকারের প্রচারের আর একটি হাতিয়ার হয়ে উঠল ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মীয় নির্দেশাবলী।

ইসলামিক স্টেট (ISIS) দাবি করে তাদের আদর্শ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে, তাদের যোদ্ধাদের অধিকাংশই প্রথম জিহাদের এবং খলিফাতন্ত্রের ধারণা পেয়েছে তাদের দেশের স্কুলে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যে আদর্শ তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে তাকে আক্রমণ না করলে তা নিতান্তই সময়ের অপচয়: পাশ্চাত্য দেশগুলি যখন সৌদি আরব এবং কাতারের সঙ্গে মিলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথাকথিত যুদ্ধে অংশ নেয় তখন সেই দেশগুলিই লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে সেই আদর্শ প্রচার করতে, যা ব্যতীত ইসলামিক স্টেট নিঃশেষ হয়ে যেত। এমন বন্ধু থাকলে শত্রুর প্রয়োজন কি?

গুগল যুগে বিরোধীতা

গুটেনবার্গের পাঁচ শতাব্দী পরে, পাশ্চাত্য বিশ্বকে দিল দ্বিতীয় উপহার— মুদ্রনযন্ত্রের মতোই এমন এক আবিস্কার যা পৃথিবীকে বদলে দিল, যে পরিবর্তন অপরিবর্তনীয়। যে দেশগুলি দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখতে চায়, দুনিয়ার চিন্তাবৃত্তি থেকে দূরে রাখতে চায়, তাদেরকে চ্যালেঞ্জের

মুখে ফেলে দিল ইন্টারনেট (আন্তর্জাল)। স্বাভাবিকভাবেই, ইসলামি পণ্ডিতরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করল ঠিক যেমন গুটেনবার্গের আবিস্কারের বিরুদ্ধেও করেছিল। সাবধান করেছিল এর ভিতর লুকানো বিপদ সম্পর্কে। এবার কিন্তু তারা ভুল করেছিল, বহু মুসলমান যুবক দিনে বেশ কয়েকঘন্টা ইন্টারনেট ব্রাউজ করে, রাজনীতি ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে, পশ্চিমী গান শোনে, এবং যৌন উত্তেজক ছবি (pornography) দেখে। ইন্টানেটের যুগ তাদের নীতিবোধ এবং সেইসঙ্গে চিন্তার গতি বদলে দিয়েছে: আজ কোন শিক্ষক বা পণ্ডিত কোন মুসলমান যুবকের হাতে কোন তথ্য তুলে দিলে সেটিকে সে চরম সত্য বলে মনে করে না; এখন সে তার যথার্থতা পরীক্ষা করতে পারে অথবা বিপরীত মতামত যাচাই করতে পারে।

ফেসবুক প্রজন্ম অন্যদের থেকে বেশী সংখ্যায় মিশরের রাস্তায় নামল মুবারক এবং মোরসির বিরুদ্ধে (প্রকৃতপক্ষে সরিয়ে দিতে), সেইসঙ্গে একই ঘটনা ঘটল একনায়ক শাসিত অন্য দেশেও—টিউনিশিয়াতে বেন আলি, ইয়েমেনে সালেহ, লিবিয়ায় গদ্দাফি, সিরিয়াতে আসাদ। আজও তাদের আন্দোলন অব্যাহত। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছেলেমেয়েরা কৌতুহলী, সমালোচনামনস্ক, এবং তারা তাদের চিন্তাকে ঘিরে থাকা নিষেধের বেড়াজালকে—বা ধর্মীয় অভিভাবকদের অলঙ্ঘ্যতাকে মানতে নারাজ।

২০১২ সালে কায়রোতে আমি একটি বিতর্কসভায় যোগ দিয়েছিলাম। মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ একজন প্রখ্যাত পণ্ডিতও সেখানে ছিলেন, তিনি তার দলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে বললেন। তিনি বললেন, “ইনসাল্লাহ, (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন) আমরা আশা করি আগামী পাঁচ বছরে মিশরে আন্তর্জাতিক পর্যটক দ্বিগুণ হবে”।

এক যুবক শ্রোতা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল “আমিও একজন মুসলিম—আমি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি—কিন্তু আমরা আলোচনা করছি অর্থনীতি এবং পর্যটন বিষয়ে। এর সাথে আল্লাহর ইচ্ছার কি সম্পর্ক আছে? আপনি কি কিছু মনে করবেন নির্দিষ্টভাবে আমাদের বলতে যে আপনার পরিকল্পনা কি এবং কেমনভাবে তাকে বাস্তবায়িত করা হবে? আমাদের বলুন এতে কত খরচ হবে। বলুন

কোথায় নতুন হোটেল তৈরী হবে। এবং আল্লাহর দোহাই, আল্লাহকে ছেড়ে দিন, কারণ আমি শুনতে চাই না যদি ভবিষ্যতে আপনার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় আপনি বলবেন এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না"। আমি হতবাক হয়ে গেলাম "আল্লাহকে ছেড়ে দিন" কথাটি শুনে, বিশেষত একজন বিশ্বাসী মুসলিমের মুখে।

ইন্টারনেটকে ধন্যবাদ, আরব বিশ্বে এখন ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ভিন্নভাবে আলোচিত হচ্ছে। একসময়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে প্রায় ঈশ্বর বা ধর্মবিরোধিতা বোঝাত। কিন্তু ২০১২ নির্বাচন-পরবর্তী মুসলিম ব্রাদারহুডের শাসনাধীনে মিশরের মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ইরাক এবং সিরিয়ায় আইসিসের উত্থানের তিক্ততার কারণে তারা ধর্ম এবং রাষ্ট্রের বিভাজন বিষয়ে আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করতে শুরু করল। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উপর আমার বক্তৃতার শেষে একজন মিশরীয় যুবক আমার কাছে এসে বলল, "আপনি অবশ্যই ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার কথাগুলি অত্যন্ত উসকানিমূলক— কথাগুলি বহু মানুষের সমর্থন পাবে। যখন আপনি বলেন আমাদের প্রয়োজন ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা, তখন মনে হয় ধর্ম একটি ধ্বংসাত্মক বিষয়, সমাজের উপর একটি টিউমার যাকে কেটে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবর্তে আপনি যদি বলতেন, আমাদের রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদাভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে, তাতে মনে হত ধর্ম একটি পবিত্র জিনিস, যাকে প্রতিদিনের বিভিন্ন বিষয় দিয়ে দূষিত করা অনুচিত"।

যুবকের বক্তব্য আমার বেশ সৃজনশীল বলে মনে হল। তিক্ত ওষুধের উপর চিনির প্রলেপ লাগানো আমি পছন্দ করিনা। আমি কোন বিষয়কে যেমন দেখি তেমনভাবেই প্রকাশ করি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম যুবকটি যে কথাগুলি বলেছিল অন্যান্য সভাতেও তারই ছায়া, যুব মুসলমানরা রাজনীতিতে ধর্মের ধ্বংসাত্মক উপস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। গোটা আরব বিশ্বে বিপ্লব পরবর্তী সমাজে এর ভূমিকা নিয়ে সুস্থ বিতর্ক উঠে আসছে। দুঃখজনক রাজনৈতিক বাস্তবতার মাঝে এ এক আলোর রেখা। পরিতাপের বিষয়, শান্ত এবং সংবেদনশীল যুবকেরা দূরে থাকছে সেই সব মানুষের থেকে যারা আইন এবং রাজনীতির উপর ধর্মের প্রভাবকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ধর্মোন্মাদরা

সংবাদমাধ্যমের পিছনে পিছনে ঘুরছে—বিশেষত ফেসবুকে—তাদের মতামত এবং অপপ্রচার চালানোর মঞ্চ হিসাবে। ইন্টারনেট সকলের কাছেই আজ সহজগম্য, এতে প্রকাশ পাচ্ছে আরবদের মধ্যে এক ভয়ানক সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠছে দু'ই পক্ষের মধ্যে; প্রথম, যারা একুশ শতকে প্রবেশ করতে চায় এবং দ্বিতীয়, যারা সপ্তম শতককে ধরে রাখতে চায়।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, মুদ্রণ যন্ত্র এবং আরব বিশ্বে তার প্রবেশের সাথে ইসলামি ফ্যাসিবাদের কি সম্পর্ক। প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যদি বলা হয়, হিটলারের উত্থান এবং ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের সাথে নাৎসি মতাদর্শের প্রচারের কি সম্পর্ক? হিটলার গুটেনবার্গের মহান আবিস্কারকে ব্যবহার করেছিলেন বই, প্রবন্ধ, বা লিফলেট আকারে তীব্র ঘৃণা ছড়াতে। এ কথা খুবই সত্য যে, জার্মান ফ্যাসিবাদ প্রচণ্ড দক্ষতা দেখিয়েছিল আধুনিকতার সাফল্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে, এর লক্ষ্যকে পূরণ করতে, সফল হয়েছিল ইউরোপের ইহুদীদের গণনিধনে এবং কারিগরী ও আদর্শগতভাবে সময়ের সাথে তাল রেখে নতুন নতুন অস্ত্র তৈরী করতে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিশ্ব এবং মানবতার চোখে জার্মানী নতুন রূপে দেখা দিল যা নাৎসীবাদের উত্থানের আগের আলোকিত চেহারায় ফিরে এসে তাদের নতুনভাবে পথ চলা সম্ভব করল; দেশের পুনর্গঠন গতিলাভ করল এবং সবকিছু নতুনভাবে শুরু হল। সেই সময়ে পুনর্গঠনের বিশাল কাজকে আমি কোনভাবেই ছোট করে দেখতে পারি না, তার কিছু কিছু এখনও চলছে। আমি এও বুঝি, যে সব ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলে নাৎসী নেতাদের জনমোহিনী কিন্তু অযৌক্তিক বক্তৃতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাদের পক্ষে সেই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন —কিন্তু এসব সমস্যা সত্ত্বেও বাস্তবতা এই যে যদি কোন সামাজিক কাঠামোর অস্তিত্ব আগে থেকেই থাকে, তার মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

অপরদিকে, ইসলামি বিশ্বে মুদ্রণযন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন বিরোধীতা— সেই সঙ্গে এর সাফল্য দুই সমাজের বৈষম্যগুলিকে একসাথে গেঁথে ফেলল। ক্ষমতায় যারা আছে তাদের প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তি অর্চনা, অলঙ্ঘ্য কোরআন এবং পণ্ডিতদের চরম সত্য বিষয়ে প্রচার হয়ে উঠল

সমাজের বিভিন্ন স্তরের দাবি, যে সমাজ পৃথিবীকে ভাগ করে ফেলল শুধু শত্রু আর মিত্রতে। বর্তমানের ইসলামি ফ্যাসিবাদীরা ঠিক এমনই একটি সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, সেই সঙ্গে তাদের অন্তরে পৃথিবী সম্পর্কে যে মনোভাব তাকেও। অথচ গুগল প্রজন্ম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, তর্ক করছে শিক্ষকদের সাথে, এমনকি মসজিদের ইমামদের সাথেও। তারা মানতে চায় না কোরআন সমস্ত জ্ঞানের আধার, আবার এদিকে ইসলামপন্থীরাও পুরনো ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের পিরামিডকে রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন স্তরযুক্ত সংস্কৃতির বিপদ সম্পর্কে এই উদ্বেগ মুসলিম বিশ্বে বহু শতাব্দী আগেই আসা উচিৎ ছিল, আশার কথা এত কিছু সত্ত্বেও সে আসছে।

ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ এক জিনিস আর প্রকৃত বৌদ্ধিক উন্নতি অর্জনের প্রক্রিয়া অন্য জিনিস। প্রতিবাদ, প্রতিবাদী জমায়েত, একনায়কের অপসারণ এর একটি অংশ, সেই সঙ্গে সুস্থ রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা, তার সাথে সফল অর্থনীতি, অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঁচ শতাব্দীর চিন্তা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মূল্য হারিয়ে গেছে গুটেনবার্গ থেকে জুকেরবার্গ যুগের মধ্যবর্তী সময়ে—যার প্রভাব থেকে ইসলামি বিশ্ব—জেনে বা না জেনে—নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখেছিল। আধুনিকতার পথে চলতে মুসলিম সমাজ আজ যন্ত্রণা বোধ করছে হারানো সময়ের ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে, এবং এলোমেলোভাবে এখানে ওখানে মাউস ক্লিক করাটাই যথেষ্ট নয়। তবু আবার বলি, মাউস ক্লিক করা ইতিমধ্যেই অনেক কিছু অর্জন করেছে যা কেউই কল্পনা করতে পারেনি।

অধ্যায় ৬

“ওসামা দীর্ঘজীবী হোক!” - ব্যর্থ রাষ্ট্র এবং সফল সন্ত্রাসবাদীরা

২০০১ সালে পৃথিবীর মুসলিমদের মাত্র কয়েকজন এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটাল, ইসলামের গৌরবময় জয়সূচক আক্রমণ, সবথেকে উদ্ধত পরাশক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে জয়। সেইসময় অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই আক্রমণের নিন্দা করল। বেশীরভাগই অনিশ্চয়তায় রইল, এই নিষ্ঠুর কাণ্ডের নিন্দা করবে না কি গর্বের চোখে দেখবে—এই ধরণের চিন্তার বৈপরীত্য ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ল, দাবি করা হল মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা কখনই এই কাজের জন্য দায়ী হতে পারে না; মোসাদ (Mossad-the intelligence deptt. of Israel) এবং/অথবা CIA এই প্লেন ছিনতাইয়ের ঘটনা পরিচালনা করেছে। একদিন পরে, সেপ্টেম্বর ১২, সিরিয়ার সংবাদপত্র আল থওরা (al-Thawra) দাবি করল, চার হাজার ইহুদী আক্রমণের দিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কাজে যায়নি। সেই সময় থেকে, আরব সংবাদ মাধ্যমে এই গুজব আজ পর্যন্ত চলছে। এই মিথ্যার উদ্দেশ্য ইজরায়েলকে অপরাধী করা; এটা এতই অসম্ভব ব্যাপার যে সহজেই এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এই মিথ্যা বেঁচে রইল।

এটা প্রকৃতই একটা অবাস্তব চিন্তা যে মোসাদ চার হাজার লোককে ফোন করে ভদ্রভাবে তাদের অনুরোধ করবে তারা যেন পরদিন বাড়ীতে থাকে, কারণ আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। এও অসম্ভব যে ঐ চার হাজার লোকের সবাই প্লেন ছিনতাইকারীদের সমর্থক, তাদের একজনের মনেও বিবেকের যন্ত্রণা হবে না বা লোভ হবে না এমন একটা ভয়াবহ সংবাদ নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর কাছে বিক্রি করার। চরম আশ্চর্য ব্যাপার, যারা ষড়যন্ত্রের তত্ত্বের কথা বললেন এবং মোসাদের নিন্দা করলেন, তারাই বললেন এই আক্রমণ আল্লাহর তরফ থেকে আমেরিকার প্রাপ্য শাস্তি—কারণ আল্লাহ এভাবেই আগ্রাসী আমেরিকাকে তাঁর ক্ষমতার ভয়াবহতা বোঝাতে চেয়েছেন। এমনকি এই অস্বীকারকারী দলের মনেও দ্বিধা ছিল যে এই আক্রমণ আল্লাহর কাজ অথবা ঘৃণিত ইহুদীদের কাজ।

২০০২ সালে আমেরিকার রাজনীতি-বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) সহ-লেখক হিসাবে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম “ওসামা দীর্ঘজীবী হোক”। এতে ফুকুয়ামা বর্ণনা করেছেন মুসলমানরা ওসামা বিন লাদেনকে সম্মানিত আদর্শের মর্যাদা দেয়, যদিও তিনি মুসলিম বিশ্বের একটি সমস্যারও সমাধান করতে ব্যর্থ। প্রকৃতপক্ষে, বিন লাদেন—একজন সৌদি ব্যবসায়ীর পুত্র—ইসলামি বিশ্বের জন্য নিজে কিছুই করেননি, শুধুমাত্র আমেরিকার দু’টি অট্টালিকা ধ্বংস করা ছাড়া। দারিদ্র বা অর্থনৈতিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, নিরক্ষরতা বা কর্মহীনতার জন্য লড়াই করা এসব কিছুই করেননি, এমনকি এ বিষয়ে মৌখিক কোন উৎসাহও দেননি। ফুকুয়ামা প্রশ্ন রেখেছেন, এমন একজন মানুষের মধ্যে বীরত্বের কি আছে? সত্যিটা হল, ইসলামি বিশ্বের বহু সমাজ দুর্জয় বাধা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং বরাবরের মতো নিজেদের অসংখ্য সমস্যার দিকে না তাকিয়ে অলীক শত্রুকে দোষারোপ করা সহজ মনে করেছে।

ফুকুয়ামা তার প্রবন্ধে সাবধান করে বলেছেন, মুসলিমরা শান্তভাবে চিন্তা করলে দেখবে বিন লাদেনকে প্রশংসা করার ফলে তাদের এমন মূল্য দিতে হবে যেমন জার্মানরা দিয়েছিল দ্ব্যর্থহীনভাবে হিটলারের গুণগান করে, যতদিন না তিনি তার নিজের দেশ ও অর্ধেক পৃথিবীকে জঞ্জালে পরিণত করেছিলেন। যখন তিক্ততার অনুভূতি এবং অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পায়, তখনই হিটলার এবং বিন লাদেনের মতো চরিত্রের (যারা সাধারণ জনগণের ইচ্ছা এবং সংস্কারকে অবলম্বন করে যুক্তিহীনভাবে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে) আবির্ভাব হয়, তারা সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে বাড়িয়ে দেয়, উসকে দেয় ভয় এবং ঘৃণার আগুন এবং সুবিধামতো এক বলির পাঁঠা হাজির করে। কোথাও ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব, কোথাও সার্বিকভাবে জনগণকে মোহগ্রস্ত করা—ফ্যাসিবাদের অলীক শত্রুর ভয় দেখানো—এ সবের মিলিত ফলে হঠাৎই মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর তারা তাদের মাতৃভূমিও হারায়, ঠিক যেমনটি ঘটেছে আফগান এবং সিরিয়ানদের বেলায় যখন তারা জিহাদিদের উৎসাহ জুগিয়েছিল।

নিজের দেশের বিভিন্ন সমস্যা বা নিজেদের তৈরী সমস্যার সমাধান করার চেষ্টার চেয়ে কল্পিত বহিঃশত্রু বা বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠীর ভয়কে তুলে ধরা অনেক সহজ। ঠিক তেমনি, পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে থাকা

দু'টো টাওয়ার ধ্বংসের জন্য উল্লসিত হওয়া অনেক সহজ, নিজের দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় যাদের মাথার উপরে একটু ছাদ নেই তাদের কথা ভেবে ক্রুদ্ধ হওয়ার চেয়ে। অনেক আরব দেশে তাদের ঘরোয়া সমস্যা এত গভীর যে সেখানে কেউ জানেই না কোথা থেকে শুরু করা যায়, এবং শত্রুর ভূত সর্বদা সর্বত্র হাজির স্কুলের ক্লাসরুমে, মসজিদে এবং সংবাদ মাধ্যমে যাদের মধ্যে অতি সামান্য মানুষই ঐ ভূতকে পেরিয়ে দেখতে পায়।

বিন লাদেন তিনটি বিষয়কে ব্যবহার করেছিলেন আল-কায়েদার কল্পকথাকে সৃষ্টি করতে: ইসলামি বিশ্বের আত্মার অসুখের দীর্ঘ ইতিহাস; ইসলামের বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ভিত্তিহীন দাবি; এবং বৈভবশালী পেট্রোডলার, যাকে উন্নতির নিদর্শন ভাবা হয় যা সর্বপ্রকারে উৎপাদনহীন। মহম্মদ আত্তা এবং তার আঠারোজন প্লেন ছিনতাই সহযোগী সেই প্রজন্মের মানুষ যারা বড় হয়েছে দেশের অত্যন্ত গোঁড়া পরিবেশে, দেশে এবং বিদেশে আধুনিকতার প্রলোভনের শিকার হওয়ার আগেই। (ইসলামের) নিষিদ্ধ ফল খাওযার ফলে তারা নিজেদের আবিষ্কার করেছিল পাপের ভারে ন্যুব্জ অবস্থায়। আমেরিকার প্রতি তাদের ঘৃণা এতটাই গভীর ছিল যে তাকে শিক্ষা দিতে তারা নিজেদেরকে উড়িয়ে দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল, এবং সেই সঙ্গে অগণিত নির্দোষ মানুষকে আক্ষরিক অর্থেই আকাশে উড়িয়ে দিল।

এই ধরণের কাজ ইসলামপন্থার আত্ম-ধ্বংসের কথাই প্রকাশ করে। কত সময়, অর্থ, পরিকল্পনা এবং দিবাস্বপ্ন ব্যয় হয়েছে ৯/১১ আক্রমণ ঘটাতে এবং এতে ইসলামি বিশ্বের কতটা লাভ হয়েছে? অথবা অন্যভাবে বললে: তাদের নিজের কতটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছে?

উনিশ জন যুবকের প্রত্যেকে পড়াশোনা করেছে পাশ্চাত্যে। একে নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ, চিন্তাকে বিস্তৃত করার উপায় বা সেইসাথে প্রতিদিনের জীবনকে উন্নত করার পথ ভাবার পরিবর্তে তারা মৌলবাদের আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করল। স্বাধীনতার অর্থ একবিন্দু না বুঝে তারা বেপরোয়া হয়ে সম্পৃক্ত হয়ে গেল ধর্মের সাথে, নিজেদের আড়াল করে ফেলল পরিবর্তনের পরিবেশ থেকে—অন্য কথায় আধুনিকতা থেকে। প্রাক্তন ধূমপায়ীরা যেমন প্রায়শই সারাজীবন ধূমপায়ীদের থেকে

তামাক বিষয়ে বেশী অসহিষ্ণু হয়, ঠিক তেমনি, “ধর্মান্তরিত” এবং “ধর্মে প্রত্যাবর্তি”-রা তাদের অন্যায় সম্বন্ধে অতিরিক্ত অসহিষ্ণু, তারা আশা করে যে সমাজে তারা জীবন কাটিয়েছে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের অতীত উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঢাকতে পারবে। তারা নিজেদের মধ্যে বা নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে যে ভুলভ্রান্তি রয়েছে সেসব শোধরানোর বদলে বরং নিজেদের ভুলভ্রান্তিকে খুঁজে পায় সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে যাদেরকে ওরা তীব্র অভিশাপ দেয়, কেননা তাঁরাই ওদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে!

সেপ্টেম্বর ১১ এর বিমান ছিনতাইকারী সন্ত্রাসীরা এক ভগ্ন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা অন্তরে দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে পাশ্চাত্য জীবনধারার আকর্ষণ, অন্যদিকে কড়া মধ্যযুগীয় তালাবদ্ধ জগতে বাস করা। এটি এমন এক প্রজন্ম যে ইসলামি বিশ্বকে দিয়েছে শিক্ষক, ইমাম, মতাদর্শ প্রবক্তা, অধ্যাপক; কেবল অল্প কয়েকজন বেড়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদী হয়ে। এরা কাজে যায়, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সাথে হাসি-তামাশা করে, পশ্চিমী সিনেমা দেখে, বার্সেলোনা বা আর্সেনাল ফুটবল দলের হয়ে চিৎকার করে—জীন্স পরে, গান শোনে—তবু তাদের অনেকেই মনে মনে লালন করে সতত পরিবর্তনশীল এক ভাইরাস যা যে কোন মুহূর্ত্তে ফেটে বেরিয়ে আসতে পারে: সেই ভাইরাসের নাম “জিহাদ”।

জঙ্গী ইসলামপন্থীরা সমস্ত ইসলামি দেশে তাদের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে। প্রতিটি ইসলামি দেশই তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে অথবা কমপক্ষে সন্ত্রাসবাদী সৃষ্টি করেছে যারা আক্রমণ চালিয়েছে অন্য দেশে। সন্ত্রাসবাদ শাসকের পতন ঘটাতে পারে না কিংবা তার বিলাসিতাও কমাতে পারে না, বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অজুহাত করে এটি শাসককে আরো বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ করে তোলে। আর এভাবেই জাতি হয়ে যায় আরো বেশি দারিদ্র্যপীড়িত এবং নিষ্পেষিত। সেটাই ঘটেছে ইউরোপে, আফ্রিকায় এবং এশিয়াতে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। তারা ধনী উপসাগরীয় দেশ বা দরিদ্র উত্তর আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া বা নাইজিরিয়া যেখান থেকেই আসুক অথবা যেখানেই আক্রমণ চালাক ফিলিপিন্সে, সোমালিয়ায়, জার্মানী, স্পেন, বা ইংল্যাণ্ডে—জিহাদ আজ

সর্বত্র এক সক্রিয় এবং আগ্রাসী মহামারী যা সর্বপ্রথম দুর্বল ও গরিবদেরকেই আক্রান্ত করে।

পৃথিবীজুড়ে সমস্ত মুসলিম মৌলবাদীরা সন্ত্রাস বিষয়ে একই মানসিকতা এবং ক্ষমতা দেখায়। ফলে—জিহাদের ভাইরাস যেহেতু তার ক্ষমতা লাভ করে ইসলামের শিক্ষা এবং ইতিহাস থেকে—তাই ইসলামিক জিহাদকে ইসলাম থেকে আলাদা করা একেবারেই অসম্ভব। আধুনিক ইসলামপন্থীরা নয়, মহম্মদ নিজে এই জিহাদের জনক, তিনি ইসলামের বিশ্বজনীনতা এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধকে নিশ্চিত করেছিলেন যা কোরআনের মূল উপজীব্য, এ শুধুমাত্র সাইয়্যেদ কুতুব বা আবুল আলা মওদুদীর কাজের ফলশ্রুতি নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক শিকড় এবং ধর্মীয় যাথার্থ্য উপলব্ধি করা সম্ভব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এর বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই করা অসম্ভব।

খ্রীষ্টানরা তিনশ বছর ধরে সংখ্যালঘু হিসাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, কিন্তু ইসলাম অনুসারীরা সেক্ষেত্রে একেবারে শুরুতেই রাজনৈতিক সাফল্য পেয়েছিল। নবীর ধর্ম জাতীয়-রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিল তার জীবৎকালেই, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই। মহম্মদ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং তার বৃদ্ধি ঘটাতে, মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পৃথিবী দখলের। আর আজ যুদ্ধের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী ইসলামিকরণের স্বপ্ন বহু মুসলিমের পবিত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, এমনকি তাদের নবীর মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরেও।

কিছু মুসলমান জিহাদের ভাইরাস সম্পর্কে বারবার বলতে চায়, ইসলামের শত্রুদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ হল "ক্ষুদ্রতর জিহাদ" এবং আল্লাহ্‌র সন্ধানে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ "বৃহত্তর জিহাদ"। এই তফাতের ব্যাখ্যায় কারও প্রতারিত হওয়া অনুচিত। ৯/১১ এর পরে, শায়খ ইউসুফ আল-কারজাভী ১৪০০ পৃষ্ঠার এক বিশাল প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম "জিহাদের ফিকাহ্" (Jurisprudence of Jihad)। সেখানে তিনি ব্যখ্যা করেছেন কখন জিহাদ প্রয়োজন, জিহাদ ঘোষণা করার অধিকার কার, এবং কি পরিস্থিতিতে জিহাদ করা যায়। বহু আরব চিন্তাবিদ দুঃখ প্রকাশ করে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, নিন্দা করেছিলেন এই আক্রমণের এবং ইসলামকে শান্তির

ধর্ম বলে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ইসলাম এই সমস্ত প্রকার হিংসার বিরোধী। এই ধরণের বহু প্রবন্ধ পরবর্তী এক দশকেরও বেশী সময় ধরে প্রকাশিত হয়েছে ইসলামিক স্টেটের(IS) উত্থান হওয়া পর্যন্ত—অতি সম্প্রতি জর্ডনের পাইলট মুয়াথ আল-কাসাসবেহ (Muath al-Kasasbeh) কে জীবন্ত আগুন পুড়িয়ে হত্যা করেছে IS—তারপর ২০১৫ এর প্রথম দিকে ঘটিয়েছে শার্লি এবদো (Charlie Hebdo) হত্যাকাণ্ড। ধর্মতত্ত্ববিদরা অতি কর্তব্যপরায়ণতার সাথে ইসলামের প্রকৃত চেহারাকে আড়াল করার নিমিত্তে ইসলামকে “শান্তির ধর্ম” বলে শুদ্ধ করে চলেছে।

এই ধর্মতত্ত্ববিদদের অনেকে স্বীকার করেন ইসলামি কিতাবগুলিকে সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভাবা হয় যে সেখানে হিংসাত্মক কাজকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত সাহস করে বলতে পারেনি যে, শরীয়া এবং জিহাদের ধারণা একুশ শতকে সম্পূর্ণ অচল। বর্তমানে কেউই প্রকাশ্যে স্বীকার করতে সাহস করবে না জিহাদের ভাইরাস কতদিনের পুরানো—সংক্ষেপে বললে এর বয়স ঠিক ইসলামের বয়সের সমান।

আজকের পৃথিবী যে সমস্যার সম্মুখীন তা জিহাদের ধারণার বিকৃতি নয়, জিহাদ নিজেই সেই সমস্যা; ইসলামের নবী এবং তার অনুবর্তীরা জিহাদকে যেমনভাবে ভেবেছিলেন এবং প্রয়োগ করেছিলেন। সমস্যা এই যে কোরআন পৃথিবীকে মুমিন (বিশ্বাসী) এবং কাফের (অবিশ্বাসী) এই দুই ভাগে ভাগ করে। সমস্যা এই যে নবী এবং কোরআন সম্পূর্ণভাবে অলঙ্ঘ্য। সেই সাথে তাদের দর্শনকে সর্বকালের জন্য নৈতিকতার আদর্শ বলে গৌরবান্বিত করার চিন্তা ভেঙে বেরিয়ে আসতে ইসলামিক পন্ডিতদের অক্ষমতা এবং সর্বকালের জন্য রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থায় নবীকে সর্বোত্তম আদর্শ মেনে তাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখা। সমস্যা হল জিহাদ নিজেই এক পরিসমাপ্তি, এ এমন এক যুদ্ধ যার সৈনিকরা তা চালিয়ে যেতে চায় কেয়ামৎ (End of days) পর্যন্ত। কারণ জিহাদই হচ্ছে সর্বোত্তম ফরজ (আবশ্যকীয়) যার মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী বান্দা তার প্রভুর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

অধ্যায় ৭

পর্ণোটোপিয়া—জিহাদ এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

সূরা ৯, আল্লাহ তাঁর পথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদের এক শক্তিশালী উদ্দীপক (Incentive) উপহার দিয়েছেন: “আল্লাহ মুমিনদের (বিশ্বাসী) নিকট থেকে তাদের প্রাণ এবং ধন-সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতএব তারা হয় হত্যা করে অথবা তাদের হত্যা করা হয়। এর (এই যুদ্ধের) দরুণ (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তোরাহ, গসপেল এবং কোরআনে। আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাকো তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা”।

কিন্তু এই জান্নাত (স্বর্গ) কেমন দেখতে? অন্যান্য বর্ণনা থেকে বিচার করলে মনে হয় এ যেন মরুবাসী পুরুষের জ্বরগ্রস্ত অবস্থায় স্বপ্নের থেকে হুবহু তুলে আনা হয়েছে: জান্নাতে থাকবে মনোরম উপভোগ্য আবহাওয়া (অত্যন্ত গরমও নয়, অত্যন্ত শীতলও নয়); আরামদায়ক বসার জায়গাসহ ছায়া সুনিবীড় উদ্যান; বিশুদ্ধ জলের নদী এবং শরাবের নদী যে শরাবে মত্ততা বা শিরঃপীড়া হবে না; থাকবে সুন্দরী কুমারীরা যাদের সুগোল উন্নত বক্ষ রেশমের কাপড়ে সামান্যই ঢাকা থাকবে; গেলমানরা দিয়ে যাবে অফুরন্ত ফল, পাখির মাংস, আর শরাব-ভরা পানপাত্র।

হুরী, ইসলামি জান্নাতের কুমারীরা, যাদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে “অতি সুন্দর মুক্তা”, যদিও দার্শনিক ক্রিষ্টোফ লুক্সেনবার্গ (Christoph Luxenberg) মনে করেন এটি ভুল অনুবাদ, কারণ হুরী শব্দটি এসেছে সিরো-আরামিক (Syro-Aramic) থেকে যার অর্থ “শ্বেত আঙুর”। কোরান ঠিক বলতে পারেনি এমন কত আঙুর এবং/অথবা মুক্তা জান্নাতে শহীদদের জন্য অপেক্ষা করবে, কিন্তু হাদিসে—নবীর বিস্তৃত বক্তব্যের কিতাব—তাদের বহু উল্লেখ আছে, প্রত্যেক শহীদের কষ্টের পুরস্কারস্বরূপ বাহাত্তর জন কুমারীকে দেওয়া হবে, তাদের প্রত্যেকের সেবা করার জন্য

থাকবে সত্তরজন পরিচারিকা: সর্বমোট ৫০৪০ জন নারী একজন শহীদের জন্য। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মৃত্যুবরণের অসাধারণ পুরস্কার।

এই হুর এবং যৌন আনন্দ যা নাকি একান্তভাবে মুসলিম শহীদদের জন্য নির্দিষ্ট তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুসলিম লেখকেরা তাদের কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন। কোন আরব লেখকের লেখা বইতে জান্নাতে যৌনসঙ্গমের যে বর্ণনা আছে, বর্তমানে সেন্সর ছাড়া সে বই কখনোই প্রকাশিত হতে পারত না, এবং তৎক্ষণাৎ একে পর্ণোগ্রাফি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। মধ্যযুগের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ আল-সুয়ুতি (al-Suyuti) বলেছেন, “যতবারই আমরা একজন হুরীর সাথে শুই, তার কুমারীত্ব আবার পরে ফিরে আসে। কোন মুসলিমের উত্থিত লিঙ্গ কখনই শিথিল হয় না, তার দৃঢ়তা চিরকাল অটুট থাকে, সেই সঙ্গমের সুখ অপার্থিব এবং অপরিমেয় মধুর…প্রত্যেক নির্বাচিত লোককে দেওয়া হবে সত্তরজন হুরী, সেইসঙ্গে তাদের পৃথিবীর স্ত্রীদের, তাদের যোনি হবে অসাধারণ সুন্দর এবং অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণীয়”।

লেখক এবং ইসলাম বিশেষজ্ঞ টমাস মৌল (Thomas Maul) আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন যে পাপমুক্ত মুসলমানদের কাহিনীতে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার কোন কথা নেই, আছে জান্নাতী বেশ্যালয়ে সীমাহীন যৌনতার কথা। জান্নাতের প্রধান আকর্ষণ হল পৃথিবীর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বর্জিত পুরুষের যৌনতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তুষ্টি—অবশ্যই নারীদের জন্য নয়, যারা জান্নাতেও যৌনবস্তু হয়েই থাকবে, রাত্রে সদাপ্রস্তুত সেবার জন্য; তারা একটি সুবিধা অবশ্য পাবে, তাদের ঋতুস্রাব হবে না, গর্ভাধান হবে না, সন্তানপ্রসবও করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে এ এক দু’দিকে ধারওয়ালা তরবারির মতো, যা আল্লাহ্‌ সৃষ্ট নিখুঁত পর্ণোটোপিয়া অনুযায়ী যৌনক্ষুধার্ত পুরুষের অবিরাম যৌনতাকে নিশ্চিত করে।

মহম্মদের প্রবাদপ্রতিম যৌনক্ষমতা

প্রকৃতপক্ষে সব ধরণের একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা নির্ধারণ করে দেওয়া: পুরুষেরা মাঠে কাজ করবে এবং জমি রক্ষা করবে; নারীরা পুরুষের প্রতি বিশ্বস্তভাবে নিবেদিত থাকবে এবং ঘরের সকল কাজকর্ম করবে, সন্তান ধারণ করবে, এবং সন্তানদের শিক্ষা দেবে

এমনভাবে যেন তারা রাজা ও দেশকে ভালবাসে। যৌনতার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রজননের মাধ্যমে মানবজাতিকে রক্ষা করা—যেমন জাতীয় সমাজবাদ অনুযায়ী—পিতৃভূমির জন্য এ এক প্রধান কর্তব্য।

যৌনতার সাথে ইসলামের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক। মধ্যযুগের ইসলামি বিশ্বের কথা ভাবলে মনে ভেসে ওঠে অর্ধনগ্ন হারেমের নারী, গেলমান, এবং পরিচারিকাদের যৌন উত্তেজক নাচের ছবি। বর্তমানের ইসলামি বিশ্বের ক্ষেত্রে তার পরিবর্তে ভেসে ওঠে বোরখা পরা নারীর ছবি, যে নারীরা বহির্জগতের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—যেমন যৌন হতাশ ছেলেরা হয়ে থাকে, যারা ধর্মীয় নৈতিকতার দাবি মেটাতে মনের সাথে যুদ্ধ করে। এমনকি প্রাচীনতম ইসলামি কিতাবও বৈপরীত্যে ভরা; পাঠককে সদর্পে স্থির করতে বলে তারা কি অতিযৌনতাবিশিষ্ট, অভিমানী ধর্ম চায় অথবা আত্ম-সংযমী, শরীর-রহিত ধর্ম। ঘটনা এই যে এইসব লেখাতে যৌনতাকে দেখা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের চোখ দিয়ে, সেই সাথে সীমাহীন ধর্মীয় দর্শনসহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে পুরুষেরা সর্বোচ্চ সুখ পেতে পারে। আর এভাবেই একজন মুসলিম যুবক হয়ে ওঠে যৌনক্ষুধাতুর- একবার সে ঘুরপাক খেতে থাকে তাঁর যৌন তাড়নার মধ্যে, আর অন্যবার সে ঘুরপাক খেতে থাকে তার ধর্মের বিধ্বংসী নৈতিক শিক্ষার মধ্যে।

নারী এবং যৌনতার সাথে ইসলামের স্পষ্ট সম্পর্কের শুরু নবীর থেকে, যার মায়ের মৃত্যু হয় যখন তিনি নিতান্তই শিশু। ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে নারীকে বিয়ে করেন তিনি ছিলেন তার চেয়ে বয়সে পনেরো বছরের বড়: খাদিজা, একজন ধনাঢ্য বিধবা নারী যিনি মহম্মদকে তার ব্যবসার অংশীদার করে নেন এবং তিনিই ছিলেন মহম্মদের সবচাইতে বড় পরামর্শদাতা। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে মহম্মদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মহম্মদের একমাত্র স্ত্রী ছিলেন। খাদিজার মৃত্যুর পর মহম্মদের যৌনতার বাঁধ ভেঙে যায়। এরপর তার দ্বিতীয় স্ত্রী, সাওদা বিন্ত যামআকে (Sawda bint Zam’a) বিয়ে করার অব্যবহিত পরেই তিনি বিয়ে করেন তার বিশিষ্ট বন্ধু আবু বকরের নয় বছর বয়সী কন্যা আয়েশাকে। (মহম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর হন প্রথম মুসলিম খলিফা বা শাসনকর্তা; ওমর, নবীর আর এক বন্ধু এবং মহম্মদের চতুর্থ স্ত্রী হাফসার পিতা, আবু বকরের পর দ্বিতীয় খলিফা হন)। খাদিজার মৃত্যুর পর মহম্মদ সর্বমোট এগারোজন নারীকে

বিয়ে করেন, বেশীর ভাগই তার পঞ্চান্ন বছর বয়সের পর—যে বয়সে তার যৌনক্ষমতা কমে এসেছিল। স্বভাবতই এইসব বিয়ে থেকে কোন সন্তানের জন্ম হয়নি।

ইসলামের প্রথম যুগের বক্তারা মহম্মদকে অতি-যৌনক্ষমতা সম্পন্ন নবী বলে বর্ণনা করেছেন। তারা দাবি করেছেন তার "তিরিশ জনের সমান যৌনশক্তি ছিল। মহম্মদের জীবনীকাররা প্রায় সকলেই অতিশয়োক্তি করেছেন এবং একে কাকতালীয় বলা যায় না।

ইসলামের সামরিক বিস্তৃতির সময়, তীব্র যৌনক্ষমতা সম্পন্ন প্রেমিকদের সংখ্যা যুদ্ধে সক্ষম মানুষদের থেকে আলাদা ছিল না। এজন্যই সে সময়কার লিখিত ইসলামী বর্ণনা সমূহের মধ্যে যুদ্ধ এবং যৌনক্ষমতাকে গর্বের বিষয় বলে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়, ইহুদী জনগোষ্ঠী বানু কুরাইজাকে পরাজিত করার পর মহম্মদ তাদের সমস্ত পুরুষের শিরঃচ্ছেদ করেন, নারী ও বালিকাদের বন্দী করেন। নবীর একজন সৈনিক তার কাছে একজন যৌনদাসী চাইল, সেই সৈনিকের চোখ ছিল সুন্দরী সাফিয়ার দিকে, মহম্মদের অন্য এক সঙ্গী মহম্মদকে বলে যে সাফিয়া ঐ গোষ্ঠীপ্রধানের কন্যা, মহম্মদ হুকুম দিলেন সাফিয়া তার। তিনি সেই দিনই সাফিয়াকে ধর্ষণ করেন অথচ ঐ দিনেই সাফিয়ার বাবা, স্বামী এবং ভাইদের শিরঃচ্ছেদ করা হয়। বলতে গেলে, এই ঘটনা হল যৌন জিহাদ। মহম্মদের কাছে নারীদের গর্ভাশয় দখল করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুরুষদের একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া। এই কাহিনীই যথেষ্ট প্রমাণ যে মুসলিম যুদ্ধনায়করা যৌনবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী এবং শত্রুদেরকে অপমান করতে অতি উৎসাহী। এটাই আক্ষরিক অর্থে ইসলাম প্রসারের প্রকৃত ছবি। গতকাল যে অমুসলিম নারীর গর্ভে 'ইসলামের দুশমন' পয়দা হয়েছে আজকে তাঁর গর্ভেই মুসলিম সন্তান পয়দা হবে। এই জাতীয় গল্প বা কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়, বীরত্ব প্রকাশ করে এবং ধর্ষণকে বৈধতা দেয়। মহম্মদের শত্রুদের দড়ি দিয়ে বেঁধে তার মর্যাদাবৃদ্ধি প্রমাণিত হত—সেক্ষেত্রে সাফিয়াকে বিয়ে করা এমন কিছু নিন্দনীয় নয়।

যুদ্ধে বন্দী নারীদের গণিমতের মাল হিসাবে ভোগ করা মহম্মদের নিজস্ব আবিস্কার। কিন্তু আধুনিক কালে এই কাজ দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধাপরাধ বলে

গণ্য। একমাত্র জঙ্গী ইসলামপন্থীরাই এটা করে থাকে। তারা নিজেদের মনে করে গৌরবময় ইসলামি ঐতিহ্যের অভিভাবক। সিরিয়া এবং ইরাকে যখন তারা খ্রীষ্টান এবং ইয়জিদি গ্রামে আক্রমণ চালায় অবিশ্বাসী নারীদের ধর্ষণ এবং কখনও বা গর্ভবতী করে পবিত্র যুদ্ধের নামে।

নারীদের বিষয়ে মহম্মদের বক্তব্য—খুব কম করে বললেও—বিপরীতধর্মী। এর অনেকটাই প্রকাশিত তার সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী আয়েশা এবং অন্যান্য স্ত্রীদের বিষয়ে তার উদ্বেগে, যে স্ত্রীরা একই বাড়ীতে বাস করত। এক সময়ে মহম্মদ তার অনুসারীদের বলেছিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে কুমারী বিয়ে করবে, তাদের জরায়ু অনেক বেশী ফলপ্রসূ, তাদের ঠোঁট মিষ্টতর এবং তাদের যৌনক্ষুধা তৃপ্ত করা অনেক সহজ। (তার সকল স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র আয়েশা বিয়ের সময়ে কুমারী ছিল)। আর এক জায়গায় মহম্মদ একই ভাবে বলেছেন, "বিশ্বাসীদের জন্য কোন যুদ্ধক্ষেত্রই শান্ত হয় না নারীদের বাদ দিয়ে—যদিও সেই একই মহম্মদ তার অনুসারীদের বলেছেন, "আমি তোমাদের সকলকে নির্দেশ দিচ্ছি: তোমাদের নারীদের সাথে দয়ালু আচরণ করবে"।

মহম্মদই প্রথম নারীদের উত্তরাধিকারের অধিকার দেন, আগে তা আসবাবপত্রের মতো পরিবারের পুরুষদের হাতেই যেত। সেইসঙ্গে গুরুত্ব দেন তাদের নিজস্ব সম্পত্তি ও ব্যবসার অধিকারে এবং বলেন আল্লাহর চোখে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। তবুও তার বহু মন্তব্য আছে যেখানে তিনি সরাসরি নারীদের ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক বলেছেন, একসময়ে এও বলেছেন, "আমি জাহান্নামের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই নারী"।

মহম্মদের যৌনক্ষমতার অতিশয়োক্তির মতো, নারীদের সম্বন্ধে তার কঠোর অবস্থান এবং তাদের থেকে বিপদের আশঙ্কার কারণ সম্ভবত ঈর্ষা ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ। একটি প্রচলিত কাহিনী: আয়েশার বয়স তখন উনিশের কম, তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ ওঠে। এক যুদ্ধ অভিযানে মহম্মদ আয়েষাকে সঙ্গে নিয়ে যান, তখন তিনি বৃদ্ধ। পথের মধ্যে হঠাৎই আয়েষাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরদিন সকালে তাকে অন্য এক লোকের সাথে দেখতে পাওয়া যায়। নবী বিজয়ী হয়ে মদিনায় পৌঁছানোর আগেই এই ঘটনার কথা শহরে সবাই বলাবলি করতে থাকে।

শোনা যায় মহম্মদ গভীর দুঃখে কয়েকদিন ধরে কেঁদেছিলেন। মহম্মদের ভাতিজা আলি পরামর্শ দিয়েছিলেন অবিশ্বাসী স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিতে, যা মহম্মদের অহমিকা এবং আয়েশার খ্যাতি দু'য়ের জন্যই খারাপ হত। তাহলে কি করা যায়? সৌভাগ্যক্রমে, তখনই 'উপর' থেকে সাহায্য এল: কোরআন বলে মহম্মদের কাছে ওহী আসে যে এটা মহম্মদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্যই অবিশ্বাসীরা এই গল্প তৈরী করেছে।

এসব সত্ত্বেও দুর্নাম রয়েই গেল, এবং যখন মহম্মদের স্ত্রীরা অভিযোগ করল যে মারিয়া কিবতিয়া (মহম্মদের দাসী) এক মিশরীয় ক্রীতদাসের সাথে সঙ্গম করে, মহম্মদ তৎক্ষণাৎ সেই দাসের শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। এই ভয়ঙ্কর দণ্ডাদেশ কার্যকর করার আগে ঘাতক (আবার সেই ভাতিজা আলি) আবিস্কার করে যে ঐ দাস খাসী। আর এজন্যই দাসটি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। এর পর থেকে মহম্মদ তার স্ত্রীদের উপর নজরদারি আরো জোরালো করলেন, তাদের পোষাক এবং সামাজিক মেলামেশার উপর আরো কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। নবীর অসাধারণ যৌনক্ষমতা কমে এসেছিল এবং তিনি স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে পারছিলেন না, এটাই কি কারণ?

মহম্মদ তার স্ত্রীদের পুরো বোরখায় মুড়ে ফেললেন, এবং বললেন তারা অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলতে পারবে একমাত্র পর্দার আড়াল থেকে। একদিন মহম্মদ বাড়ী ফিরে দেখলেন তার দু'জন স্ত্রী এক অন্ধ লোকের সাথে কথা বলছে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি জানতে চাইলেন তারা কেন তার আদেশ অমান্য করেছে। যখন একজন স্ত্রী বললেন, "এই মানুষটি অন্ধ", তখন ক্রুদ্ধ মহম্মদ বললেন, "কিন্তু তোমরা তো অন্ধ নও"।

এই ধরণের গল্পগুলিতে ইসলামের বর্তমান উত্তরসূরিরা রোমান্টিকতা আরোপ করে বলে, নবীর স্ত্রীরা হচ্ছে রক্ষিত মণিমুক্তার মতন এবং একইসাথে তাঁরা সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য আদর্শস্বরূপও। আর গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলিমরা "নবীর শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে" লিঙ্গ বৈষম্যকে জীবনের অঙ্গ বলে বৈধতা দেয়। কারো মধ্যে এই চিন্তার উদয় হয় না যে মোহাম্মদের এই শিক্ষার উৎস হচ্ছে তার স্ত্রীরা বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে বা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারে এই আশংকা! এই শঙ্কার উৎস খুঁজে পেতে পারি মোহাম্মদের সেই শৈশবে যেখানে তার মা তাকে লালন পালন করার

জন্য একজন অচেনা নারীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, এবং এরপর তিনি তাকে চিরকালের মতো ছেড়ে চলে গেলেন। আরেকটি কারণও আমরা খুঁজে পেতে পারি, আর তা হচ্ছে মোহাম্মদের দুজন স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া।

লিঙ্গ বৈষম্য এবং কুমারীত্বের প্রতি আকর্ষণ

ইসলামের যৌনচরিত্র এবং নারীদের অবিশ্বাস করার ব্যাপারটা ইহুদি ধর্ম থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আরো স্পষ্ট করে বললে, বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং ব্যভিচারের অপরাধে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান এসব কিছু ইহুদি ধর্মেরই নির্দেশনা। কিন্তু কুমারীত্বের প্রতি ধর্মীয় আকর্ষণ তীব্রতর হয় ইসলামের শাসনকালে, এবং নারীর প্রতি ইসলামের সেই দৃষ্টিভঙ্গী এই একুশ শতকেও একইভাবে রয়ে গেছে।

ঐতিহাসিকভাবেই, একজন নারীর একাধিক পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকলে সন্তানের পিতৃপরিচয় নির্ণয় অসম্ভব। সেকারণেই, পরিবারের রক্তের ধারাকে রক্ষা করতে ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত যৌনতাকে অপরাধ ঘোষণা করল—তবুও ইসলামে পিতা পরিবারের প্রধানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সন্তানের অন্তরে ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারাকে প্রবাহিত করার দায়িত্ব তার। (অপরপক্ষে, ইহুদীধর্মে সন্তানের ধর্ম স্থির করে তার মা)। ইসলামিক নারীরা ঘর থেকে বেরোনোর সময়ে তাদের জন্য হিজাব পরার যে বাধ্যবাধকতা এটি কেবলমাত্র সমাজ তাদেরকে অবিশ্বাস করে তারই চিহ্ন বহন করে না, বরং এর সাথে একথাও প্রকাশ করে যে, তাদের স্বামীরাও তাদেরকে অবিশ্বাস করে। আর এ বিষয়টিই স্পষ্ট করে বলেছেন শা'রাওয়ি: "যে নারী হিজাব ছাড়া চলাফেরা করে তাঁর স্বামীর উচিত সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা।"

লিঙ্গ বৈষম্য এবং কুমারীত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণের মূল কারণ রক্তের ধারাকে সংরক্ষণ করা নয়, বরং নারীর প্রতি ইসলামের প্রকৃত মানসিকতার পরিচয়। টমাস মৌল তার বই Sex, Djhad und Despotie (Sex, Jihad and despotism—যৌনতা, জিহাদ এবং নিষ্ঠুর ক্ষমতাপ্রয়োগ)-এ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরাণের শাস্তি সংক্রান্ত আইন

(Penal code) পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সেই দেশ নারীর কুমারীত্বকে তার জীবনের থেকে বেশী দামি মনে করে।

ইসলামে ‘দিয়্যাত’ (diyya) ব্যবস্থা চালু আছে, অর্থাৎ কাউকে ভয়ানকভাবে আহত করলে বা হত্যা করলে অপরাধী আহত বা নিহতের পরিবারকে রক্তমূল্য বাবদ কিছু টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারে। উত্তরাধিকারের সম্পদের মধ্যে নারীর অংশ যেমন পুরুষের অর্ধেক ঠিক একইভাবে এখানেও নারীর রক্তমূল্য পুরুষের অর্ধেক। অর্থাৎ কোন নারী নিহত হলে তার পরিবার পাবে একজন পুরুষ নিহত হলে যা পেত তার অর্ধেক। শারীরিক ক্ষতির ক্ষেত্রে রক্তমূল্যের পরিমাণ নির্ধারণের অঙ্কটি বেশ মজার: ইরাণের পিনাল কোডের ২৯৭ ধারায় বলা হয়েছে কাউকে হত্যার ক্ষতিপূরণ হল একশ’টি উট, তার অণ্ডকোষের মূল্যও একই। তবে বাম অণ্ডকোষের জন্য ৬৬.৬ টি উট এবং ডান অণ্ডকোষের জন্য ৩৩.৩ টি উট। এই তফাতের কারণ বর্ণিত আছে শরিয়া আইনে। শরিয়া তত্ত্ব অনুযায়ী, বাম অণ্ডকোষের দ্বারা পুত্রসন্তান জন্ম নেয় এবং ডান অন্ডোকোষের দ্বারা কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। একজন পুরুষের বাম অণ্ডকোষের দাম একজন নারীর জীবনের থেকে বেশি, নারী হত্যার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পঞ্চাশটি উটই যথেষ্ট। যদি কোন কুমারী মেয়ে ভয়ানকভাবে ধর্ষিতা হয়, ৪৪১ ধারা অনুযায়ী তার জীবনের থেকে তার সতীচ্ছদের জন্য প্রাপ্য ‘দিয়্যা’ অনেক বেশী। (বিয়ের সময়ে সে যে পরিমান মোহরানা দাবি করতে পারত তা কমে যাওয়ার কারণে এই অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ)। আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে দেনমোহরের যে চিন্তাটা ইসলাম ধারণ করে অর্থাৎ একজন নারী তার কাছ থেকে যে দেনমোহর পায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তা হচ্ছে হয় নারীর কুমারিত্বের মূল্যমান বা কুমারিত্ব খোয়ানোর প্রতিদান। আর এজন্যই আমরা দেখতে পাই, যে নারীর আগে বিয়ে হয়নি তাঁর দেনমোহর সেই নারীর তুলনায় অনেকটাই বেশি যার আগেও বিয়ে হয়েছিল, এবং বিয়ের বাজারে এই দু'জনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় বিকর বা ‘কুমারী’ এবং ছাইয়্যেব বা ‘অকুমারী’ হিসেবে।

ইরাণে কোন মেয়ে বিয়ের আগে তার পেমিকের সাথে রাত্রিযাপন করলে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয় (রজম)। অথচ যদি কোন নারী স্বল্পকালীন বিয়ে করে প্রতি সপ্তাহে নতুন পুরুষের সাথে থাকে, সে

ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-ভীরু শিয়া মুসলিম বলে পরিগণিত হবে ধর্মীয় বিবাহ আইন অনুযায়ী, যা খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুমোদিত। আবার কোন পুরুষ প্রতিদিন বিভিন্ন নারীর সাথে বিছানায় যেতে পারে ইসলামের সীমা অতিক্রম না করেই।

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে ভালবাসার কোন ভূমিকা নেই—অপরপক্ষে, এটি একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর একটি চুক্তিমাত্র, যেখানে উভয়ের জন্য রাষ্ট্র নির্ধারিত কিছু অধিকার ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকে। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ইসলামের প্রসার; তাই যে কোন সম্পর্ক যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে বাধা দেয় বা ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যায়, তার শাস্তি হয় অত্যন্ত কঠোর। হিজাববিহীন নারীর উপর অ্যাসিড আক্রমণ, যৌনাঙ্গ ছেদন, সম্মানের কারণে হত্যা, পাথর ছুঁড়ে হত্যার ঘটনা বিবাহের পাশাপাশি চলে কারণ নারীবিদ্বেষ ঐতিহাসিকভাবেই মুসলিম সমাজের অঙ্গ, এবং সেটা নারীর স্বাধীনতা এবং মানসিক আবেগকে উপেক্ষা করেই। অনেকটা ফ্যাসিবাদের নিজের ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো—জাতির শত্রুরা তাদের ঘুমিয়ে থাকাকালীন সময়ে আক্রমণ করবে—এমন ভয়কে মনে করা হয় অতি সঙ্গত।

বর্তমান ইসলামি বিশ্বে জীবনের বাস্তবতাকে মোকাবিলা করতে গেলে বহু দুঃখজনক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়, সেইসঙ্গে যৌনতা বিষয়ে নৈতিক দ্বিচারিতার সংখ্যাধিক্য। পৃথিবীতে মুসলিম এলাকায় যত সংখ্যায় সতীচ্ছদ পুনর্গঠনের অস্ত্রোপচার হয় অন্য কোথাও তা হয় না। এটা সর্বজনবিদিত সাধারণ ঘটনা, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোকই তা স্বীকার করে। যেসব দেশে যৌন অপবাদ বা কলঙ্ক অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে বিবেচিত—যেমন আফগানিস্তান, ইরাণ, মিশর—সেখানেই রাস্তাঘাটে মেয়েদের যৌন হেনস্থা অসহনীয় অবস্থায় চলে গেছে, অথচ ইসলামপন্থীরা সিরিয়ার যুদ্ধে ইয়াজিদি ও খ্রিস্টান নারীদের লোভ দেখিয়ে যুবকদের প্রলুব্ধ করে যৌন জিহাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ইসলামি বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত থেকে অল্পবয়সী মুসলিম মেয়েরা, বিশেষত উত্তর আফ্রিকা থেকে, সিরিয়ার যুদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় জিহাদীদের কাছে নিজেকে বিক্রী করে, আবার সুন্নী পণ্ডিতরা নবীর অনুমতি তুলে ধরে যৌন জিহাদের স্বর্গীয় সুসংবাদ প্রচার করে যে, নবী তার সৈন্যদের

অনুমতি দিয়েছিলেন শত্রু নারীদের সাথে “স্বল্প-কালীন বিবাহ” করার যাতে দীর্ঘ যুদ্ধযাত্রায় তাদের যৌনক্ষুধা প্রশমিত হয়। বৃহত্তর লক্ষ্য—জিহাদ—সফল করার জন্য ইসলামপন্থীরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার উপর নিষেধাজ্ঞাকে স্থগিত রাখে। এভাবে সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করা যায় উভয়দিক থেকে, একদিকে পার্থিব জীবনে নারীর প্রতিশ্রুতি অন্যদিকে জান্নাতে ধর্ষণ-পূর্ণ স্বপ্ন।

অধ্যায় ৮

ইসলামি বোমা এবং শিয়া ফ্যাসিবাদ

বেইরুটের কাফে, বার, এবং ক্লাবগুলিতে দু'টো রাত্রি এদিক ওদিক ঘুরেই আমি বুঝলাম পশ্চিমী জীবনধারা লেবাননকে জয় করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের স্বাধীনতার ধারণাও হয়তো ধরে ফেলবে, কিন্তু বাইরের চেহারাটা হবে প্রতারণাপূর্ণ বা বিভ্রান্তিকর। তৃতীয় দিন আমি ট্যাক্সিতে দক্ষিণে দাহিয়ে (Dahieh) জেলায় যাচ্ছিলাম, গাড়ী মিনিট দশেক চলার পরই দৃশ্যপট নাটকীয় ভাবে বদলে গেল। রাস্তায় যে নারীরা যাচ্ছিলেন তাদের অতি অল্প কয়েকজনের মাথা স্কার্ফে ঢাকা ছিল না, এবং রাস্তার দু'পাশের দেওয়ালে লেবানন-ইজরায়েল যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের মুখের ছবি লাগানো। নীচে লেখা, "আমরা কখনও তোমাদের ভুলব না"। এই পরিবর্তন দেখে আমার মনে হল, দক্ষিণ বেইরুট যেন রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র; নিশ্চয়ই এটি হেজবোল্লাহর রাষ্ট্র।

আমার ট্যাক্সি রাষ্ট্রসংঘের কিছু আশ্রয় শিবিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে লেবাননে জন্ম নেওয়া প্যালেস্টিনীয়দের বাস, তবু তারা উদ্বাস্তু হিসাবে পরিচিত এবং সেকারণে তাদের অধিকাংশই চাকরী থেকে বঞ্চিত। তারা উদ্বাস্তু হয়েই সেখানে থাকছে এবং আশা করছে, কোন এক সময়ে তারা প্যালেস্টাইনে ফিরে যেতে পারবে। ইউরোপ, কানাডা, এবং আমেরিকায় বিশাল সংখ্যক প্যালেস্টিনীয় বাস করে যারা ডাক্তার, আইনজীবি, এবং ব্যবসায়ী; তারা তাদের পছন্দের এসব নতুন দেশে নাগরিকত্ব ও সমানাধিকার পেয়েছে। এমনকি খোদ ইজরায়েলেও প্যালেস্টিনীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকরা নেসেট (Knesset-বিধানসভা) এর সদস্য হয়েছে। কিন্তু এই নেতিবাচক মানসিকতার লোকগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদকেই উত্তরাধিকার করে যায়, আর নেতিবাচক চিন্তাভাবনার পিছনে ছুটে হতাশ বোধ করে। একপর্যায়ে ব্যর্থতাই যেন হয়ে ওঠে ওদের জীবনের মূল লক্ষ্য। পশ্চিমা দেশগুলোতে প্যালেস্টিনীয়রা সাফল্য অর্জন করে এবং তারা সেসব উন্নত দেশের নাগরিকত্বও পেয়ে যায়, কিন্তু ওরা ওদের সন্তানদের মধ্যে ভঙ্গুর ভাবনা এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতা তৈরি করে দেয়। এই বাস্তুচ্যুতরা রাজনৈতিক বাস্তবতা দেখেছে, তাকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে অস্বস্তি না বাড়িয়ে তারা তাদের প্যালেস্টিনীয়

পরিচিতি বাঁচিয়ে রেখেছে, কারণ প্যালেস্টিনীয়দের প্রতি আরব দেশগুলির আচরণ অতি প্রকট। আরব সরকারগুলি সেখানকার উদ্বাস্তুদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, প্যালেস্টিনীয় উদ্বাস্তুদের শিশুদের সৌদি আরব, কুয়েত কিংবা লেবাননের নাগরিকত্ব দিতে তারা অনীহা প্রকাশ করে। কারণ হিসাবে অফিসাররা বলে থাকে যে নাগরিকত্ব দিলে ওদেরই অসুবিধা হবে কারণ তাদের প্যালেস্টাইনে ফেরার অধিকার থাকবে না।

লেবাননে যে কয়টি আন্দোলন ফ্যাসিবাদী রাজনীতির মূলভাবনাগুলি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হেজবোল্লাহ্। ওদের কালো রঙের আলখাল্লা শুধুমাত্র ওদের মিলিশিয়া পরিচয়টাকেই তুলে ধরে না, বরং 'দেশের মধ্যে দেশের' সশস্ত্র পুলিশ হিসেবেও ওদের পরিচয় তুলে ধরে। এখানে ফ্যাসিবাদের স্তম্ভ হচ্ছে সার্বক্ষণিক প্রতিরোধের চিন্তাভাবনা, এমনকি ইজরায়েলের দখলদারিত্ব থেকে দক্ষিণ লেবানন মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। হেজবোল্লাহ দলের মহাসচিব হাসান নাসরাল্লাহ্ এবং তার মতো যারা ফ্যাসিবাদী তারা কখনও যুদ্ধের সমাপ্তি চায় না। ক্ষমতায় চিরকাল টিকে থাকার জন্য যুদ্ধই যে সবচেয়ে বড় ভরসা!

মনে পড়ে আমি তখন বিশাল এক সাইনবোর্ডে লেখা একটি বাক্য পড়েছিলাম "সশস্ত্র প্রতিরোধই হচ্ছে জাতির গর্ব"। এ বাক্যটি লেখা ছিল আয়াতোল্লাহ খোমেইনি এবং হাসান নাসরাল্লাহ এ দুজনের দুটি বিশালাকার ছবির মাঝখানে। এ দুজনের প্রথমজন ইরানের শিয়া রাজত্বের প্রধান, আর দ্বিতীয়জন হেজবোল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল।

ইহুদিদের প্রতি মুসলিমদের ঐতিহাসিক বিদ্বেষ ও এর সাথে সাথে একজন নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং যুদ্ধ করে শহীদ হতে চাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এ সকল কিছুই ইসলামিক দলের অনুসারী ও ক্যাডারদেরকে দলনেতার বক্তব্য দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়ে একটি পতাকাতলে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইহুদী-বিরোধীতা লাগাতার ভাবে একই কথা বলতে থাকে, ঠিক যেমন ঘটে একক নায়কের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যে, যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত রাখতে এবং শক্তিশালী সম্ভাবনাসূচক শহীদত্বের ক্ষেত্রে—শেষেরটি অপরিমেয় প্রশংসার অধিকারী। এমন কি

আজও, হেজবোল্লাহর প্যারেডে নাৎসী অভিবাদন (salute) প্রথা চালু আছে।

হেজবোল্লাহ এবং হামাস

১৯৭৯ সালে ইরাণের ইসলামি বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে, মহম্মদ হুসেইন ফাদলাল্লাহর (Mohammad Hussein Fadlallah) মতো শিয়া ইসলাম প্রচারকরা লেবাননে নিয়ে এলেন বেলায়েত-এ ফাক্বিহ (Velayat-e faqih)—“জুরী অভিভাবকত্ব” (the guardianship of the jurist)। ইরানের রেভ্যুলুশনারী গার্ডের আদলে দক্ষিণ লেবাননে গঠিত হয় শিয়া মিলিশিয়া বাহিনী। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় যখন ইজরায়েল লেবানন আক্রমণ করেছিল। আয়াতোল্লাহ খোমেইনি ফতোয়া জারি করে হেজবোল্লাহকে অনুমতি দেন গৃহযুদ্ধে অংশ নিতে। ঠিক খোমেইনি যেমন ইরাকের সাথে যুদ্ধে আত্মঘাতী কম্যাণ্ডো দলকে প্রশিক্ষণ (training) দিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হেজবোল্লাহ প্রথম সফল মুসলিম আত্মঘাতী বোমা হামলা ঘটায় পশ্চিমী লক্ষ্যবস্তুর উপর। অক্টোবর ২৩, ১৯৮৩ হেজবোল্লাহ জঙ্গীরা দুই ট্রাক ভর্তি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক নিয়ে ঢুকে পড়ে বেইরুটে আমেরিকান সেনাঘাঁটিতে, যেটি আগের বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গৃহযুদ্ধের পর। বোমারু জঙ্গীরা ট্রাকের ভিতরে থাকা অবস্থাতেই ট্রাকে বিস্ফোরণ ঘটায়, নিহত হয় ৩০৫ জন—২৪১ জন মার্কিন সেনা, ৫৮ জন ফরাসী প্যারাট্রুপার এবং ছয়জন সাধারণ নাগরিক। এই আক্রমণ পৃথিবীজুড়ে ইসলামপন্থীদের অনুপ্রাণিত করে, শুধুমাত্র এই ধ্বংস কাজের জন্য নয়, বরং এর পরবর্তী পরিণামের কারণে, লেবানন থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা হয়ে উঠল ইরাণের মোল্লাদের বিশাল বিজয়—যাদের চোখে আমেরিকা মানবদেহধারী শয়তান। আর এভাবেই গোটা আরব বিশ্বে হেজবোল্লাহ খ্যাতি অর্জন করল “আমেরিকার বিরুদ্ধে জয়ের” জন্য।

মাত্র অল্প কয়েক বছর পর অধিকৃত প্যালেস্টাইনে আত্মপ্রকাশ করল হামাস, তারা হেজবোল্লাহর গঠনতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদী ভাবধারাই শুধু গ্রহণ করেনি, তাদের কৌশলও নকল করেছে। এরপর তামাম ইসলামি

বিশ্বে, আত্মহত্যা একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে গণ্য হল, ইসলামপন্থীরা প্রমাণ করল তাদের সহিংসতা এবং ঘৃণার ক্ষমতা। তারা আক্রমণ করল তেল আভিভ-এর বাসে, লণ্ডনের ভূগর্ভ রেলে, ল্যুক্সর(Luxor) এবং শার্ম আল-শেখ (Sharm el-Sheikh)-এ পর্যটকদের, বালি দ্বীপে বার, কেনিয়া এবং তানজানিয়াতে পশ্চিমী দূতাবাসে, টিউনিশিয়ার দ্বীপ জার্বাতে (Djerba) ইহুদী উপাসনালয়ে, নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে, এবং ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে পেন্টাগনে। আরও কয়েক হাজার আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে, মরোক্কোতে, এবং মিশরে যেখানে অতি স্বাভাবিকভাবে প্রথমেই নিহত হয়েছে মুসলিমরা।

হেজবোল্লাহর সংস্কৃতির উপর ইরাণের প্রভাব অতি গভীর, কারণ এই দলটি এই ইসলামি প্রজাতন্ত্রটির উপর নির্ভরশীল সামরিক এবং আর্থিক সহায়তার কারণে। হাসান নাসরাল্লাহ্ ছিলেন এর রাজনৈতিক অংশের নেতা, এবং আয়াতোল্লাহ্ আলি খোমেইনি হেজবোল্লাহর আধ্যাত্মিক নেতা। হেজবোল্লাহ্ আরবী শব্দ যার অর্থ “আল্লাহর দল”। ১৯৯২ সাল থেকে লেবাননের সংসদে বেশ কিছু আসনে হেজবোল্লাহ্ মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। আগে লেবানিজ পার্লামেন্টে খ্রীস্টানদের সংখ্যাধিক্য ছিল, কিন্তু এখন সেখানে মুসলিমরাই সংখ্যায় অধিক। শুধুমাত্র দেশের শিয়া দলগুলির কাছেই হেজবোল্লাহ্ অতি সম্মানীয় ছিল না বরং দ্রুজ সম্প্রদায়ের অনেকেই এবং খ্রীষ্টানদেরও অনেকেই হেজবোল্লাহকে সাহায্য করেছে সৌদি ‘সুন্নি’ ইসলামকে ঠেকাতে গিয়ে। আল-মানার উপগ্রহ চ্যানেলকে অনেক ধন্যবাদ, যারা এদের প্রচার পৌঁছে দিয়েছে সারা পৃথিবীর বসার ঘরেও, যা থেকে আমরা জানতে পারি, দেশের বাইরেও হেজবোল্লাহর সমর্থক সংখ্যা বিশাল। গত দশকে যখন লেবানন এবং ইজরায়েলের যুদ্ধ বাধে, প্রথম ২০০০ সালে এবং পরে ২০০৬ সালে, দলটির জনপ্রিয়তা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, এর স্বপক্ষীয় বক্তারা তাদের প্রচারে প্রমাণ করে ইজরায়েলী সেনা দক্ষিণে পিছু হঠেছে এবং তাদের বিশাল জয় হয়েছে। সেই সময় থেকে তারা নিজেদেরকে লেবাননের রক্ষক হিসাবে পরিচয় দেয়।

২০০৮ সালে এই সমর্থন কমে আসে যখন হেজবোল্লাহর কালো আলখাল্লা বাহিনী বেইরুটের কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হল এবং গোটা

শহর দখল করার হুমকি দিল। যোগাযোগ ভবন দখল করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর দলটি সংঘর্ষ তীব্রতর করল, যার ফলে যুদ্ধ-বিরোধী লেবানীজ ভোটাররা পরবর্তী নির্বাচনে হেজবোল্লাহকে শাস্তি দিল।

আমার লেবানন সফর শেষ হওয়ার আগে আমি হেজবোল্লাহর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করি, সঙ্গে আর একজন সাক্ষাৎকার দানকারীও ছিলেন—যাকে আমার আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হল—যিনি অল্প সময়ের নোটিশে কথা বলতে রাজী হয়েছিলেন, আর সেই ব্যক্তি হলেন শিয়া ধর্মতত্ত্ববিদ প্রয়াত হানি ফাহস (Hani Fahs)। কয়েক বছর ধরে আল মানারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একই কথা বহুবার শুনেছি, আমি নিশ্চিত ছিলাম হেজবোল্লাহর প্রতিনিধি ইসলাম, জিহাদ, এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধের বিষয়ে কি বলবে। কিন্তু প্রয়াত শিয়া ধর্মতত্ত্ববিদ হানি ফাহস—লেবাননের অতি সুপরিচিত এবং বিতর্কিত ধর্মীয় নেতা, ২০১৪ সালে তার মৃত্যুর আগে সাক্ষাৎকারে জোরালো এবং সন্তোষজনক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন; তার চিন্তা ছিল যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমনি সতেজ।

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের ঘটনার পূর্বে বেইরুটের একজন যুবক মোল্লা হিসাবে ফাহস ইয়াসের আরাফতের পরিচিত ছিলেন যখন আরাফত প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের মিশন নিয়ে বেইরুটে ছিলেন। (ফাহস আমাকে বলেছিলেন “আরাফত ছিলেন অত্যন্ত আত্মমোহিত (narcissist) ব্যক্তি। তিনি লাগাতার একটা ভুলকে শুধরাতে গিয়ে তার থেকেও আরও বড় ভুলে গিয়ে শেষ করছিলেন”।) আয়াতোল্লাহ খোমেইনিকে লেখা আরাফতের প্রথম চিঠির প্রুফ সংশোধন করেছিলেন ফাহস, চিঠির বাক্যগুলিকে শুদ্ধ করে নিজে খোমেইনিকে দিয়েছিলেন যখন তিনি ইরাণ থেকে নির্বাসিত হয়ে ইরাকের নজফ নগরীতে ছিলেন। পরে, ১৯৭৮ সালে ফাহসের সাথে খোমেইনির দেখা হয় প্যারিসে এবং ইসলামি বিপ্লবের পরে খোমেইনির সাথে তেহরানে ফিরে আসেন। তবুও ফাহস ইসলামের চে গুয়েভারা (Che Guevara) হয়ে উঠতে পারেননি। মোল্লাতান্ত্রিক শাসনে অনাগ্রহী হয়ে এবং বিপ্লবের অভিঘাতে অসংখ্য শিশুমৃত্যু এবং দেশের ক্ষতি দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কয়েক বছর পর তিনি ইরাণ ত্যাগ করেন।

আমাদের প্রথম সাক্ষাতে, ফাহ্স তার বসার ঘরে আরাম করে বসে ছিলেন, তার পিছনের দেওয়াল ঢাকা ছিল ফাহসের সাথে খোমেইনির ছবি, ইয়াসির আরাফত, এবং মধ্য প্রচ্যের অনেক রাজনীতিবিদের ছবিতে, তাদের মধ্যে একটি ছবি ছিল ইরাণের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদের, ছবিতে তিনি ভেনেজুয়েলার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী উগো শ্যাভেজের (Hugu Chavez) শোকসন্তপ্ত মাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। ফাহ্স লক্ষ্য করেছিলেন আমি অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি বললেন, “আহমেদিনেজাদ দেখিয়ে দিয়েছেন যে ইসলামি বিপ্লব ব্যর্থ, এবং ছবিটি প্রমাণ করে ইরাণে মোল্লাতান্ত্রিক শাসন একটা কৃত্রিম ভান। এখানে মোল্লারা মেয়েদের শাস্তি দেয় যাদের হিজাব ঠিক সোজা অবস্থায় নেই—অথচ রাষ্ট্রের প্রধান বাইরে গিয়ে নারীদের জড়িয়ে ধরেন যারা হিজাব পরে না”। তার ঠোঁট বেঁকে গেল। ফাহ্স আহমেদিনেজাদকে লক্ষ্য করে বললেন, “সত্যিই সুন্দর ছবি—কিন্তু ঐ নির্বোধটা তাকে শেষ করে দিয়েছে”।

এর অল্পদিন পর পুনরায় এই ধর্মতত্ত্ববিদের সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। সে সময়ে হেজবোল্লাহ্ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে আমাকে এই বাক্যগুলো বলেছিলেন; আমরা যেন বার্লিনের কোন কাফেতে বসে কথা বলছিলাম, দক্ষিণ বেইরুটে নয় যা হেজবোল্লাহ্র প্রাণকেন্দ্র: “তারা ফ্যাসিবাদের থেকেও বেশী ফ্যাসিবাদী। ওদের মতাদর্শ, ওদের গোটা গঠনই ফ্যাসিবাদী। সবকিছুই। খেয়াল করুন, হেজবোল্লাহ্ সিরিয়াতে কি করছে—সেটা নিশ্চিত ফ্যাসিবাদ, যা এখনও তার বয়ঃসন্ধির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। হেজবোল্লাহ (অনুসারীরা) আসাদের গুপ্তঘাতকে পরিণত হচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন দলের পক্ষে অত্যাচারী না হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ওরা আরও একটা পাপ করছে—তারা দু’জন প্রভুর সেবা করছে, একজন ইরাণে এবং অন্যজন সিরিয়ায়। এটি তারা করছে কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থে, মোটেই লেবাননের স্বার্থে না”।

আমি ফাহ্সকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি কি মনে করেন যে ইসলামি বিপ্লব ফ্যাসিবাদী ছিল। আবার তিনি অতি পরিস্কারভাবে বললেন, “প্রত্যেক বিপ্লবের প্রথম দিকে ফ্যাসিবাদী ছোঁয়া থাকে। সেটা প্রায় অপরিহার্য। কিন্তু যে বিপ্লব আল্লাহ্র বাক্য দ্বারা সুরক্ষিত এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্যই করা হচ্ছে এমনটি দাবি করা হয় সেটি তো

নিজেই ফ্যাসিবাদ। সেখানে হত্যাযজ্ঞ চলে আল্লাহর রাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সেখানে যারা নিহত হয় তাদের বলা হয় আল্লাহর দুশমন। প্রতিদিন সেখানে নরহত্যার যজ্ঞ হয়, যেন কোন ধর্মীয় ব্রত পালন করা হচ্ছে। এর শেষও হয় এভাবেই"।

মৃত্যুর আগে ফাহ্‌স বলেছিলেন, ইরাণ তার নিজের লোকদেরই পণবন্দী করে রেখেছে কঠিন সামাজিক নিয়মে গেঁথে; প্রথমত ইরাকের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত যুদ্ধের মাধ্যমে। তিনি মোল্লাতন্ত্রকে ফ্যাসিবাদী বলতে দ্বিধা করেননি। নিজে ধর্মীয় আইনের পণ্ডিত হয়ে, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তার ভাবনায় সুন্নী এবং শিয়া সমাজ উভয়েরই কঠিনভাবে ফ্যাসিবাদকে আঁকড়ে ধরা—সেইসঙ্গে পৃথিবীতে ঐশ্বরিক শাসনের ধারণা—ইসলামি বিশ্বকে পঙ্গু করে দিয়েছে, আধ্যাত্মিকভাবে করে দিয়েছে শূন্যগর্ভ।

রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে ফ্যাসিবাদ

ইরাণ প্রথম মুসলিম দেশ যে আধুনিক ইসলামি ফ্যাসিবাদকে তার রাষ্ট্রীয় নীতি হিসবে গ্রহণ করেছে। পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ফ্যাসিবাদী ইসলামপন্থী নীতিই ছিল ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরাণের মেরুদণ্ড। প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল শাসকশক্তির সমালোচকদের হত্যা, জনসাধারণের উপর সর্বক্ষণের নজরদারি, নারীর উপর অত্যাচার, এবং তীব্র ইহুদী বিদ্বেষ। একইসাথে ধর্মের সমালোচনা করাটা সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।

১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে মধ্য প্রাচ্য এবং অন্যত্রও রাজনীতি একটা ধাক্কা খেল। ইরাণ এবং ইরাকের মধ্যে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠার সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু হল আফগানিস্তানে, বিশ্ব রাজনীতির উপর যার প্রভাব আজও মারাত্মক। একইভাবে এই ঘটনা লেবাননে গৃহযুদ্ধের আগুন উসকে দিল, সে দেশের মৌলবাদীরা একইভাবে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইরাণের বিপ্লব পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে ইসলামপন্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল, এমনকি সুন্নিদেরও; সাধারণভাবে যাদের বিশ্বাস ভয়ঙ্করভাবে শিয়া বিশ্বাসের

বিরোধী। আধুনিক ইতিহাসে প্রথম শরীয়াতন্ত্র রাজনৈতিক বাস্তবতা হয়ে দেখা দিল।

শাহ্ মহম্মদ রেজা পহলভির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল বিভিন্ন কারণে, তার সমস্ত বিবরণ এই বইয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে অবশ্যই ধর্মের পাশাপাশি এবং ধর্মের বাইরে বহু সামাজিক কারণ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। অবশ্য এটা ঘটনা যে, বিপ্লবের চিরাচরিত অনুঘটকের কোনটাই সেখানে ছিল না। যেমন, চরম দারিদ্র, সেনার লজ্জাজনক পরাজয়, কোনটাই ইরাণে প্রযোজ্য ছিল না। ইসলামি বিপ্লব কৃষকদের আন্দোলনের চাইতে অনেকাংশেই ছিল ছাত্র অভ্যুত্থান। শাহের স্বৈরাচারে এবং তার সিক্রেট সার্ভিসের নিষ্ঠুরতম অত্যাচারে বামপন্থী এবং ইসলামপন্থী উভয়েই তীব্র ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে—১৯৭৭ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীর পক্ষে মুখ খুলতে বাধ্য হয়। অবশেষে আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার আমেরিকার মিত্র দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করায় শাহ্ কয়েক হাজার বন্দীকে মুক্তি দেন এবং গণআন্দোলনের অনুমতি দেন। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকাই এই বিপ্লবকে সম্ভব করেছিল, যদিও প্রত্যক্ষভাবে না।

ছাত্রেরা এবং ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থীদের একাংশই প্রথম ইরাণে প্রতিবাদ শুরু করে। ১৯৫৩ সালে রেজা পহলভি দেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার সময় থেকেই বামপন্থীদের সাথে রাজপরিবারের বিবাদ লেগেই ছিল। নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে শাহ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন CIA-পরিচালিত সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মোসাদ্দেঘ (Mohammad Mosaddegh-বামপন্থীদের কাছে জনপ্রিয়) পদচ্যুত হন। রেজা পহলভি ইরানের তৈলশিল্পকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনেন এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান কোম্পানীগুলিকে ফিরে আসার অনুমতি দেন।

শাহ্ রেজা সিংহাসনে ফেরার পর ইরাণে আধুনিকতার বিস্ফোরণ ঘটল, উপচে পড়া তেলের আয় এবং সুদূরপ্রসারী আর্থসামাজিক সংস্কার সাধিত হল, যার সামগ্রিকভাবে পরিচয় হল ‘শ্বেত বিপ্লব’। শুরু থেকেই, অসন্তোষের মৃদুধ্বনি শোনা যাচ্ছিল ইরাণের রক্ষণশীল শিয়া ধর্মগুরুদের

মধ্য থেকে—বিশেষত, একজন মোল্লার তরফ থেকে যার নাম রুহোল্লাহ মুসাভি খোমেইনি (Ruhollah Moosavi Khomeini)।

যখন এইসব ঘটনা ঘটছিল, তখন বামপন্থী গেরিলা আন্দোলন এবং একটি বিপ্লবী ইসলামপন্থী দল ফেদাইয়ান-এ ইসলাম (Fada’iyan-e Islam অর্থ ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারী)- উভয়ের উদ্ভব হয়, তারা আশা করে সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে। প্রত্যুত্তরে শাহ্ শুরু করলেন সহিংস আক্রমণ, শুরু হল দাঙ্গা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি; দেশ সর্বনাশের কিনারায় পৌঁছে গেল। এই সময় পাশ্চাত্য ইরাণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, শাহ্ আর একবার পালাতে বাধ্য হলেন। শুরু হল ইসলামি বিপ্লব।

পারস্যের ফুয়েরার (এবং আল্লাহর অন্যান্য ইঙ্গিত)

‘আয়াতোল্লাহ্’ (ayatollah) পদবীর অর্থ “বিস্ময়কর” বা “আল্লাহ্ নিয়োজিত”। নিজের নামে এটা যুক্ত করার আগে এই মোল্লা পরিচিত ছিলেন রুহোল্লাহ্ মুসাভি খোমেইনি নামে। ১৯৪৩ সালে তিনি নিজের নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি ইসলামি রাষ্ট্র সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত দর্শন ব্যাখ্যা করেন। কাশফ আল-আসরার (Kashf al-asrar) শীর্ষক এই ঘোষণাপত্রে, খোমেইনি লিখেছেন: “ইসলামি শাসন স্বর্গীয় ন্যায়বিচার, যার নিয়ম পরিবর্তনীয় নয়, প্রতিবাদযোগ্যও নয়”। তিন বছর পর তিনি ফেদাইয়ান-এ ইসলাম (Fada’iyan-e Islam—ইসলামের অনুগামী) নামে ধর্মতত্ত্বের যে ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরিকল্পনা করেছিলেন তারা ইরাণের সমাজকে ভবিষ্যতে শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত করবে, সেইসঙ্গে শহীদ হওয়ার জিহাদী আদর্শে সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে।

১৯৬৩ সালে এই মোল্লা—তখন তিনি আয়াতোল্লা খোমেইনি নামে পরিচিত—কোম (Qom) শহরে সুপরিচিত ধর্মীয় নেতা। বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুললেন শ্বেত বিপ্লবের দেশজোড়া সংস্কার এবং নারী অধিকার সুরক্ষার বিরুদ্ধে। খোমেইনি মনে করতেন এইসব সংস্কার স্পষ্টতই শরীয়া আইনের লঙ্ঘন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন

নাবালিকা মেয়েদের বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে—যা ইসলামি পরিবার আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অনধিকারচর্চা।

সংস্কারবাদীদের পরিকল্পনা ছিল মানবিক এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল, তাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল:

* সামন্ততান্ত্রিক প্রথা উচ্ছেদ এবং বড় জমি মালিকদের কৃষিজমি নিয়ে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া।

* বনভূমি এবং চারণভূমির জাতীয়করণ।

* জমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় শিল্পের বেসরকারীকরণ।

* শ্রমিক এবং শিল্প কর্মচারীদের লাভের ভাগ দেওয়া।

* প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নারীদের নির্বচনী অধিকারদান;

* নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষকদল গঠন; এবং

* মেয়েদের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ।

১৯৬৩ সালে এক গণভোটে ইরাণের মানুষ এই সংস্কারগুলিকে অনুমোদন দিল। কিন্তু এর দু’বছর পর প্রধানমন্ত্রী আসাদোল্লাহ আলম পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন বাহাই সম্প্রদায়ের মানুষ। মহম্মদ আল্লাহ প্রেরিত শেষ নবী, মুসলিমদের এই বিশ্বাস অস্বীকার করে বলেই মুসলিম ধর্মবিদরা বাহাইদের মুরতাদ বা ইসলামত্যাগী মনে করে। বর্তমান ইরাণে এরা সুরক্ষিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃত নয় (খ্রীষ্টান বা ইহুদীদের মতো নয়)। খোমেইনি নিজেই মনে করতেন সরকারের প্রধান হিসাবে আসাদোল্লাহ আলমের নিয়োগ জাতির মুসলিম পরিচয়ের পক্ষে বিপদস্বরূপ। মুসলিমরা কখনোই অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত হতে পারে না; এই ধারণা অনুযায়ী খোমেইনির চোখে বাহাই এবং অন্য ধর্মভ্রষ্টরা অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা নয়।

খোমেইনি মনে করতেন বেলায়েত-এ ফাক্বিহ (“the guardianship of the jurist-জুরীদের অভিভাবকত্ব) বা আলেমদের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যেই

রয়েছে ইসলামি বিশ্বের মুক্তি। কোম শহরে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি ইরাণবাসীকে আহ্বান জানান শাহের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। মোল্লা খোমেইনি শ্রোতাদের উদ্দেশে অনুরোধ করলেন "বিপ্লবের জন্য, জিহাদের জন্য এবং সংস্কারের জন্য জেগে ওঠ, কারণ আমরা অত্যাচারী আইনের অধীনে থাকতে চাই না! আমাদের অধিকার আছে আমাদের নিজের নবীকে এবং আমাদের ইমামদের অনুসরণ করার, কারণ শেষ বিচারের দিন (Day of Judgement) তারা আমাদের পক্ষে বলবে"। এই বক্তৃতার কারণে খোমেইনি গ্রেপ্তার হন এবং পরে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয় প্রথমে তুরস্কে, তারপর ইরাকে। সেখানে তিনি ১৯৭০ এ তার দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্তাহার রচনা করেন; হুকুমত-ই এসলামি (Hokumat-i Eslami-ইসলামের অধীনে রাষ্ট্র)। এখানে তিনি বেলায়েত-এ ফাক্বিহ সম্বন্ধে তার ধারণা প্রকাশ করেছেন, সেইসঙ্গে যে ধর্মতত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠার আশা করেন তার নিয়ম এবং ভিত্তিও।

গণতন্ত্রবিরোধী ও অমানবিক দৃঢ়বিশ্বাস সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, খোমেইনির বিপ্লবাত্মক উৎসাহ বহু শাহবিরোধী বামপন্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একে সহায়তা করল খোমেইনির পাশ্চাত্যবিরোধী মানসিকতা এবং ইরাণের তৈল উৎপাদনের পুনরায় জাতীয়করণের আহ্বান। তবুও একাধিকবার ইসলামি আইনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী বামপন্থীদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। খোমেইনি শরীয়া বিষয়ে হুকুমত-ই এসলামিতে লিখেছেন, "ইসলামি আইন লঙ্ঘন করা যায় বা, মাত্র একবারের জন্য কোন সময়ে বা স্থানে প্রয়োগ করা যায়; এই দাবি ইসলামের মূলনীতিকেই অস্বীকার করে। কারণ আশীর্বাদধন্য নবীর মতানুসারে, কেয়ামৎ পর্যন্ত এই আইন বাধ্যতামূলক। এই আইন প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের জন্য তিনি যে তেইশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন সে কি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য? আল্লাহ কি তাঁর আইন প্রণয়ন করেছিলেন মাত্র দু'শ বছর প্রয়োগ করার জন্য?" খোমেইনি প্রকাশ্যেই গণতান্ত্রিক পন্থা গ্রহণের নীতিকে ত্যাগ করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন 'পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক আইনের সার্বভৌমত্বের উপর, যার কাজ আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা'।

চার বছর আগে ১৯৬৬ সালে, যুবক মোল্লা আলি খামেইনি—যিনি ১৯৮৯ এ খোমেইনির মৃত্যুর পর ধর্মীয় রাষ্ট্র ইরাণের শাসনভার নেন—আরবী থেকে একটি বই অনুবাদ করেন "এই ধর্মের ভবিষ্যৎ"(The Future

of This Religion)। এর লেখক সাইদ কুতুব (Sayyid Qutb), মুসলিম ব্রাদারহুডের মূল হোতা। খোমেইনি নিজে এই বইয়ের বেশ কিছু ভাবনা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হল হাকিমিয়াহর ("the rule of God on Earth"—পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন) ধারণা। এই বই লেখার আগেই কুতুব নিজেই দাবি করেছিলেন ইসলামি বিপ্লবের, তার মুসলিম সমাজ থেকে সমস্ত অনৈসলামিক বিষয় নির্মূল করে নবী মহম্মদের গৌরবময় দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশায়। যদিও শিয়া মোল্লাদের সাথে সুন্নী মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শগত বিভেদ ছিল, কুতুবের বই ইরাণে ঝড় তুলেছিল, এবং খোমেইনি (তিনি স্বচ্ছন্দে আরবী বলতে পারতেন) আসল বইয়ের বিপ্লবাত্মক ভাবনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সরকার এবং কোরআনের আইন সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নী মতপার্থক্য অল্পই। শিয়াদের একটি ধর্মগুরু কমিটি থাকতে পারে, যা সুন্নীদের থাকে না। কিন্তু ইসলামি দেশের ফ্যাসিবাদী আদর্শ উভয় মতেই আছে, যার বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহই সকল আইনের প্রণেতা। তাঁর নিয়ম সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য, অপরিবর্তনীয়, এবং তা সমালোচনার উর্ধে। এর বিরোধিতা করে একমাত্র অবিশ্বাসীরা যাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

১৯৭৮ সালে শাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হল। যখন আয়াতোল্লা খোমেইনির একটি ফতোয়া পশ্চিমী সিনেমা নিষিদ্ধ করল, ইরান জুড়ে পঁচিশটা সিনেমা হল ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল, আবাদান শহরে চারশোরও বেশী সিনেমাদর্শক একটিমাত্র আক্রমণে নিহত হল। প্যারিসে নির্বাসিত অবস্থায় খোমেইনি বামপন্থী এবং মধ্যবিত্তদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, প্রতিবাদ তীব্রতর করলেন জানুয়ারী ১৯৭৯ পর্যন্ত, ইরাণের শাহ পালিয়ে গেলেন। একজন ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থী মেহদি বাজারগানকে (Mehdi Bazargan) সাময়িক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হল সেনাবাহিনী এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে।

১ ফেব্রুয়ারী, খোমেইনি ইরাণে ফিরে এলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন "ইরাণে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার"। এপ্রিল মাসে গণভোট হল, তিনি আহ্বান জানালেন ইরাণকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বানানোর। অধিকাংশ ইরাণের মানুষ—বামপন্থী এবং বুর্জোয়া একইসাথে—সম্ভবত এদের কেউই হুকুমত-ই এসলামি পড়েননি—তারা খোমেইনির সপক্ষেই ভোট দিলেন।

গণভোটের পর খোমেইনি একাই স্থির করলেন ইরাণের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রূপরেখা। হত্যা করলেন উদারপন্থী এবং বামপন্থীদের। ধর্মীয় পথ অনুসরণ না করার জন্য শাহকে উৎখাৎ করতে যাদের ভূমিকা ইসলামপন্থীদের থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। বিপ্লবের পর প্রথম দু'বছরের মধ্যেই বারো হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, লক্ষ লক্ষ ইরাণী নির্বাসিত হয়, তাদের অধিকাংশই ছিলেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষিত মানুষরা। পঁয়ত্রিশ বছরের সময়কালে নিহতের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ।

সেনা এবং গোপন পুলিশের পাশাপাশি, ভয় দেখিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নাৎসী ব্রাউনশার্টদের মডেলে মিলিশিয়া এবং SS গঠিত হল। ইরাণের বিপ্লবী রক্ষী, সিপাহ্-এ পাসদারান-এ (Sepah-e Pasdaran-e) নামে পরিচিত; প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। তারপর আসে বাসিজ মিলিশিয়া (Basij Militia), তারা শাসক-বিরোধীদের রাস্তাতেই বিচার করে নির্মম শাস্তি দিত, অনেকটা হিটলারের গুণ্ডাবাহিনীর মতো। উভয় দলকেই তুলনা করা যেতে পারে Waffen-SS এর সাথে, অন্তত গঠন এবং কাজের বিচারে। ইরাণ-ইরাক যুদ্ধের সময়ে এরা দ্বিতীয় সারির সেনা হিসাবে যুদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বেহরুজ খোসরোজাদেহ (Behrouz Khosrozadeh) ২০০৯ সালে heise.de-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তা বিবৃত করেছেন।

খোসরোজাদেহ বলেছেন, সেই সময়ে বিপ্লবী রক্ষীরা গর্ব করত যে তাদের সংখ্যা ১,৩০,০০০, যাদের জন্য বরাদ্দ খরচ ইরাণের প্রকৃত সেনাবাহিনীর বরাদ্দের থেকেও বেশী। এর সদস্যদের এখন নিয়োগ করা হয় ঠিক SS-দের পদ্ধতিতে, অত্যন্ত সাবধানে যাচাই করা হয় তাদের আদর্শগত শুদ্ধতা এবং সাধারণ সৈনিকদের থেকেও অনেক ভালোভাবে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়। এই দলের নিজস্ব জেলখানা আছে, সেখানে বন্দীদের বিনা বিচারে অত্যাচার করা হয় এবং আটকে রাখা হয়। (সাধারণ মানুষের উপর এই অত্যাচার বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী এবং বাসিজ মিলিশিয়া উভয়েই করে থাকে। ২০০৯ সালে সবুজ আন্দোলনের (Green Movement) সময় এই ঘটনা বাইরে আসে, কয়েক হাজার ইরাণী অপহৃত হয়, অত্যাচারিত এবং ধর্ষিত হয় আহমেদিনেজাদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানোর কারণে)।

ইরাণের ইহুদী-বিরোধীতা নাৎসীবাদের সাথে তুলনীয় আর একটি বিষয় এজন্য যে ইরানের ইহুদী-বিদ্বেষ ও তার বক্তব্য, শত্রুতার ধরণ ইত্যাদি সবকিছু নাৎসীদের সাথে ইহুদীদের সম্পর্কের সাথেই মিলে যায়। ২৫০০ বছর ধরে ইহুদীদের দেশ পারস্য। ইরাণের সাথে ইজরায়েলের সাধারণ সীমান্ত নেই, যুদ্ধেরও কোন ইতিহাস নেই। আরব বিশ্বের অন্য অংশের মতো দেশটি কখনও পাশ্চাত্যের উপনিবেশ ছিল না বা কোন দেশের সাথে যুদ্ধে পরাজিতও হয়নি। তিনটি কারণে ইরাণে ইহুদী-বিরোধীতা বেঁচে আছে—প্রথম, দেশটির সাথে জার্মানীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আত্মীয়তা। ইরাণের শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শতকরা আশিভাগ জার্মানীতে তৈরী, জার্মান টেকনোলজির সাথে দেশটি নাৎসী আদর্শও আমদানী করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমগ্র ইরাণে ফার্সি ভাষায় তা প্রচার করাও হত।

বার্লিনের একটি এলাকা জিসেনে(Zeesen) নাৎসীরা সমগ্র আরব অঞ্চলে অপপ্রচার চালানোর জন্য নিজস্ব রেডিও স্টেশন স্থাপন করে ফার্সি, আরবী, তুর্কী এবং হিন্দি ভাষায়। Tribune পত্রিকার একটি প্রবন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাথিয়াস কুন্তজেল (Matthias Kuntzel) বলেছেন, ষ্টেশনটি এত জনপ্রিয় ছিল যে তেহরানের প্রতিটি বসার ঘরে তা বাজত। জার্মানীর ইরাণকে প্রয়োজন ছিল, কারণ এর প্রাকৃতিক সম্পদ।

ইরাণীরা নিজেদের আরব ভাবার পরিবর্তে “ইন্দো-জার্মান আর্য” ভেবে দাবি করত তারা সেমেটিক গোত্রের নয়, ফলে নাৎসী নিয়মাবলী পালন করে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী করা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কেবল মোল্লারাই নয় বরং অধিকাংশ ইরাণীই জার্মানীকে সমর্থন করে।

ইরাণে ইহুদী-বিরোধী মানসিকতা বোঝার আর এক উৎস সাইদ কুতুবের লেখা। ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তারা মনে করে সকল মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য এবং রোজ হাশরের দিন পর্যন্ত তা বাধ্যতামূলক। এই মানসিকতার তৃতীয় এবং প্রধানতম কারণ, কোরআন নিজে, ইসলামের মূল কিতাব যেখানে নানাভাবে ইহুদীদের বর্ণনা করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক এবং বানরের বংশধর বলে।

ইসলামি বিপ্লবের প্রথম বছরেই আয়াতোল্লা খোমেইনি বার্ষিক উৎসব কুদস দিবস (Quds Day) ঘোষণা করেন, যেটি প্যালেস্টাইনের সাথে ঐক্যের প্রদর্শনী। ১৯৮০-তে দ্বিতীয় কুদস দিবসে তিনি বলেন, "সকল পাপের উৎস ইজরায়েল চিরকালই আমেরিকার ঘাঁটি। ইজরায়েলী বিপদ সম্পর্কে আমি গত কুড়ি বছর ধরে সাবধান করে আসছি। আমাদের এখনই চেষ্টা করতে হবে ইজরায়েল রাষ্ট্রকে টুকরো টুকরো করতে এবং প্যালেস্টিনীয় মানুষদের ঘর ফিরিয়ে দিতে হবে"। অন্য আয়াতোল্লারা এবং পরবর্তী ইরাণী রাষ্ট্রপ্রধানরা আরও স্পষ্টভাবে ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে নিকৃষ্টতম আহমেদিনেজাদ, যিনি একজন হলোকাষ্ট অস্বীকারকারী। ইজরায়েলকে তিনি বলেছেন "ক্যান্সারযুক্ত ঘা" যাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে হবে। ইরাণের ভাবী প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি (Hassan Rouhani) আবার অন্য সুরে বলেছেন, হলোকাষ্ট মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ যা ইহুদীদের এবং বাকী পৃথিবীর অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছে।

তাক্বিয়া এবং মিথ্যা বলার ধর্মীয় শিল্প

শিয়া মতে, আরবী শব্দ তাক্বিয়া বলতে বোঝায়, গভীর বিপদের মুহূর্তে নিজের বিশ্বাস গোপন করা। এর ব্যবহার হয়ে আসছে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে যখন মুসলমানরা মক্কার সমাজে ক্ষমতাহীন সংখ্যালঘুমাত্র ছিল। বিশ্বাসীদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উপেক্ষা করতে, ধর্মবিশ্বাস গোপন করতে অথবা সরাসরি অস্বীকার করতে যাতে অ-মুসলিমদের থেকে লাঞ্ছনা এড়ানো যায়। কোরানের সূরা আলে ইমরান-এ বলা হয়েছে, "বিশ্বাসীরা যেন বিশ্বাসী ব্যতীত অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। তোমাদের মধ্যে যে একাজ করে আল্লাহ তার সহায় হন না, একমাত্র বিচক্ষণতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে সাবধানতার প্রয়োজন ব্যতীত"। অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব অনুমোদিত একমাত্র জীবনরক্ষার প্রয়োজনে। 'তাক্বিয়া' (taqiyyah) শব্দটি এসেছে দু'টি শব্দের মিশ্রণে-'তুকাত' (tuqat-গোপন করা-concealment) এবং 'তাত্তাকু' (tattaqu-সাবধানতা-precaution)।

ইসলামের প্রথম দিকের যুদ্ধ অভিযানগুলি ছিল অত্যন্ত সফল, অধিকৃত অঞ্চলে তাদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও অতি দ্রুত মুসলমানরা শাসক হয়ে বসত। তাদের জন্য তখন ধর্মবিশ্বাস গোপন করার কোন প্রয়োজন হত না। মহম্মদের মৃত্যুর পর শিয়া গোষ্ঠী ভেঙে বেরিয়ে গেলে তাদের কাছে অত্যাচারের ভয় থেকে আত্মরক্ষা করতে 'তাক্বিয়া' একটি বাস্তব উপায় হয়ে উঠল। শিয়াদের অনুমতি দেওয়া হল জীবন রক্ষার্থে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস গোপন করতে পারবে, পরিবারসহ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে ভুল বোঝাতে পারবে, মিথ্যা বলতে পারবে অথবা সম্ভাব্য শক্তিশালী অত্যাচারীকে প্রতারণা করতে পারবে।

আয়াতোল্লা খোমেইনি এই নীতিকে আর একটু বর্ধিত করলেন। তার অনুগামীদের অনুমতি দিলেন নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে যাতে শাহের শাসন ব্যবস্থার অন্দরে অনুপ্রবেশ করা যায়। (খোমেইনি লিখেছেন, "যদি তাক্বিয়ার ফলে এমন পরিস্থিতি হয় যে আমাদের কাউকে শাসকের অনুগামী দলভুক্ত হতে হবে তাহলে তার কর্তব্য হবে তা থেকে বিরত থাকা, যদি না তার যোগদানের ফলে ইসলামের প্রভূত উপকার হয়")। এমনকি বিপ্লবের প্রথম ধাপে খোমেইনি তাক্বিয়ার সাহায্যে তার অভিসন্ধি গোপন করেছিলেন, যতদিন না তিনি একক ক্ষমতার অধিকারী হন তিনি বামপন্থী ও মধ্যবিত্তদের ভুল বুঝিয়েছিলেন। তাদের কেউ যদি হুকুমত-ই এসলামি থেকে তার বক্তব্য পড়ত, যেখানে খোমেইনির দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে লিখিত, তারা অবশ্যই প্রতারণার গন্ধ পেত। বর্তমানের ইরাণী নেতারা নিয়মিতভাবে তাক্বিয়ার আশ্রয় নেয় তাদের আণবিক প্রকল্প বিষয়ে। তারা বারবার মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে তাদের বিশুদ্ধ শান্তিপূর্ণ মানসিকতার কথা।

একইসাথে এটাও লক্ষ্যণীয় যে ইসলামের সমালোচকরা তাক্বিয়া বিষয়টিকে এমনভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জ্বালা ধরানো চেহারায় প্রকাশ করে যেন সমস্ত মুসলিম মতাদর্শ নির্বিশেষে মিথ্যাবাদী, যারা তাদের প্রকৃত মনোভাব ঢেকে রাখে যতদিন না ইউরোপ বিজয় শেষ হয়। সমস্ত মুসলমানকে একই রকম ভাবা অযৌক্তিক এবং যারা সেটা করতে চায় তারা বিকৃতমস্তিস্ক। ১.৫ বিলিয়ন মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীই এক, এমন ভাবনা হুবহু একই রকম যেমন একজন ইসলামপন্থী দৃঢ়ভাবে মনে করে

সমস্ত পশ্চিমীর মানসিকতাই একরকম এবং পশ্চিমী সংস্কৃতিকেই সে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে চায়।

তাক্বিয়া বিষয়ে জানতে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি হানি ফাহ্‌স, যিনি একজন শিয়া। একবার আমদের দেখা হলে তিনি একটি পুরনো জোক বলেছিলেন যা থেকে বিষয়টির একটা ধারণা পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে শিয়া-সুন্নী বিভেদেরও পরিচয় মেলে: একদিন এক শিয়া মোল্লা এবং এক ধার্মিক আরব একজন আকর্ষণীয় মহিলাকে দেখে দু’জনেই তার দিকে লুকিয়ে চোখ টিপল তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। যখন সেই মহিলা লক্ষ্য করল আরব লোকটি তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্ট করছে, অমনি সে তার চোখ রগড়াতে শুরু করল যেন চোখ থেকে কোন বালিকণা বের করার চেষ্টা করছে। তারপর মহিলা যখন শিয়া মোল্লাকেও চোখ টিপতে দেখল তখন মোল্লাটি এমনভাবে চোখ বন্ধ করে ফেলল যেন সে বিগত দশ বছরেও চোখ মেলে কাউকে দেখেনি! এবং রাগত স্বরে বলল, সে জীবনে কখনও কারো উদ্দেশে চোখ টেপেনি!

ইরাণের সংস্কারবাদীরা: নতুন শুরু না কি মুখরক্ষা?

একবার আমি ফাহ্‌সকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ইরাণের শাসনব্যবস্থা সংস্কার করা যায় কিনা। কোন আশার কথা না বলে সে ফিরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “ওখানে সংস্কার করার মতো কি আছে? মোল্লাদের কাছে তাদের আল্লাহ্ আছে—তাই ওরা কখনই মানবে না যে তারা ভুল পথে আছে; বিশেষত যখন তারা এটাও মানতে পারে না যে রাজনীতি এবং আইন সম্পর্কে খোমেইনির মত বর্তমানে ঠিক নয়—এমন কিছুকে তুমি সংস্কার করতে পারো না। আমরা ওদের সমূলে উচ্ছেদ করতে পারি!”

প্রেসিডেন্ট রুহানির (Rouhani) মৈত্রীমূলক রাজনীতির এত উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা সত্ত্বেও তিনি শিয়া সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য চরিত্র—অন্তত আহমেদিনেজাদের থেকে দয়ালু এবং বন্ধুত্বপূর্ণ—এমন কি যদি কেন্দ্রীয় চরিত্র নাও হন। তার অমায়িক সমরুচিসম্পন্ন চরিত্র আমার কাছে বিপজ্জনকভাবে উল্টো ফলদায়ী মনে হয়। এমন একটা ভাব দেখায় যে পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু পর্দার আড়ালে বিষয়টা প্রায় একই থেকে যায়। হয়ত এখন থেকে এক বা দুই বছর পরে কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল

হলে সেই পরিপ্রেক্ষিতে মোল্লারা তাদের আণবিক উচ্চাশা একটু কমাবে, ইরাণের অর্থনীতি একটু উন্নত হবে এবং তার ফলে জনগণ অনেকটা শান্ত হবে; কিন্তু এদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য কখনও বদলাবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমাণ করেছে সে আভ্যন্তরীন দিক থেকে সংস্কারযোগ্য নয়: মিখাইল গর্বাচভ তার মতো করে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গোটা শাসন ব্যবস্থাটাই ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। কিছু কিছু বিষয়ে, পোপ ফ্রান্সিস একইভাবে চার্চের শিক্ষাকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন—মানতেই হবে কিছুটা সাফল্যও পেয়েছেন—কিন্তু তিনি কখনই ক্যাথলিক চার্চের বিশেষ কোন অর্থপূর্ণ সংস্কার করতে সক্ষম হননি; কারণ প্রতিটি সংস্কারই আর একটি সংস্কারকে টেনে এনেছে। এই প্রক্রিয়ায় কোথাও না কোথাও প্রশ্ন জেগেছে যে এই একবিংশ শতকে কারও কি আদৌ চার্চের প্রয়োজন আছে এবং কোন সংস্কারকই সৎভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহস পায় না।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র তার জন্ম থেকেই মধ্য প্রাচ্যে কাঁটাঝোপের মতো সমস্যা হয়ে আছে, ইরাকের সাথে উপসাগরীয় যুদ্ধ আভ্যন্তরীন সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে লেবানন, আফগানিস্তান, বাহরাইন, এবং ইয়েমেনে; এবং আরব বসন্তের পরে দুই আঞ্চলিক শক্তি একে নামিয়ে এনেছে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থায়। কাকতালীয়ভাবে নয়, আজ ইসলামিক স্টেট (IS) সেই দুই দেশে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে—ইরাকে এবং সিরিয়ায়—যেখানে ইরাণের রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। শিয়া মোল্লাতন্ত্রের প্রতি সুন্নীদের বিলম্বিত জবাব হিসেবেই ইসলামিক স্টেট (IS) সেখানে খুঁটি গেড়ে বসেছে। ইরাণের প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরব দুই দেশেই হস্তক্ষেপ করছে তাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে শেষ করে দিতে এবং তা করতে চাইছে অতি দ্রুত। বিশেষত যখন ইরাণের সিরিয় মিত্র বাশার আল-আসাদ হেজবোল্লাহর সাহায্য নিচ্ছে তার নিজের দেশেরই সুন্নী বিদ্রোহীদের (যারা শুরুতে সৌদি মদতপুষ্ট ছিল) বিরুদ্ধে। প্রথমদিকে ইসলামি জঙ্গীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে একপর্যায়ে সৌদি আরব তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, যেমনটি ঘটেছিল আল-কায়েদা এবং সাদ্দাম হুসেইনের ক্ষেত্রে। এই দু'জনকেই (সাদ্দাম হোসেন ও আল কায়েদা) সৌদি আরব সাহায্য করেছিল ইরাণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, কিন্তু একপর্যায়ে ওরা সৌদির বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়ায়।

ইসলামিক স্টেট হয়ে উঠেছিল এক ভূ-রাজনৈতিক আবর্ত, সাথে ছিল ইরাণের অক্ষম নতুন প্রেসিডেন্ট এবং সৌদি রাজার অসুস্থ শরীর; আর তার সাথে তদীয় পুত্র ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের কর্তৃত্ববাদ ও সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যাকান্ড। যার ফলে সমাধানের পুরো বিষয়টি ঘূর্ণিপাকের চরমে উঠে যায়। রুহানির প্রজাতন্ত্রে যে পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, যে কেউ বুঝবে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে—শুধু ইরাণেরই নয়, গোটা মধ্যপ্রাচ্যে এবং বহির্বিশ্বে।

২০০৯ সালে, হানি ফাহস আহমেদিনেজাদের বিরুদ্ধে ইরাণের যুব আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন—তিনিই একমাত্র মোল্লা নন যিনি দেশের যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিলেন। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সবুজ আন্দোলন কি ইরাণের ইতিহাসে যে ইসলামি বিপ্লব শুরু হয়েছিল তাকে শেষ করে দিয়েছে? ফাহস বলেছিলেন, "হতে পারে, কিন্তু তার জন্য আরও একটু সময় প্রয়োজন। খোমেইনি মোল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছেন টাকা, সৈন্য এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা। এসব বিষয় ধ্বংস করা প্রায় অসম্ভব। আবার, খুব বেশী যুবক ইসলামি বিপ্লবের ধারণা বিশ্বাস করে না—যে শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করছে সে অক্ষতই আছে। সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে"।

ফাহস ইরাণের বাইরের যুবক ধর্মতাত্ত্বিকদের স্বাগত জানিয়েছিলেন যাদের মত পুরনোপন্থীদের থেকে আলাদা, তিনি জানতেন এই নতুন প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরীদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। "মোল্লাদের নিজেদেরই নিজেদেরকে জানতে হবে। পরিবর্তন ঘটার এটাই একমাত্র উপায়। সেই চাপ শুধুমাত্র ভিতর থেকে আসতে পারে না—তাকে বাইরে থেকেও আসতে হবে"।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্মীয় ইসলাম থেকে রাজনৈতিক ইসলামকে কি আলাদা করা সম্ভব? তিনি উত্তর দিলেন, "পণ্ডিতরা বলে, ইসলাম একই সাথে ধর্ম এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি, কিন্তু ইসলাম এতটা শক্তিশালী নয় যে সে একটা জাতি-রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে। বর্তমানে কোন দেশই এভাবে চলে না—হয়ত সপ্তম শতাব্দীতে কিছু ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য ছিল। মূলত, ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকের দেশ হতে পারে না—শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ধর্মের অনুসারী মানুষদের দেশ হতে পারে। আপনি

যদি গভীরভাবে ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন, স্পষ্ট বোঝা যাবে যখনই ধর্ম রাষ্ট্রের সাথে মিলেছে—যেমন মধ্যযুগে চার্চ, তালিবান, মুসলিম ব্রাদারহুড তখনই বিপর্যয় ঘটেছে"।

যে কোন প্রকার ইসলামি রাষ্ট্রের বিরোধী থেকেই ফাহ্‌স মারা যান, তাঁর বিশ্বাস ছিল এ অসম্ভব। তিনি বলেছিলেন, শিয়ারা সব সময়েই দাবি করে এমন রাষ্ট্রের যা তাদের বিশ্বাসের সাথে পা মিলিয়ে চলবে, সুন্নীরা চায় তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চলবে—সুফীরা সম্পূর্ণ অন্য কিছু আশা করে। পরিশেষে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ইসলামি রাষ্ট্র বলে কিছু নেই—কেবল কিছু সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র আছে যেমন ইরাণ, যেখানে সংখ্যালঘু বাহাই, ইহুদীদের সাথে সুন্নীরা অত্যাচারিত হয়, এবং মিশর, যেখানে শিয়ারা ভয়ঙ্কর ঘৃণার শিকার। তিনি বলেছিলেন, কেউ বোঝেনি এ জিনিস সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা ভিন্নমতের থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন এমন কি নিজেরই বিকল্প রূপ থেকেও। ইউরোপে তিরিশ বছরের যুদ্ধ একে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে।

ফাহ্‌স ছিলেন একজন ইসলামি পণ্ডিত যিনি ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরাম বলে যেতে পারতেন। উদ্ধৃতি দিতেন একুইনাস, কাণ্ট, ওয়েবার থেকে; নবী বা কোরআনকে একবারও উল্লেখ না করে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি ইউরোপকে অনুকরণ করা সমর্থন করি। এটা একটা কার্যকরী আদর্শ। এবং সভ্যতার আলোক খ্রীষ্টধর্মকে আঘাত করেনি, বরং তাকে রক্ষা করেছে। আমাদের শিয়া এবং সুন্নী উভয়কেই প্রয়োজন। আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হবে যে সভ্যতা ধর্মের বিরোধী নয়; সে যুক্তিকে উন্নত করে—এবং যে যুক্তির বিরোধী তার জন্য অপেক্ষা করে আছে ভয়ানক ভবিষ্যৎ"।

পর্ণোটোপিয়া = পর্ণোগ্রাফি+ইউটোপিয়া (Pornography+Utopia)

অধ্যায় ৯

অবিশ্বাসীরা এগিয়ে আসছে—ইসলামি বিশ্বের পাঁচজন নাস্তিকের কথা

মিশর, ইরাণ, মরক্কো, তিউনিসিয়ার মতো দেশে আরব বসন্ত আভ্যন্তরীণ সভ্যতার সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মীয় শক্তি উভয়েই আপ্রাণ চেষ্টা করে জনজীবনে এবং আইনের উপর যতটা সম্ভব প্রভাব সৃষ্টি করতে। আরও বেশী বেশী আরব নাস্তিকরা এই বিতর্কে অংশ নিচ্ছে এবং তাদের বক্তব্য তুলে ধরছে। আমি এমনই পাঁচজনের সাথে দেখা করে তাদের সাথে কথা বলেছি, প্রত্যেক যুবকই তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাধা টপকে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন—আমার মতে এটাই সবচেয়ে ভাল পন্থা।

নিজেদের মাঠেই বিশ্বাসীদের চাবুকাঘাত

মুমিন নামের এক তরুণের কথা দিয়েই শুরু করা যাক, যার বয়স ছিল ২১ বছর। মুমিনের নামের আরবী অর্থ "বিশ্বাসী, কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য এক আদর্শ খুঁজে পেয়ে নাস্তিক হয়েছে। শিশুকাল থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সে নাস্তিকই ছিল (অবশ্য সবাই এই বয়স পর্যন্ত নাস্তিকই থাকে)। মুমিন পড়াশোনা করেছে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে, সুন্নী ইসলামের বিশেষ কেন্দ্র। সে ইসলাম ত্যাগ করার পর এ বিষয়টি দুই বছর পর্যন্ত কাউকে বলার সাহস পায়নি। মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক যখন ক্ষমতা হারালেন তখনই সে সাহস পায় পরিবার ও বন্ধুদের জানাতে যে সে বিশ্বাস হারিয়েছে। চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, বন্ধুদের সাথে কথা বলার পর মুমিন আবিষ্কার করল যে সে একা নয়। তার অনেক বন্ধুই একইরকম চিন্তা করছে, যদিও তারা সবাই এ বিষয়টি নিয়ে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলতে ভয় পায়।

দুজন বন্ধুর সাথে মিলে মুমিন একটি ফেসবুক পেজ খোলে যার আরবী নামের অর্থ "সংযুক্ত মিশরীয় নাস্তিক"। পরবর্তী কয়েকমাসে পেজটি কয়েক হাজার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের ফটো এবং আসল নাম প্রকাশ করে—যা এখনও আরব বিশ্বে খুবই

অস্বাভাবিক। মুমিন আমাকে বলে, “ইসলামপন্থীরা আমাদের যেমন বিশ্বাসী দেখতে চায় মিশরীয়রা চরিত্রগতভাবে ততটা ধার্মিক নয়। আমার অনুমান প্রত্যেক মিশরীয় পরিবারে একজন নাস্তিক আছে, বা কমপক্ষে একজন আছে যে ইসলাম বিষয়ে সমালোচনার মনোভাব পোষণ করে। তারা কারও কাছে এ বিষয়ে কিছু বলতে ভয় পায় মাত্র”।

পুরানো কায়রোতে ইসলামপন্থীদের সাথে সংঘর্ষের সময়ে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি মুমিনের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়। মুসলিম ব্রাদাহুডের এক পণ্ডিত বক্তৃতা করতে এসেছিলেন, বিষয় “একজন নাস্তিকের চিন্তার প্রকৃতি”—মুমিন এবং তার তিন বন্ধু শুনতে গিয়েছিল, ভিড়ে ঠাসা মসজিদে তারা বসল।

সে আমাকে বলল, দীর্ঘ আশি মিনিট ধরে সেই শায়েখ নাস্তিকদের এবং বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে একটানা অর্থহীন কথা বলে গেলেন। শেষ দিকে যখন দরজা খোলা হল, মুমিন দেখল অধিকাংশই তার সহযোগী নাস্তিক যারা সংবাদ মাধ্যমে জেনে সেখানে এসেছে। তারা সবাই সুশিক্ষিত প্রাক্তন মুসলিম, এমন কি মাথায় হিজাব পরা মহিলারাও লজ্জা ত্যাগ করে ঘোষণা করছে তারা নাস্তিক এবং নির্ভয়ে বক্তৃতাটিকে সরাসরি মিথ্যাকথা বলে উল্লেখ করছে। মুমিন গর্বের সাথে আমাকে বলল, “আমরা বিশ্বাসীদেরকে তাদের মাটিতেই বারবার চাবুক মেরেছি”।

সেই সন্ধ্যার ঘটনা তাকে সাহসী করে তুলল বড় আকারে আন্দোলন গড়ে তুলতে যাতে আরও বেশী সংখ্যক মিশরীয় মানুষের কাছে পৌঁছন যায়। “ধর্মনিরপেক্ষরা” (তারা এভাবেই তাদের পরিচয় দেয়) বর্তমানে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া এবং মিশরের অন্য তিন জেলাতে সক্রিয়, তারা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের উপর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের বহু মুসলমানের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা প্রায় নাস্তিকতার মতোই বিশ্রী টক।

মুমিন কখনোই তার অবিশ্বাসকে রাজনৈতিক চেহারা দিতে চায়নি। সে বলে, “কিন্তু মানুষের ‘বিশ্বাস’ যখন রাজনৈতিক, আমার ‘বিশ্বাস’-এর অভাবও ঠিক তেমনি সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনৈতিক। যতদিন অবিশ্বাসীরা অত্যাচারের শিকার হবে, যতদিন ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত এলাকায় মাথা গলাবে; আমি একে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় বলে বাদ দিতে পারি না”।

যে রাত্রে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়ার জন্য মুমিন আমাকে আহ্বান জানালো, সমস্ত বিষয়টাই অনেক বেশী রাজনৈতিক হয়ে উঠল। আমি ইসলামি ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মঞ্চে উঠলাম। বললাম, মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্মের বহু আগে ইসলামের প্রাথমিক লগ্নেই ইসলামের ফ্যাসিবাদী চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। বক্তৃতার ফুটেজ দুরন্ত গতিতে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ল, এবং কয়েকদিন পরেই সন্ত্রাসবাদী দল আল-গামা আল-ইসলামিয়ার (al-Gama'a al-Islamia) মুখপাত্র আসেম আবদেল মাজেদ (Assem Abdel Maged) শুধু আমাকেই হত্যার হুমকি দিলেন না, সঙ্গে মুমিনকেও যোগ করলেন—সে বক্তৃতার সময় আমার পাশে বসে ছিল এবং ছবি তোলা হয়েছিল। এর পরের ঘটনাবলী এই বইয়ের ভূমিকাতে বলা হয়েছে।

সেই বক্তৃতা এবং তার পরের অবর্ণনীয় অবস্থা মুমিন এবং তার ধর্মনিরপেক্ষ অনুগামীদের কঠিন সমালোচনা আর অসংখ্য মৃত্যু হুমকির সম্মুখীন করে দিল, কিন্তু সেইসাথে হাজার হাজার নতুন সমর্থকও এগিয়ে এল। সে বলে, "আমাদের মধ্যে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল ইসলামপন্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে যেতে—আমরা দাঁড়িয়েছিলাম একেবারে যুদ্ধের কিনারে কারণ যুদ্ধ শুরু করতে আমরা ভীত বোধ করছিলাম। সেই বক্তৃতা আমাদের প্রকাশ্যে বলতে বাধ্য করল আমরা কি ভাবি"।

মুমিন মনে করে, মিশরের ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত, শুধুমাত্র সম্ভাবনা নয়। আমিও সেটাই মনে করি। যেটা বোঝা যাচ্ছে না তার জন্য কতটা মূল্য দেশটিকে দিতে হবে। ইতিহাস বলে অজস্র রক্ত। যদিও ইসলামপন্থায় যেমন বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষ আছে তেমনি সীমাহীন শহীদও আছে। কোন পক্ষ জয়ী হবে তা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু যেদিক থেকেই হোক, মৌলবাদীরা শেষপর্যন্ত হারবে, কারণ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই।

"আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়িয়েই মরব"

এক বছর আগে মানুষটি একটা কাফেতে আমার টেবিলের উল্টোদিকে বসেছিল। আমার মনে হচ্ছিল তার ব্যক্তিত্ব বন্ধুত্বপূর্ণ কিন্তু যেন কিছুটা একাকীত্ব বোধ করছিলেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ভয়সঙ্কুলভাবে দ্রুত

চারদিকের মানুষদের লক্ষ্য করছিল, যদিও তাকে ভীত মনে হচ্ছিল না। ইরাণী গায়ক এবং সঙ্গীত রচয়িতা শাহিন নাজাফি পথে-ঘাটে মানুষকে সম্ভাব্য ঘাতক না ভেবে গল্প এবং সৃষ্টিশীল কিছুর খোঁজে গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং চারপাশের পৃথিবীকে খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করে ফুটিয়ে তুলতেন তার গানে।

আমাদের দেখা হয়েছিল বার্লিনে মে ১০, ২০১৩-য়, নগরীর বই পোড়ানোর কুখ্যাত ঘটনার আশিতম বার্ষিকীতে, এবং তার এক বছর অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হওয়ার দিনে; কারণ তার মাথার দাম হিসাবে তার দেশেরই আয়াতোল্লারা $১০০,০০০ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এই ঘটনার জন্য একটি গানই যথেষ্ট, যে গানে শাহিন মহম্মদের উত্তরসূরী নাঘিকে ইরাণে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন দেশটাকে একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত করতে এবং দেশের মানুষকে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ভালবাসায় ভাসিয়ে দিতে।

শাহিন নিজেকে ধর্মের কাল্পনিক ছবি ব্যবহার করে উস্কানিদাতা বলতে রাজী নয়। সে আমাকে বলে, “আমি কখনই ধর্মকে আক্রমণ করার কথা বলিনি। লোকে এই কথা বলেই আমাকে বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু তারাই ধর্মের অপব্যবহার করে অন্যদের অত্যাচার করার জন্য। ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতীক যা কিছুই আমার নিজের জীবনকে এবং অন্য ইরাণীদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেইসব বিষয় থেকেই আমি আমার রসদ সংগ্রহ করি। আমার ক্ষেত্রে এটা অন্য কোন কিছুই নয়, এ একটা শিল্প এবং আমার শিল্পের একমাত্র চাওয়া ‘স্বাধীনতা’।

একজন বিদ্রোহী এবং আত্মগোপনকারী শিল্পী শাহিন ইরাণের শাসকদের কাছে ছিল সর্বক্ষণের চক্ষুশূল। মোল্লাদের সমালোচনা করা তার গান দেশের যুবসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ২০০৪ সালে তার নিজের শহর বান্দার-এ আনজালিতে তার একটি অনুষ্ঠানে সরকারী গুণ্ডারা আক্রমণ চালায়। তার একটি গান “রিশ” (Rish-দাড়ি) গাওয়ার পরই শাহিনকে গ্রপ্তার করা হয় এবং বন্দী অবস্থায় প্রচুর অত্যাচার করা হয়। ফলে তাকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হতে হয় ২০০৫ সালে ইরাণ থেকে জার্মানীতে পালিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।

শাহিন এবং আমি আলোচনা করতাম ইরাণের মোল্লা এবং আমার দেশ মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের মধ্যে কি কি মিল আছে তাই নিয়ে। উভয়েই ক্ষমতায় এসেছিল শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পর, লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা এবং ন্যায়; উভয়েই ক্ষমতা লাভ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে, এবং ক্ষমতায় এসেই গণতন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে দেয়; এবং উভয়েই তাদের সমাজের উপর চাপিয়ে দেয় ধর্মীয় একনায়কতন্ত্র, সামান্যতম সমালোচনাতেও তাদের গভীর বিতৃষ্ণা এবং তীব্র আপত্তি। ইরাণের মতো মিশরেও ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপকারী কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী বা সঙ্গীতশিল্পী, সেইসাথে ধর্মের সমালোচনাকারীরা অত্যাচারিত হয় এবং হত্যা হুমকির মুখে পড়ে। শেষতম উদাহরণ কৌতুকশিল্পী বাসেম ইউসেফ (Bassem Youssef), যিনি মিশরের জন স্টুয়ার্ট (Jon Stewart) বলে পরিচিত। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আবদেল ফাতাহ্ এল-সিসি (Abdel Fattah el-Sisi- ব্রাদারহুডের মোহামেদ মোরসিকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসেন) উভয়ের আমলেই তাদের রোষের মুখে পড়েন।

একনায়কতন্ত্র বেঁচে থাকে গল্পকথা এবং জনসাধারণের ভয়কে অবলম্বন করে। শাহিন নাজাফির মতো শিল্পীরা তাদের রসবোধ এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ঐসব গল্পকথাকে মুছে দিতে চেষ্টা করে; অতি উচ্চ থেকে যে শাসকরা শাসন করে তাদের সম্পর্কে মানুষের ভয় কমে আসে। কিন্তু এসব করার কারণে তারা সবসময় হুমকির মুখে থাকে, যেমন থাকে যারা শাসকের ক্ষমতার ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলে—অবশ্য তারা যদি আদৌ বেঁচে থাকে।

শাহিন কখনও ভয় পায় না। তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হওয়ার ঠিক এক বছর পর আজ রাত্রে বার্লিন জেলার ক্রেউজবার্গে (Kreuzberg) ভিড়ে ঠাসা হলঘরে সে প্রথম অনুষ্ঠান করছে। জনতার বেশীর ভাগই ইরাণ থেকে আসা প্রবাসী, প্রায় পাগল হয়ে উঠল যখন সে স্টেজে এল। শাহিন একটা করে গান গায় আর জনতা যেন তার সাথে আরও গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একজন ইরাণী যুবতী চিৎকার করে বলে উঠলেন, “শাহিন ইরাণের সবকিছু আমাদেরকে চিনিয়ে দেয়। সে একটা মাত্র বাক্যে যা বলে তা বলতে অন্য কাউকে একটা বই লিখতে হবে”।

ফটোগ্রাফার হামেদ রওশনগাহ্ (Hamed Rowshangah) প্রতি মুহূর্তে গায়ককে চোখে রাখছে যাতে শাহিনের দ্রুত চলাফেরার প্রতিটি ছবি ধরে

রাখতে পারে। সে আমাকে বলে, “এই মানুষটি আমাদের কাছে যেন এক প্রতীক, সে সাহস এবং বেঁচে থাকার আনন্দ বিষয়ে যা বলে তা যেন আজকের ইরাণের যুবসম্প্রদায়ের মনের কথা। সে চিৎকার করে যা বলে তা ইরাণের বহু মানুষ নিজেদের মধ্যেও বলতে ভয় পায়। সে যুদ্ধ করে মোল্লাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে, একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এজন্যই আমরা তাকে ভালবাসি”।

শ্রোতারা প্রতিটি গানের সাথেই গলা মেলাচ্ছিল, প্রতিটি গানের শব্দই তাদের জানা, শুধু শাহিনের নতুন গানগুলি ছাড়া। বার বার তারা দাবি জানাচ্ছিল, “নাঘি! নাঘি!”—কিন্তু শাহিন গানটি গাইছিল না, যে গান তাকে ফতোয়ার মুখে ফেলেছিল। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম ‘এ কি ভয়ের কারণে অথবা মোল্লাদের সাথে আপস করার ইচ্ছা’? কক্ষনো না—শাহিন সবথেকে ভালোটুকু তুলে রেখেছিল শেষ মুহূর্ত্তের জন্য। অবশেষে উচ্চৈস্বরে “হেই, নাঘি!” বলে সে স্টেজ থেকে নেমে এল জনতার মাঝে, আর জনতা তাকে সাগরের মতো বুকে তুলে নিল।

অনুষ্ঠানের পর শাহিন আমাকে বলেছিল, “আমি একটা মাছ, এই স্টেজ, এই জনতা আমার কাছে জলের মতো। আমি গান না গেয়ে বাঁচতে পারি না”। শ্রোতাদের কৃতজ্ঞতা এবং তার উপস্থিতিতেই অপার আনন্দের প্রকাশ তাকে প্রচণ্ড সুখে ভরিয়ে দেয়, কিন্তু এখনও তার প্রিয়তম ইচ্ছা স্বাধীন ইরাণে গান গাওয়া। আমি জিজ্ঞাসা করলাম সর্বপ্রথম সে কোন গান গাইবে? “আমার মনে হয় ‘ইস্তাদেহ মরদান’” (Istadeh Mordan) সে বলল, গানটির শিরোনামের অর্থ “আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়িয়েই মরব” (I’ll Die on My Feet)। শাহিন গানটি লিখেছিল ফতোয়া জারির পর সেই অন্ধকার সময়ে। “আমার এবং আমার দেশের বহু মানুষের কাছে গানটি প্রতিরোধের মতো—এবং হয়তো তারা তাদের বিশ্বাসের জন্য আমৃত্যু লড়বে”।

এ কেমন বিশ্বাস? কি ধরণের ঈশ্বর?

পারিবারিক শোকের কারণে প্রায়শই মানুষ জীবন মৃত্যুর অর্থ নিয়ে ভাবে, কখনো এই নিয়মের মধ্যেই বিশ্বাস খুঁজে পায়। নাদিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল। পঁচিশ বছর বয়সী টিউনিসিয় কলা বিভাগের ছাত্রী,

শিশুবেলা থেকে সে তার ঠাকুর্দার সাথে গভীর ভালবাসা অন্তর থেকে অনুভব করত। সে বলে তিনি আমাকে যত ভালবাসতেন তেমন আর কাউকে নয়। ২০১২-র গ্রীষ্মে তার মৃত্যুর পর নাদিয়া আশা করেছিল সে ঠাকুর্দার দেহের সাথে সমাধিস্থান পর্যন্ত যাবে, কিন্তু মুসলিম প্রথানুযায়ী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে নারীদের যাওয়া নিষেধ। অপমানিত ও বিরক্ত হয়ে নাদিয়া লুকিয়ে শবযাত্রাকে অনুসরণ করল, এবং কবরস্থানের পাঁচিলের আড়াল থেকে ঠাকুর্দার সমাধি প্রক্রিয়া দেখছিল—নিস্তব্ধ বিদায়যাত্রা হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এক নীতিবাগীশ দূর সম্পর্কের আত্মীয় নাদিয়াকে দেখে ফেললে। তিনি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। "আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও"! তিনি থুতু ফেললেন, "তোমরা মেয়েরা অপবিত্র, এবং তোমাদের এখানে কিছু করার নেই! তুমি এখানে থাকলে তোমার ঠাকুর্দা শুধু যন্ত্রণাই পাবে, আর কিছু হবে না। দূর হও!"

নাদিয়া বাড়ী গেল, অবাক হয়ে প্রথমবারের জন্য ভাবল প্রকৃতই ধর্ম বলতে কি বোঝায়। "এ কেমন বিশ্বাস যা আমি এবং আমার ঠাকুর্দার মাঝে দেওয়াল তুলে দেয়?" সে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে। "কি ধরণের ঈশ্বর কাউকে অধিকার দেয় আমাকে আঘাত করার?" একমুহূর্ত্ত চিন্তা না করে নাদিয়া একটা কাঁচি এবং ব্লেড দিয়ে তার মাথা পরিস্কার করে কামিয়ে ফেলল। "আমি চুল কাটার সাথে সাথে ধর্মের সাথেও সম্পর্ক ছেদ করে ফেলেছি"।

নাদিয়া একটু থামল, প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নীরবে টানতে থাকল। অন্যান্য কয়েকজন টিউনিসিয় তাদের টেবিলে হাসছিল, জোক বলছিল আর নাদিয়ার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল; নাদিয়া বিরক্তিভরা চোখে ওদের দেখল। দেশে সে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে তা আজও তাকে বিচলিত করে। দু'বছর আগে দেশের রাস্তায় সে চার সপ্তাহ ধরে বেন আলির একনায়কতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেছে, হাজার হাজার মানুষের জন্য ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের দাবিতে। তখন নাদিয়ার ধারণা ছিল না ইসলামপন্থীরা শীঘ্রই ক্ষমতায় আসবে এবং তাদের নিজস্ব সামাজিক আইন চাপিয়ে দেবে।

অতীতে তিউনিসিয়ার জনজীবনে বিশ্বাসের ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য, রাজনীতি এবং ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। আজ "কট্টর কমিউনিস্ট"রাও

ধর্মনিরপেক্ষতায় (laicite) বিশ্বাস নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করে। ২০১৩, ফেব্রুয়ারীতে বামপন্থী রাজনীতিবিদ চোকরি বেলায়েদ (Chokri Belaid) এবং ঐ বছরই জুলাইএ অত্যন্ত জনপ্রিয় সংসদসদস্য মোহামেদ ব্রাহমির মৃত্যুর পর তিউনিসিয়ার বিরোধীদল এবং ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে তীব্র ভয় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণই অত্যাচার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। নাদিয়ার দুজন শিল্পী বন্ধুর আট বছরের জেল হয় শার্লি হেবডোর (Charlie Hebdo) মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র অনলাইনে প্রকাশ করার কারণে। এই সাজার ফলে জনসাধারণের ক্রোধের উপর নেমে এল নিস্তব্ধতার কন্ঠরোধকারী আবহ। নাদিয়া আমাকে বলে সে তিউনিসিয়ার জন্য লজ্জা বোধ করে; আরব বসন্তের জন্মভূমি নতুন একনায়কতন্ত্রের পায়ে মাথা নীচু করেছে।

তিউনিসিয়ার প্রথম অবাধ নির্বাচনে সুসংহত এবং অসংখ্য ধর্মোন্মাদের সমর্থনপুষ্ট ইসলামিস্ট ‘এন্নাহ্দা’ (প্রতিরোধ) পার্টি ৪০ শতাংশেরও বেশী ভোট পায়। নাদিয়া বলে, কয়েক দশক দেশের প্রধান শহরগুলির শহরতলি অঞ্চলে “ইঁদুরের মতো” লুকিয়ে থাকার পর দলটি তিউনিসিয়ার নগরগুলি দখল করে এবং অতি দ্রুতগতিতে তাদের “ইসলামিকরণ” শুরু করে। মহিলা ইসলামপন্থীরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের মতোই সক্রিয় হয়ে উঠল, প্রতিনিয়ত তারা নাদিয়াকে যানবাহনে চলার সময় জ্বালাতন করত, তাকে পুরুষের মতো দেখতে লাগে বলে এবং হিজাব না পরার কারণে। সে বলে, “তিনটি ভিন্ন কারণে সমাজে আমার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত; প্রথম আমি নাস্তিক, তারপর আমি নারী, তারপর একজন নারী যাকে দেখতে পুরুষের মতো”।

নির্বাচনে জয়ের পর তিউনিসিয়ার সালাফিরা লাগাতার আক্রমণ শুরু করল বারগুলিতে, পতিতালয়ে, এবং নাইটক্লাবে। এমনকি মানুবা রাজ্যের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও আক্রমণের শিকার হল; সালাফিরা দেশের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলল এবং তার জায়গায় উড়িয়ে দিল আল-কায়েদার পতাকা। তারা এন্নাহ্দার নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী হয়ত নয়, কিন্তু দল তাদের এবং তাদের মতো লোকদের সহ্য করল, সাবধানে তাদের ব্যবহার করল বিরোধীদের সন্ত্রস্ত রাখতে এবং পশ্চিমীদের চোখে নিজেদের নরমপন্থী বিকল্প হিসাবে তুলে ধরতে।

এমন বাস্তবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে একটু স্বস্তির খোঁজে নাদিয়া অনলাইন জগতে চোখ রাখল এবং তার ছেলেবন্ধু আলার (Alaa) সাথে একটি ধর্মবর্জিত ফেসবুক পেজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিল। প্রায় পাঁচশ মানুষ একত্রিত হয়ে মত বিনিময় করতে লাগল। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তিউনিসিয়ার নাস্তিকরা মিশরের নাস্তিকদের মতো হঠাৎ করে জোরালো ধাক্কা দিতে পারে, কারণ তারা তীব্র ভয়ে আক্রান্ত এবং কখনো বা অনীহাগ্রস্ত। অনেকে এখন চায় বেন আলি ফিরে আসুক, কারণ এই একনায়ক সবসময়েই চষ্টা করেন ইসলামপন্থীদের হাত থেকে টিউনিসিয়দের রক্ষা করতে। একটা অনুভূতি নাদিয়াকে ঘিরে ধরে যার অর্থ দেওলিয়া হওয়াকে মেনে নেওয়া।

নাদিয়া বলে তিউনিসিয়ার যুবসম্প্রদায় এখন আর ইন্টারনেট ব্যবহার করে যৌথভাবে সংহত হয়ে তাদের হতাশা প্রকাশ করে প্রতিবাদ করতে চায় না। কারও কোন নির্দিষ্ট মতাদর্শ নেই এবং তার বয়সী বহু মানুষ ড্রাগে আসক্ত। সে বলে, “আমি বুঝতে পারি না আমার দেশ কিভাবে এর থেকে মুক্তি পাবে। আমি একটা কথা নিশ্চিত জানি কোনভাবেই আমার সন্তানকে এই পৃথিবীতে আনব না”। উত্তরে আমি বললাম এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই কঠিন। সে বলল, “এ আমার পরাজয়, কিন্তু আমাকে এর মুখোমুখি হতেই হবে”।

আমি নাদিয়ার সামনে বাক্যহারা হয়ে বসেছিলাম এবং অস্বস্তি বোধ করছিলাম কিভাবে এই শীতল, বিবর্ণ বাক্যালাপ শেষ করব, আবার বুঝতেও পারছিলাম না কি বলা উচিৎ। একটু পরে বললাম, “কেউই কখনো ভাবেনি গণতন্ত্রিক আরবের উত্থান ঘটবে, এবং এটাও কেউ ভাবেনি টিউনিসিয়রাই প্রথম সে কাজটা করবে। তবে এর পরেও হয়ত দ্বিতীয় একটা ঢেউ আসবে”। আমি তাকে বললাম মধ্য প্রাচ্যের সংস্কৃতি হল একাধিক একনায়কতন্ত্রের সংস্কৃতি। একটা একনায়কতন্ত্র উচ্ছেদ হয় শুধুমাত্র আর একটা একনায়কতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে—কিন্তু ধৈর্যের সাথে চেষ্টা করে যেতে হবে, আমরা তাদের সবগুলিকে উচ্ছেদ করতে পারব।

আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনা, আমি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম না কি নিজেকে।

স্বাধীনতার মূল্য

মে, ২০১৩ জুরিখের নিউমার্ক্ট থিয়েটারে আমার বক্তৃতার পর সম্পূর্ণ দুই চরিত্রের দু'জন মানুষ আমার কাছে এল। নিকোলাস ব্লাঙ্কো (Nicolas Blancho), বয়স ত্রিশ, বড় হয়েছে উদার, ধর্মহীণ পরিবারে, সুইজারল্যাণ্ডের জার্মানভাষী এলাকা বিয়েলে (Biel)। সে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় এবং শহরের অপরাধী অধূষিত এবং বিকৃত রুচির অঞ্চলে থেকে সালাফি মতাবলম্বী হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে কাসেম এল ঘাজ্জালি (Kacem El Ghazzali), বয়স তেইশ, জন্ম মরক্কোর এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে এবং ২০১১ সাল থেকে সুইজারল্যাণ্ডে বাস করে তার দেশের নাস্তিকদের সাহায্যের কাজ করে।

সুইস-জাত ব্লাঙ্কো নিয়ম এবং নৈতিকতার দিশা সন্ধান করেছিল যাতে সে স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতার বিশ্বে বাঁচতে পারে। সে এটা খুঁজে পায় গোঁড়া ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে। এপ্রিল ২০১০-এ তার প্রাক্তন শিক্ষক অ্যালেইন পিচার্ড (Alain Pichard) সুইস-জার্মান পত্রিকা টেগেস-অ্যাঞ্জেইগার (Tages-Anzeiger)-এ বলেন ব্লাঙ্কো ছিল উদ্যমহীন ছাত্র "যার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, যেন এলোমেলোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে"। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করে এবং আইন ও ইসলামি শাস্ত্র পড়ার জন্য বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।

অন্যদিকে ঘাজ্জালি ইসলাম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয় এর অনমনীয় নিয়ম এবং তার দেশে শ্বাসরুদ্ধকর নৈতিকতা দেখে। যখন সে ছোট ছিল তখন কাসাব্লাঙ্কার কাছে একটি কোরানিক মাদ্রাসায় পড়ত। মরক্কোবাসীরা সালাফি বৈশিষ্ট্যযুক্ত সাদা পোষাক পরত; পশ্চিমী পোষাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু একটি সাহসী নতুন পৃথিবী তার সামনে খুলে গেল যেদিন তার বাবা তাকে একটি কম্পিউটার কিনে দিলেন। কাসেম ঘন্টার পর ঘন্টা কীবোর্ড নিয়ে কাটাত, ব্লগজগতের বিভিন্ন বিষয় পড়ত যা তার স্কুলে এবং মসজিদে কঠোরভাবে সীমার বাইরে। সে আগ্রহভরে নিমগ্ন হয়ে যেত ডারউইন তত্ত্ব থেকে বিশ্ব সাহিত্যে, তার পরিচয় হত নতুন তথ্য সংস্কৃতি এবং আলোচনার সাথে। ক্লাসে এবং মসজিদে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ উল্টো, শিক্ষক বা ইমামরা ভাবতেন তারা যা বলবেন ছাত্ররা

নীরবে তা মুখস্থ করবে। অপরদিকে, অনলাইনে শিক্ষা পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে, সেখানে কোন শক্তিশালী আজ্ঞাকারী বাধ্য করে না তারা যা বলছে সেটাই গলাধঃকরণ করতে।

শুধুমাত্র ধর্মান্তরে সন্তুষ্ট না থেকে ব্লাঙ্কো যুবকদের সালাফি মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করল ইসলামিক সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব সুইজারল্যাণ্ড। অতি সম্প্রতি সে সুইজারল্যাণ্ডে শরীয়া আইনের প্রচারও শুরু করেছে, এমন একটা বিচার পদ্ধতিকে সমর্থন করে যার আইন অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিধান দেয়—ব্যভিচারের জন্য নারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যার এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হত্যার। আজকাল ব্লাঙ্কো সাবধানে শব্দ প্রয়োগ করা শিখে গেছে, সে বলে পাথর ছুঁড়ে হত্যা তার ধর্মবিশ্বাসের "কেন্দ্রীয় উপাদান এবং মূল্যবোধ" হলেও সুইস প্রেক্ষিতে তা প্রযোজ্য নয়। তার সেন্ট্রাল কাউন্সিলে বিভিন্ন কাজে পরস্পরবিরোধী মত আছে। উদাহরণ স্বরূপ; বিতর্কিত ইসলাম বিশেষজ্ঞ তারিক রামাদান (Tariq Ramadan) ব্লাঙ্কো এবং তার সহযোগীদের নাম দিয়েছেন "ভিত্তিহীন সম্প্রদায়" যারা "ইসলামি পটভুমিতে প্রান্তবাসী"। অবশ্যই গ্রুপটি সুইস মুসলমানদের অধিকাংশ সদস্যদের থেকে দূরে। সুইস গোয়েন্দা প্রধান মার্কাস সেইলার (Markus Seiler) ২০১০ সালে বলেন, "ইসলামিক সেন্ট্রাল কাউন্সিল আদর্শগতভাবে চরমপন্থী তবে হিংসা অবলম্বী নয়"।

এখানেই সেইলারের ভুল। তিনি বুঝতে পারননি যে ওয়াহাবিরা—যারা ব্লাঙ্কোর ইসলামপন্থী—হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়। কাউকে একই সাথে অবিশ্বাসী পাপী এবং সমান নাগরিক বলা দ্বিচারিতা; আগের কথাটি স্বাভাবিকভাবেই অমানবিক, এবং এমন বিশ্বাস যা মনে করে পাপীরা অনন্তকাল দোজখের আগুনে পুড়বে, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের বাঁচার অধিকারকেই অস্বীকার করে। মরক্কোতে কাসেমকে শরীয়ার নামে শারীরিকভাবে মারা হয়েছিল, দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ার আগে অসংখ্য মৃত্যু হুমকি পেয়েছে। মানবাধিকার রক্ষার সক্রিয় কর্মী হয়ে সে আজও যুদ্ধ করে বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য এবং যারা সুইজারল্যাণ্ডের মুসলিমদের মৌলবাদী বানাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে। সে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে আমাকে বলেছিল, "আমি মরক্কোর শরীয়া থেকে এজন্য পালাইনি যে সুইজারল্যাণ্ডে তার উত্থান দেখব"।

জুরিখে আমার বক্তৃতার পর আমার সাথে দেখা করতে এসে কাসেম প্রথম মুখোমুখী হয় ব্লাঙ্কোর, যদিও কয়েকমাস আগে তাদের মধ্যে পরোক্ষ লড়াই হয়েছিল। ইসলামিক সেন্ট্রাল কাউন্সিল মৌলবাদী সৌদি প্রচারক মোহামেদ আল-আরেফেকে (Mohamed al-Arefe) ফ্রিবুর্গে আমন্ত্রণ জানায় একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, তখন কাসেম সফলভাবে প্রচার চালিয়েছিল সেদেশে তার প্রবেশ আটকাতে, উল্লেখ করেছিল টেলিভিসনে তার উপস্থিতির, যেখানে আরেফে একজন পুরুষের স্ত্রীকে প্রহার করার অধিকারকে সমর্থন করেছেন, দাবি করেছেন ইউরোপীয় মহিলারা কুকুরের সাথে যৌনসঙ্গম করে, এবং বলেছেন ড্যানিশ নারীদের ৫৫ শতাংশ জানেই না তাদের সন্তানদের পিতা কে। এখন কাসেম ভেবে পায়না, কেন ব্লাঙ্কোর মতো মানুষ মুক্ত পরিবেশে বড় হয়েও স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না—সেই সঙ্গে আল-আরেফের মতো আদিম ধারণাবিশিষ্ট মানুষ কান্ট এবং ভলতেয়ারের ধারণায় শিক্ষিত মানুষকে কি শেখাবে।

আমার বক্তৃতার সন্ধ্যায়, দুজনের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল। যখন ব্লাঙ্কো বলল যে সে সুইস আইন এবং ইসলামি আইনের মধ্যে সাংঘর্ষিক কিছু দেখতে পায় না। কাসেম তুলে ধরল পুরুষের বহুবিবাহের কথা, যা ইসলামে গ্রাহ্য কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ। ব্লাঙ্কো বলল, "ঐ আইন এখন দু'জন পুরুষের বিয়ের অনুমোদন দেয়, যদি তুমি একে সমর্থন কর তাহলে মুসলিম পুরুষের একাধিক নারীকে বিয়ে করাকেও সমর্থন করতে হবে। একেই বলে সমতা"। সালাফিরা এইভাবে স্বাধীনতা এবং সমতার ধারণাকে বারবার অপব্যাখ্যা করে যা একইসাথে আকর্ষনীয় এবং লক্ষণীয়। কারণ তারা কদাচিৎ এগুলির উল্লেখ করে যদি সেটি তাদের মতাদর্শকে সমর্থন করে।

আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি দুই বিপরীত বিশ্বে ঢুকে পড়েছি, যেখানে জীনস-পরিহিত মরক্কোবাসীরা কান্টকে উল্লেখ ক'রে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, অথচ সুইস নাগরিকরা মরুবাসী মৌলবাদী ধর্মপ্রচারকদের প্রশংসা করে এবং মধ্যযুগের ইসলামি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। ২০১২-র এপ্রিলের প্রথমদিকে কাসেম আমন্ত্রিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের জন্য জেনেভা বৈঠকে মরক্কোতে 'বিশ্বাস'-এর স্বাধীনতা বিষয়ে বলার জন্য, ব্লাঙ্কো আমন্ত্রিত হয় কায়রোতে এক সালাফি সভায়,

বিশ্বের যুবক মুসলিমদের সিরিয় জিহাদে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাতে।

মিকি মাউস ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই

যখন মিশর এবং তিউনিসিয়া তাদের একনায়ককে উচ্ছেদ করে দিল, মরক্কোর রাজ পরিবার খাদের কিনারায় পৌঁছে অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং স্বল্প রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের অনুমতি দিল। ছাত্র এবং ইসলামপন্থী উভয় পক্ষই রাস্তায় নামল সংস্কারের দাবিতে, কিন্তু তাদের রাগ ছিল দেশের বামপন্থী সরকারের উপর, জনপ্রিয় রাজা ষষ্ঠ মহম্মদের উপর নয়। বিক্ষোভকারীদের অসন্তোষ প্রশমণের জন্য, একটি নতুন আপাত উদার সংবিধান লিখিত হল বিদ্যুৎগতিতে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, এবং প্রথমবারের জন্য মরক্কোর ইতিহাসে ইসলামপন্থীরা জাতীয় সরকার গঠন করল। নতুন সংবিধানে বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পরীক্ষার জন্য, সহস্রাব্দের ব্লগার ইমাদ ইদ্দিন হাবিব (Imad Iddine Habib) সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব এক্স-মুসলিমস অব মরক্কোর প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। কিন্তু তখন দেশের পণ্ডিতদের সর্বোচ্চ কাউন্সিল—যার একাংশ সংবিধান রচনা করেছিলেন এবং যার প্রধান রাজা মহম্মদ নিজে—এক সপ্তাহ পরই ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) বিরুদ্ধে ফতোয়া জারির অনুমতি দিল, যে ফতোয়াগুলি তাদের মৃত্যুদন্ডের দাবিতে জারি হয়েছিল সেগুলিসহ।

হাবিব জানে মরক্কোর কোন আদালত ধর্মত্যাগীদের মৃত্যুদণ্ড দেবে না; মহম্মদ এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত পশ্চিমীদের চোখে তার সংস্কারবাদী ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করতে। হাবিব বলল, ফতোয়ার অনুমতি সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামপন্থীদের তোষণ করার একটা সস্তা চেষ্টা। কিন্তু তার পক্ষে এটা বিপজ্জনক এইজন্য যে ধর্মান্ধরা ভাববে তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে মুরতাদদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তারা তাদের হত্যা করতে পারে। তার প্রশ্ন, “তখন আদালতগুলি তাদের কি করবে? তারা তো সেই কাজটাই করছে যা আল্লাহ চেয়েছেন”।

ভীত না হয়ে, হাবিব নতুন এক চমক দেওয়ার কথা ভাবল, দেশের নতুন সংবিধান যে এক চিরকালীন প্রহসন সেটাই সে তুলে ধরবে। জুরিখে

নির্বাসিত প্রাক্তন মুসলিম কাসেম এল ঘাজ্জালির সাথে মিলে সে প্রতিষ্ঠা করল মাসায়মিনস (Masayminsh)—“উপবাস মুক্ত”—উদ্যোগ। সে আমাকে বলে,“আংশিক ধর্মীয় স্বাধীনতা ধর্মীয় কর্তব্যকে তুচ্ছ করে দিতে পারে”। তার আন্দোলন শুধু রমজান মাস পালন বর্জন করার কথাই বলেনি, অবিশ্বাসীদের নিয়ে প্রকাশ্য সভার আয়োজনও করতে থাকল। যখন শাসকবর্গের কানে পৌঁছল যে এই পরিকল্পনা যুবসমাজে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে, হাবিবের গ্রেপ্তারের আদেশ হল এবং মরক্কোর পুলিশ কুকুরের মতো তাকে খুঁজতে থাকল; তার পরিবারের লোক তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং এমন কি তার ধর্মনিরপেক্ষ বন্ধুরাও এতদূর এগোনোর জন্য তাকে অভিযুক্ত করল। ইনস্টিটউট অব ফিজিওথেরাপীর ডিগ্রী সম্পূর্ণ করার মাত্র কয়েক মাস আগে কপর্দকহীন অবস্থায় হাবিব লুকিয়ে পড়তে বাধ্য হল। তাকে যদি গ্রেপ্তার করা হত, তার কমপক্ষে পনেরো বছরের জেল হত।

২০১৩ সালে কাসাব্লাঙ্কাতে আমাদের যখন দেখা হল, আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে ইমাদ ইদ্দিন হাবিবের বয়স মাত্র বাইশ বছর। আমার সামনে যে মানুষটি বসে আছে সে যেন আরও বয়স্ক, তিক্ত অসন্তুষ্ট, মানসিক চাপগ্রস্ত, হতাশ। সর্বোপরি, তার বন্ধুরা যারা নিজেদের দাবি করত উদার এবং মানবাধিকার প্রচারকারী, তারা দূরে সরে গিয়েছে এবং অভিযোগ করেছে “অপ্রয়োজনীয় উসকানি” দিয়ে সে তাদের উদ্দেশ্যকেই বরং ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বলেছে পৃথিবী—কমপক্ষে মরক্কো—এখনও এসব চিন্তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। হাবিব বলে, “যদি কেউ না ভাবে পৃথিবী প্রস্তুত, তাহলে পৃথিবী কোনদিনই প্রস্তুত হবে না। কোন একজনকে তো প্রথম বলতেই হবে। আমি বেঁচে থাকা অবস্থাতেই স্বাধীনতা চাই”।

হাবিবের চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই সে নাস্তিক। কোরআন পড়ানোর সময় তার শিক্ষক তাকে দোজখের আগুন এবং যন্ত্রনার গল্প বলেছিলেন যার ফলে তার দুঃস্বপ্ন হত। সে আমাকে বলে, “সেই ভয় ভেঙে বেরোনোর জন্য আমি যে কোন কিছু করতে পারতাম। অবশেষে কোরআনকে ত্যাগ করা ছাড়া আর আমার কোন উপায় রইল না। এক রাত্রে আমি নিজেকে বললাম, ‘কোন ঈশ্বর নেই। কোরআন শুধুই একটা বই মাত্র, মরুভূমিতে বসে কোন একজন এটা লিখেছে’। নিজের মধ্যে এটা অনুভব করে আমি

যেন মুক্ত হয়ে গেলাম। তারপর থেকে আমি আর দুঃস্বপ্ন দেখিনি বা অপরাধ বোধও করিনি”। ধর্মত্যাগ করা হাবিবের কাছে এত সোজা ছিল যে সে বুঝতে পারত না কেন লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী এক কাল্পনিক ঈশ্বরের জন্য জীবনকে এত কঠিন করে তোলে, এমন কি তার মতো পরিবেশ থেকে উঠে আসা অনেকে অন্যদের হত্যাও করে। সে বলে, “ধর্ম এক ধরণের নজরদারি, আর নজরদারি সৃষ্টি করে মস্তিস্কবিকৃতি—যা পরিণত হয় সিজোফ্রেনিয়াতে। আমাদের সমাজের দিকে একবার তাকাও—এর অধিকাংশ মানুষই মানসিকভাবে অসুস্থ”।

মরক্কো অসংখ্য নাস্তিকের আবাসভূমি, কিন্তু তারা প্রায় সবাই অনলাইন জগতে ঘোরাফেরা করে। তার মধ্যে যারা সশরীরে বাইরে আসে তৎক্ষণাৎ অত্যাচারের শিকার হয় কারণ যে ‘বিশ্বাস’ দাবি করে সেই-ই চরম সত্য, সে সামান্যতম সমালোচনাও হজম করতে পারে না। হাবিব জিজ্ঞাসা করে, “সত্যিই যদি ঈশ্বর থেকে থাকে, সে কি কিছু মনে করবে যদি আমি তাকে অবিশ্বাস করি?” সে বলে, শেষপর্যন্ত মূল কথা হল ক্ষমতা যা ঈশ্বরের নামে ব্যবহৃত হয়। মরক্কোর রাজতন্ত্রের ভিত্তি হল ধর্ম; এর রাজা তার বৈধতা পায় “বিশ্বাসের সর্বাধিকারী” এই অবস্থান থেকে, উত্তেজনা-অশান্তির সময়েও তা কমে না। এর অর্থ, যদি কেউ ধর্মের অলঙ্ঘনীয়তায় সন্দেহ প্রকাশ করে তাহলে সে রাজার শাসন করার স্বর্গীয় অধিকারকেও অস্বীকার করে। মৃদু হেসে হাবিব বলল, “সম্ভবত রাজা নিজেও ইসলাম বিষয়ে আমার মতোই ভাবে। সে শুধু স্বীকার করতে পারে না। সত্যি বলতে, কেন সে স্বীকার করতে চাইবে? সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার কারণেই সে সবার থেকে বেশী লাভবান”।

হাবিব আমাকে বলল কয়েক সপ্তাহ আগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের একটি গ্রুপের এক বন্ধুর কাছে মরিয়া হয়ে সে সাহায্য চেয়েছিল। সেই বন্ধু তাকে দুঃখের সাথে জানিয়েছে যে তার কিছু করার নেই, কারণ হাবিব তার নিজেরই ঘোরের দাস হয়ে গেছে। তারপর সে পরামর্শ দেয় হাবিব যেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে তার কাছ থেকে মানসিক রোগী হিসেবে সার্টিফিকেট নিয়ে সেটি দেখিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে; অথবা ফেসবুকে পোস্ট দিতে পারে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই)। এ ছাড়া তার জীবন বাঁচানোর আর কোন পথ নেই। ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে হাবিব আবার অজ্ঞাতবাসে

ফিরে যায়, প্রথমেই তার ল্যাপটপ খুলে ফেসবুকে পোস্ট করে, “মিকি মাউস ছাড়া কোন ঈশ্বর নাই”।

অধ্যায় ১০

সালাফি, জিহাদি, এবং ইউরোপে ইসলামি ফ্যাসিবাদ

ল্যামিয়া কাদ্দোর (Lamya Kaddor) তার (her) বাবা-মার দেশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে দেখেছে। তার জন্ম একটি সিরিয় পরিবারে, জার্মানীতে ইসলামি শিক্ষকের কাজ করে। সে তীব্র মনোকষ্ট নিয়ে তার মাতৃভূমির ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া দেখছে। সংঘর্ষে নিষ্ঠুর লুটপাট, ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে; কিন্তু কে কাকে আক্রমণ করছে এবং কেন করছে, তা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি এখনও একে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বলতে পারি—নাকি এটি একটি প্রক্সি ওয়ার?

সিরিয়ার যোদ্ধারা এখন আর আলেপ্পো, দামাস্কাস, বা হামা থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে তেহরান, রিয়াধ, এবং মস্কো থেকে। ISIS যোদ্ধারা আসে লেবানন, ইরাক, কুয়েত, আলজিরিয়া, মরক্কো, এককথায় সারা পৃথিবী থেকে; ইসলামিক স্টেটের অধিকাংশ যোদ্ধা আসে তিউনিসিয়া থেকে, যে দেশ আরব বসন্তের জন্মভূমি; এবং সৌদি আরব থেকে, যারা পাশ্চাত্যের "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-এর সমর্থক। অন্যরা আসে জার্মানী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের মতো দেশ থেকে; আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাগুলির অনুমান সংঘর্ষ শুরু হওয়ার সময় থেকে ২০১৩ সালের শেষ পর্যন্ত পাঁচশ' বা তারও বেশী ইসলামপন্থী জার্মানী ছেড়ে গেছে সিরিয়ার জিহাদে যোগ দিতে। সামগ্রিকভাবে ইউরোপ থেকে প্রায় দশ হাজার লোক ঐ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে।

বর্তমানে মধ্য প্রাচ্যের সমস্ত সংঘর্ষ অধ্যুষিত অঞ্চল ইসলামপন্থীদের লোক সংগ্রহের জায়গা, উত্তেজনা-প্রিয় জিহাদীদের চুম্বকের মতো টানে সিরিয়া, অনেকটা কয়েক বছর আগের ইরাকের মতো। তীব্র আতঙ্কের সাথে ল্যামিয়া কাদ্দোর জেনেছিল তারই পাঁচজন প্রাক্তন ছাত্র—যারা আগে কখনও ইসলাম বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি—সিরিয়ার জিহাদে যোগ দিয়েছে। সে আমাকে বলেছিল "তাদের মেয়েবন্ধু ছিল, প্রত্যেকের। তারা মদ পান করত, ড্রাগ নিত—সিরিয়া কোনভাবেই তাদের জীবনের সাথে যুক্ত নয়। এমন কি তারা আরবও নয়! চারজন ছিল তুর্কী আর একজন কসোভান-আলবানিয়ান।

পাঁচজন যুবক কেমন করে নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালিয়া (North Rhine-Westphalia) থেকে সিরিয়ায় গিয়ে সশস্ত্র জিহাদী হয়, এবং কে বা কি তাদের এই ভবিতব্য বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে? ল্যামিয়া বলে, “আমার মনে হয় ওরা জানেও না যুদ্ধটা কি নিয়ে, ওরা তার প্রয়োজনও বোধ করে না—মূল বিষয় হল ওরা একটা কাজ পেয়েছে। ওরা পাঁচজনই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে কিন্তু কোন কাজ পায়নি। যদি তুমি সতেরো বছরের তরতাজা যুবক হও এবং তোমার পুরুষ টেস্টোস্টেরন হরমোন পরিপূর্ণ থাকে আর তোমার মাথা একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করা থাকে, অর্থাৎ তুমি একজন মুসলিম এবং রিফিউজি, আর তুমি শহরের এক প্রান্তে বসবাস করো তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমার মনে হতে থাকবে যে তোমার বিরুদ্ধে বুঝি বৈষম্য করা হচ্ছে, তোমার পশ্চাৎপদতার কারণে এবং তোমার সামাজিক বাস্তবতার কারণে। যদি তুমি নিজেকে পরিত্যক্ত এবং দিশেহারা বোধ কর তাহলে তুমি কেন হিংসার পথ বেছে নেবে না?”

পাঁচজনেরই অপরাধের ইতিহাস ছিল, কেউ আবার একাধিকবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, মারামারি করা, চুরি বা মাদক রাখার অপরাধে। ল্যামিয়া অনুমান করে, কোন একজন আপাত ভদ্র, অমায়িক সালাফি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের অক্ষমতা, হতাশা বুঝতে পেরে একটা কোন অর্থপূর্ণ কাজের প্রস্তাব দিতে পারে। আমাদের সমাজের বাকী অংশ এইরকম যুবকদের বোঝা বলে মনে করে। এ ক্ষেত্রে সেই সালাফি তাদের বোঝাতে পারে তারা যথেষ্ট মূল্যবান—ইসলামের তাদেরকে প্রয়োজন, বা তাদের ক্ষমতা আছে পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার। এ ভাবে তাদের আত্মাভিমান জোর পায় এবং তারা জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পায়।

জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় সালাফি এবং অন্য মৌলবাদীরা একটা শূন্যতা পূরণ করে চলেছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তাদের লোক সংগ্রহের ক্ষমতা, তাঁরা এই যুবকদের দুঃখ-দুর্দশা বোঝে, ওদের মধ্যে যে জিহাদী প্রতিভা আছে তাও বোঝে এবং এজন্যই তাঁরা ওই হতাশ যুবকদেরকে একটা সফল ও অর্থপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়! যেভাবে পৃথিবী অতি দ্রুত পরবর্তিত হচ্ছে, ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের নিজেদের লোকেরই সব প্রয়োজন মিটাতে পারছে না, হাজার হাজার ব্যর্থ মানুষ, আর্থিক উন্নতি এবং নৈতিক বা মানসিক দিক থেকে বঞ্চিত।

সালাফিরা এই যুবকদের জীবন গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে সকলের সাথে মিলে নামাজ পড়ার জন্য বা সুপরিচিত সৌদি বা মিশরীয় সালাফিদের লেখা পড়ার জন্য, পিয়ের ভোগেলের (Pierre Vogel) মতো জার্মান পপ-সালাফিদের ভিডিও দেখতে, যিনি নিজেকে আবু হামজা বলে পরিচয় দেন। ইউরোপের আধুনিক সালাফিরা সনাতন সালাফিদের চেয়ে আলাদা। ওরা বিশুদ্ধ আরবীতে কথা বলে না, বরং রাস্তার ভাষায় কথা বলে। ওরা প্রতিদিন ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়্যেমের বই পড়ে না, বরং ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওরা জিহাদ করা, শরিয়া আইন আঁকড়ে থাকা, ভোগ বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার ইসলামী রাপ (Rap) সঙ্গীত তৈরি করে। আর এভাবেই ওরা সহজেই যুবকদের কাছে যেতে পারে।

ল্যামিয়ার প্রাক্তন ছাত্রদের মতো যুবকরা একজন সালাফি নেতার অনুরাগী। তিনি নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত, মনে হয় যেন তিনি তাদেরই একজন, এবং তারা যা অর্জন করতে চায়, তিনি যেন তা অর্জন করেছেন: আর নিজেকে নতুন করে গড়েছেন সম্পূর্ণ ধর্মীয় পথে— অতীত পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র করেছেন, এবং বিশ্বাসের প্রতি ভক্তিবশত তিনি নিজের একটি নামও নিয়েছেন। তাদের উপদেশদাতা একজন সংশোধিত অপরাধী, যিনি আল্লার ডাক শুনেছেন এবং তা পালন করেছেন। ল্যামিয়া কাদ্দোর বলে, “এইসব ছেলেরা সেটাই চায়। সামাজিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে তারা সবথেকে বেশী চায় পাপমুক্ত হতে এবং চায় অন্যরা ওদেরকে সম্মান করুক”।

পৃথিবীর সবথেকে প্রভাবশালী সালাফিদের অন্যতম মিশরীয় শায়েখ আবু ইশাক আল-হিউয়েনি (Abu Ishaq al-Heweny) যিনি পিয়ের ভোগেলের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছেন, তিনি বহুবার জার্মানীতে এসেছেন সালাফি হতে উৎসুকদের জন্য। জার্মান সরকার মনে করে আল-হিউয়েনি একজন নরমপন্থী, ভোগেল এবং তার মতো লোকেরা মৌলবাদী। কিন্তু সরকার একটা স্পষ্ট বিভেদ করে সালাফি এবং জিহাদিদের মধ্যে। সুইস গোয়েন্দা প্রধান মার্কাস সেইলারের মতো তারা মনে করে প্রথম দলটি অহিংস, কারণ ভোগেল এবং অন্যরা বারবার বলে যে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কোনো মতাদর্শ কখন সহিংস হয়ে ওঠে?

ল্যামিয়া কাদ্দোর জার্মানীর একজন প্রগতিশীল মুসলিম সংস্কারক, তিনি দেশে উদারপন্থী ইসলামি সংগঠন (Liberal Islamic Association) প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামের মৌলবাদী স্রোতের বিরুদ্ধে আলোক সঙ্কেতের মতো। (তারই পাঁচজন ছাত্রের সালাফি হয়ে যাওয়া অবশ্যই এক তিক্ত পরাজয়।) ল্যামিয়া পৃথিবীর মানুষকে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীতে ভাগ করা মানে না। সে সংস্কারসমৃদ্ধ ধর্মতাত্ত্বিকদের পক্ষে, যেমন মুহনাদ খোরচাইড (Mouhanad Khorchide), মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক, যার একুশ শতকের মুসলিম ধর্মতত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় চেষ্টা ইসলামি গোষ্ঠীগুলির সাথে তার মতভেদের সৃষ্টি করেছে।

খোরচাইড এক দয়ালু এবং ভালবাসাপূর্ণ আল্লাহকে খুঁজতে চান যার কথা ইসলামের ধর্মীয় নীতিতে বলা হয়েছে, সর্বদা শাস্তি দিতে উদগ্রীব আল্লাহকে নয়। খোরচাইড একজন যুবক মানুষ যিনি আন্তরিকভাবেই নিরন্তর সংস্কারের চেষ্টা করে যান। জার্মান ইসলামি গ্রুপগুলি তার এই চেষ্টায় যথেষ্ট বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ, তাদের অনেকেই দাবি করেছে জার্মান শিক্ষাকেন্দ্রে তার ইসলাম শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করা হোক। যে ছাত্ররা আজ তার কাছে শিক্ষা নিচ্ছে, আগামীকাল তারাই ইসলাম শেখাবে, জার্মান স্কুলে শিক্ষক হয়ে বা দেশের মসজিদগুলিতে প্রচারক হয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বাসগুলির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী মৈত্রীসূচক। তিনি মনে করেন ইহুদী, খ্রীষ্টান অন্য ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরের ভালবাসা পেতে পারে যদি তারা উত্তম জীবন যাপন করে। খোরচাইড কোরআনে এর সমর্থনও খুঁজে পেয়েছেন—এবং কোরআনের ব্যাখ্যার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এমন আয়াত অবশ্যই পাওয়া সম্ভব যা সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।

ল্যামিয়া কাদ্দোর খোরচাইডের মত সমর্থন করেন। অপরদিকে পিয়ের ভোগেল ইউটিউবে একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন, “যে বলে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা কাফের [“অবিশ্বাসী”] নয়, সে নিজেই একজন কাফের [“অবিশ্বাসী”]।

হিংসার পথে প্রথম পদক্ষেপ

কিছু কিছু সালাফি বলে ‘কাফের’ একটি নিরীহ শব্দ, যার অর্থ যে অন্য বিশ্বাসে বিশ্বাসী—মুসলিমরা নিজেরাই খ্রীষ্টের স্বর্গীয় দেবত্ব এবং ইহুদীদের ধর্মীয় প্রথার যথার্থতা নিয়ে তর্ক তোলে, তারাই খ্রীষ্টান এবং ইহুদী দৃষ্টিকোণ থেকে ‘কুফর’। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি কতটা ভয়ঙ্কর তা বুঝতে ভোগেলের পরামর্শদাতা আল-হিউয়েনি কুফর সম্বন্ধে কি বলেছেন তা শুনতে হবে। ঐ মিশরীয় প্রকাশ্যে বলেছেন, “একজন কাফের পশুর থেকেও নিকৃষ্ট”। তিনি খোরচাইডের মতো কোরআনকেই তার স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন। আল-হিউয়েনি প্রশ্ন করেছেন, “আমরা পশুদের নিয়ে কি করি? আমরা তাদের পিঠে চাপি, আমরা তাদের বাজারে নিয়ে বিক্রি করি। আমরা তাদের জবাই করি এবং খাই”।

‘কাফের’ শব্দটি কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসকেই বোঝায় না বরং সেইসাথে এটি সেই ব্যক্তির তুচ্ছতা প্রকাশ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ‘কাফের’ এর মতো একটা শব্দ উচ্চারণ করা হিংসার পথে প্রথম পদক্ষেপ। ভিন্ন বিশ্বাস বা মতাবলম্বীদের পশু বলে মনে করা সন্ত্রাস এবং এটি মানুষ হত্যা করতে উৎসাহ জোগায়। ইন্টারনেটে ভিডিওতে দেখা যায় ইসলামিক স্টেটের (IS) সেনারা তাদের গলা কাটছে, সেই সাথে চিৎকার করছে “আল্লাহু আকবর”—“আল্লাহ মহান”। আসল পশুকে জবাই করার সময় ইসলামি নিয়ম অনুসারে হালাল কশাই ঠিক একই কথা উচ্চারণ করে। ভোগেল-এর মতো প্রচারকরা হয়ত প্রকাশ্যে হিংসাকে সমর্থন করবে না, কিন্তু তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অন্যদের সাথে করা আচরণ সেই হিংসাকেই বৈধতা দেয়, ইসলামি সন্ত্রাসবাদের পিছনে ধর্মীয় গঠনকেই শক্তিশালী করে। আমার নিজের মত: ইউরোপের উচিৎ তারা ফ্যাসিবাদী দলগুলোকে যেভাবে নিষিদ্ধ করেছে সেভাবে সালাফি সংগঠনগুলোকেও নিষিদ্ধ করা—এখানে কোন ‘যদি’ নেই, কোন ‘কিন্তু’ নেই। ফ্যাসিবাদের ইতিহাস প্রমাণ করে নৃশংসতা শুরু হয় শব্দ দিয়েই—আর কারো পাশেরই মানুষকে পশু আখ্যা দিয়ে ‘জবাই করার যোগ্য’ বলার থেকে বড় ফ্যাসিবাদী আর কে হতে পারে?

সালাফিরা সবাই জিহাদি না হতে পারে, কিন্তু ঘটনা এই যে প্রত্যেক জিহাদির উত্থান হয় সালাফি হিসাবেই। যখন ইসলামিক স্টেট জর্ডনের পাইলট মুয়াথ আল-কাসাসবেহ (Muath al-Kasasbeh) কে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল, তখন এর সদস্যরা ইবন তাইমিয়াহকে (Ibn

Taymiyyah), মধ্যযুগের পণ্ডিত যার লেখা The Drawn Sword against Those Who Insult the Messenger উদ্ধৃত করে বলেছিল যারা নবীকে নিন্দা করে তাদের হত্যা করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য, আর এ ব্যাপারে তারা মহম্মদের জীবনী থেকে তার ২৫০টি বিবৃতির উল্লেখ করেছিল। আজকের দিন পর্যন্ত, ইবন তাইমিয়াহ্ দেবপ্রতিম সালাফি ব্যক্তিত্ব, এবং সালাফি আন্দোলনের পণ্ডিতরা যতবার কোরান উদ্ধৃত করে তার থেকে অনেক বেশী উদ্ধৃত করে তাকে।

যদিও এটা খুবই প্রচলিত কথা যে সালাফি গ্রুপকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের মনে তাদের আবেদন আরও শক্তিশালী হবে; কিন্তু আমি একে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করি না। কারণ এ গ্রুপ কাজ করে আইনের সীমানার মধ্যে থেকে। যেমন ল্যামিয়া কাদ্দোরের পাঁচ ছাত্রের আগে থেকেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তারা যোগ দিয়েছিল পুনর্বাসনের আশায়। যদি সালাফি সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে সম্ভাব্য সদস্যরা এটুকু অন্তত জানবে যে সেখানে যোগ দিলে শাস্তির সম্ভাবনা আছে—এই কারণে অনেকেই সালাফিবাদের দরজা পেরনোর আগে একটু থমকাবে বা আর একবার চিন্তা করবে। যারা ইতিমধ্যেই ফাঁদে পা দিয়েছে তারা হয়ত গ্রাহ্য করবে না সমাজ তাদের সম্বন্ধে কি ভাবছে, অন্যেরা দরজার সম্মুখে এসেও দু’বার ভাববে যদি সালাফিবাদ আইনবিরুদ্ধ হয়। তাদের প্রত্যেকেই নয়, এটা সত্যি—তবে প্রত্যেক মুসলিম যুবক যাকে এই নিষেধাজ্ঞা আটকাতে পারবে সেটাই একটা জয়।

অবিশ্বাসীদের আক্রমণ করা ছাড়াও, আল-হিউয়েনি অনুসারীদের নতুন সমাধান দিয়েছেন ইসলামি বিশ্বের অর্থনৈতিক জড়তা দূর করার। তিনি দাবি করেছেন নতুন করে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে হবে, তাদের সম্পদ লুঠ করতে হবে এবং নারী ও শিশুদের দাস হিসাবে বিক্রি করতে হবে। আল-হিউয়েনি, যাকে নরমপন্থী মনে করা হয়, মুসলিমদের পবিত্র কর্তব্য জিহাদের প্রতি সামগ্রিক অবহেলাকে নিন্দা করে বলেছেন প্রতি বছরে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধ কমপক্ষে একটা বা দু’টো সশস্ত্র অভিযানে ইসলামি দেশগুলির দারিদ্র চিরকালের জন্য দূর হয়ে যাবে। সিরিয়া এবং ইরাকে খ্রীষ্টান ও ইয়াজিদি কুর্দদের প্রতি ইসলামিক স্টেটের ব্যবহার ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কোন ঘটনার সাথে মিলে যায়।

আল-হিউয়েনির মতো প্রচারকদের এই ধরণের বার্তার ফুটেজ নতুন সালাফিদের দেখানো হয়, সেই সঙ্গে সিরিয় জিহাদের মতো সংঘর্ষে যে মুসলিমরা মারা গিয়েছে তার ভয়ঙ্কর ছবি। মৃত্যুর পরেও নিহতদের মুখ দেখে মনে হয় তারা হাসছে। ল্যামিয়া কাদ্দোর আমাকে বলে, “কারণ ঐ ছবিগুলোর যুবকরা জানেই না ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি, বিশ্বাস করে মুসলিমরা নির্যাতীত এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই হবে। সব সময়েই সেই একই গল্প: পৃথিবীর যে প্রান্তেই তারা থাকুক না কেন, মুসলিমরা স্থায়ীভাবে নির্যাতীত এবং সশস্ত্র যুদ্ধই একমাত্র পরীক্ষিত কার্যকরী সমাধান”।

স্বেচ্ছায় শিকার হওয়া এবং প্রতিশোধের ক্ষুধার ভয়ঙ্কর জুটি বর্তমানে ইসলামের অত্যন্ত শক্তিশালী চালিকা শক্তি। মুসলমানদের উপর অত্যাচারের অসংখ্য অনস্বীকার্য ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে এবং সমস্ত ধরণের সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সেগুলির দিকে আঙুল তোলা হয়, সে ইতিহাসগতভাবে ইজরায়েলী এবং আরবদের মধ্যে হতে পারে, সাধারণভাবে পাশ্চাত্য এবং ইসলামি বিশ্বের মধ্যে, বা বসনিয়া, চেচনিয়া এবং সিরিয়ার মতো যুদ্ধ-এলাকায়ও হতে পারে। সময়ের সাথে মৌলবাদ এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে, যা পৌঁছে গেছে আগের চাইতেও অনেক বেশী মানুষের কাছে।

মৌলবাদের তিন প্রকার

২০০৬ সালে জার্মান মুসলিম যুবকদের মৌলবাদী হওয়া বিষয়ে আমি একটি গবেষণাপত্র লিখেছিলাম। আমি মৌলবাদকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলাম। প্রথম, “সনাতন রক্ষণশীলতা”, যা দেখা যায় গ্রামের পিতৃতান্ত্রিক অঞ্চল থেকে আসা মানুষদের মধ্যে, যাদের শিক্ষার মান নীচু এবং যারা এখনও অপ্রচলিত উপজাতীয় প্রথা পালন করে। কোন বিষয় ধর্মীয় হোক বা না হোক, এই ধরণের রক্ষণশীলতা প্রায়ই কোন মত বা প্রথাকে যুক্তিসিদ্ধ করতে ধর্মীয় ধারণা প্রয়োগ করে। এরা এদের মতাবলম্বীদের দেশের বাইরে খুব কমই হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, “ধর্মত্যাগীরা” (এবং বিশেষত নারীরাও) এই জনগোষ্ঠীর কাছে ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ, কারণ তারা পারিবারিক হিংসার শিকার হয়

পরিবারের অটুট সম্মানের উপর কল্পিত আক্রমণের ভয়ে। কঠিন নৈতিক এবং আচরণগত মান এদের বৈশিষ্ট্য, সেই সঙ্গে প্রশ্নহীন পারিবারিক আনুগত্যের প্রত্যাশার কারণে সনাতন রক্ষণশীলতা মৌলবাদের এক যন্ত্রণাদায়ক রূপ, চরম অবস্থায় এ “সম্মানের” কারণে হত্যা এবং জোর করে বিয়ে দেওয়া অনুমোদন করে।

যেসব যুবকেরা শিশুকাল থেকে ভঙ্গুর লালন-পালনের মধ্যে বড় হয় তারাই বিশেষত দ্বিতীয় প্রকার মৌলবাদ প্রবণ হয়। এদের আমি নাম দিয়েছি “চরম পলায়নপর”—ওদের জীবনযাত্রার সন্তোষজনক মান থাকে না। পরিবার, মুসলিম সমাজ এবং ইউরোপীয় সমাজও তাদের বাঁচার কোন ব্যবস্থা করে না। হতাশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, কর্মহীনতা এই যুবকদের অপরাধপ্রবণ এবং হিংসাত্মক হতে বাধ্য করে, স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য, সেইসময় সালাফি সামাজিক চক্রগুলি তাদের কাছে সুযোগ এনে দেয় “বিশেষ কেউ” হওয়ার। নিউকোন (Neukolln) অঞ্চল, কোপেনহেগেনের নোরেব্রো (Norrebro) সংলগ্ন এলাকা, অথবা সুইডেনের মালমো (Malmo) শহর, ব্রাসেলস, বার্মিংহাম, বা প্যারিসের ব্যানলিউয়েস (Banlieues) যেখানেই হোক সর্বত্রই একই ঘটনা। ধর্ম মূল কারণ নয়, এর প্রাথমিক কারণ এদের সামাজিক অবস্থান; যদিও ধর্ম প্রায়শই কারণ হয়ে ওঠে, উদাহরণ স্বরূপ, যখন এলাকা দখলের লড়াই বাধে—যেমন তুর্কী এবং মরোক্কান মুসলমান যুবকরা একত্রিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ জার্মান বা রাশিয়ান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

সবশেষে, “ধর্মীয় অগ্রবর্তিতা”র অনুসারীরা। এরা গতানুগতিক ইসলামি গ্রুপের থেকে দূরত্ব রেখে চলে, নিজেদের মনে করে ধর্মীয় বিপ্লবের অগ্রদূত। মৌলবাদের এই রূপ আরব ছাত্র এবং জার্মান ধর্মান্তরিতদের আকর্ষণ করে; প্রথমবারের মতো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে এরা উগ্রবাদীদের সহজ শিকার।

আভ্যন্তরীণ “ইসলামিকরণ”কে সমর্থন এবং সারা পৃথিবীতে জিহাদের জন্য সংহত হওয়ার ডাক, এই দুইয়ের পার্থক্য এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সালাফি এবং জিহাদি এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রগামী দলের আন্দোলন একসময় একে অপরের থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে চলত, প্রত্যেক গ্রুপই নিজেদের অভিজাত অংশ মনে করত। এরা প্রধানত মধ্যবিত্ত মুসলিম

যুবকদের সংগ্রহ করত যাদেরকে মনে হত শক্ত মনের মানুষ এবং যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে। একসময়ে সালাফিরা ছিল অরাজনৈতিক, তীব্র আশা পোষণ করত মুসলিম সমাজকে নৈতিকতা দিয়েই পরিবর্তন করা যাবে, রাজনৈতিক উপায়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে, সালাফিবাদের মধ্যে একটা তীব্র নিষেধ কাজ করত রাজনীতিতে হাত নোংরা করার বিষয়ে। সালাফিরা জিহাদিদের মতো নয়, তারা হিংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাকত।

সৌদি সালাফি এবং ইরাণের মোল্লাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে এই পার্থক্য এখন অর্থহীণ। মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই শক্তিই এখন বহু আরব সংঘর্ষে সক্রিয়। উভয় দলের অনুসারীদের মধ্যে প্রক্সি-যুদ্ধ (যে যুদ্ধে কোন বৃহৎ শক্তির মদতে কেউ যুদ্ধ করে, কিন্ত সেই বৃহৎ শক্তি সরাসরি যুদ্ধ করে না।) ধ্বংসাত্মকভাবে জ্বলে উঠেছে সিরিয়ায়, যা আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও ঘটেনি। ইরাণ সরকার আসাদকে সাহায্য করছে; সৌদি আরব ইসলামি বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রগুলি এবং পাশ্চাত্য—এমন কি যাদের এক সময়ে আরব সংঘর্ষ নিয়ে ভাবার সময় ছিল না—সৌদির অনুরোধে যোদ্ধা পাঠাচ্ছে, শুধুমাত্র ইরাণকে দমিয়ে রাখার জন্য। শিয়া সংখ্যালঘুরা, বহু শতাব্দী ধরে সুন্নী শাসনে শান্তিতে বাস করেছে, যেমন ইয়েমেন, পাকিস্তান এবং মিশরে; কিন্তু এখন তারা সালাফিদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

এক সময়ে সালাফিরা ছিল সুশিক্ষিত, সম্মানজনক কাজে যুক্ত, সাধারনভাবে বললে ঐতিহ্যগত আরব মানসম্পন্ন—তাদের ধর্মীয় সমাজে স্বীকৃতি পেতে কয়েক বছর ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হত। বর্তমানের সালাফিরা আগের পদ্ধতির কোন কিছুই পালন করে না। এর অভিজাত গোষ্ঠী ইসলামি বিশ্ব এবং পাশ্চাত্যের যুবক মুসলিমদের হতাশাকে ব্যবহার করে সুবিধা পেতে চায়। সালাফিদের দরজা এখন ধর্মান্তরিত, অপরাধী এবং বেকার সবার জন্য খোলা। কয়েক দশক আগের প্রচণ্ড প্রশিক্ষণের জায়গা নিয়েছে ইসলামের উপর স্বল্পকালীন শিক্ষাক্রম। যারা এই শিক্ষাক্রম শেষ করে তারাই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণ মজুরীতে জিহাদি যুদ্ধ করতে পারে। এখন বাছাই করা শব্দ ব্যবহার করার দিন আর নেই; আজকের সালাফিরা রাস্তার ভাষা পছন্দ করে, তাতে অশ্লীলতাও থাকে। লোক সংগ্রহের সময় যা যুবকদের সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে।

‘পলায়নপর’ এবং ‘অগ্রবর্তী’-র মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—মনে হয় যেন জার্মান ধর্মান্তরিত যুবকরা একটা অশুভ ঐক্যের সন্ধান পেয়েছে যা প্রতারণার মাধ্যমে অন্যদের চমকে দেয়।

একসময়ে জার্মানরা ইসলামের কাছাকাছি এসেছিল অতীন্দ্রিয়বাদের মাধ্যমে, বিশেষত সুফীবাদের ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্য বস্তুবাদ এবং নৈরাশ্যবাদ থেকে মুক্তি এবং আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতির আকর্ষণে। সালাফিজম—অংশত প্রতিবাদী আন্দোলনের চরিত্রের কারণে আজ দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। যুবক বয়সে বহু জার্মান দু’এক বছরের জন্য অপরাধী বা অপদার্থ মানুষে পরিণত হত, বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থীদের সাথে যুক্ত হত, সমাজ এবং সরকারের রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ উগরে দিতে। বর্তমানে সালাফি মতাদর্শ বহু জার্মান যুবকদের ক্রোধকে এবং তাদের চারপাশের পৃথিবীর প্রতি তাদের আক্রোশকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে অনেক বেশী সফল। তারা দৃপ্তকণ্ঠে বলে “আমি তোমাদের মতো নই”। ওরা বাহ্যিক চেহারার পরিবর্তন ক’রে, সাদা পোষাক পরে, লম্বা দাড়ি রেখে সমাজকে একটা বার্তা দিতে চায়। “আমার কথা শোন”, “আমাকে ভয় কর”, “আমি কোন শিকার নই”, “আমি শক্তিশালী”।

ব্রিটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড বা ডেনমার্ক সর্বত্র এই ঘটনা, মুসলিম যুবকেরা তাদের বিস্তৃত সমাজ থেকে সরে গিয়ে তাদের নিজের পৃথিবীতে থাকার জন্য নিজেদেরকে আরও আরও বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। ব্রিটিশ সালাফি আঞ্জেম চৌধুরী (Anjem Choudary) প্রকাশ্যে জিহাদের উৎসাহ দিচ্ছে, আহ্বান জানাচ্ছে পশ্চিমী গণতন্ত্রের পতন ঘটাতে এবং ইউরোপীয় ইসলামিক স্টেট গঠনের। মধ্য লণ্ডনে শরীয়া কোর্ট সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা চালু করেছে, বর্ণবৈষম্যমূলক বিচারের একটা ধরণ চার্চ অব ইংল্যাণ্ড মেনেও নিয়েছে ‘সহিষ্ণুতার পরিচয়’ নাম দিয়ে—সেটা মুসলিমদের প্রতি ভালবাসার কারণে নয়, প্রকৃত কারণ, তারা খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করে ব্রিটেনের শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থার উপর আরও বেশী প্রভাবকে যাথার্থ্য দিতে।

জার্মানীতে তথাকথিত ফ্রাইডেন্সরিখটার (Friedensrichter) বা “সালিশী আদালত” নামের একটা দল চেষ্টা করে যেন মুসলমানদের সমস্যা

আদালতে না যায়। ওদের এই মধ্যস্থতার ধরণটার খুব প্রশংসাও করা হয়, কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে দেখি যে কারা এই সালিশী বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত তাহলে দেখব ওরা সেইসব অপরাধপ্রবণ পশ্চাৎপদ আরব যারা ড্রাগ নেয়, আবার মৃতের সৎকারও করে। ওদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেসব আরব সালাফি ইমাম ও তুর্কী সর্দারদের যারা জার্মানির আইনকে পাশ কাটিয়ে তালাবদ্ধ ইসলামিক সমাজব্যবস্থার সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। নারীর অধিকার পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে অতি সুরক্ষিত এবং সম্মানিত; কিন্তু এই ধরণের সালিসি ব্যবস্থায় সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়—সম্পূর্ণ শরীয়া আইন মেনে অথবা প্রাচীন উপজাতীয় প্রথা অনুসারে যা চরমভাবে পিতৃতান্ত্রিক।

সহিষ্ণু সমাজের মূল্যবোধের নামে গোটা মধ্য ইউরোপে একটা স্থিতাবস্থা মেনে নেওয়া হয় যা মৌলবাদকে উৎসাহিত করে, সমাজকে টুকরো করে, সমান্তরাল সমাজ সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয়। এর ফলাফল বিপজ্জনক, কেবলমাত্র মুসলিম নারী ও ধর্মীয় নরমপন্থীদের জন্যই নয়, সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় নিরাপত্তা এবং সামাজিক বন্ধনের প্রতিও। জাতি এবং দেশ অনেক দেরীতে সজাগ হয়; তারা অপেক্ষা করে যতক্ষণ না মৌলবাদীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় অথবা উগ্রপন্থীরা লণ্ডনের মতো গোটা শহরকে ইসলামি আইন অনুসারে শাসন করে, বা কোথাও বোমা বিস্ফোরণ হয় বা সাধারণ নিরীহ পথিক রাস্তাতেই নিহত হয়।

যারা সালাফিদেরকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর সুযোগ করে দেয় এবং এরপর এর প্রেক্ষিতে কোথাও কোনো সহিংস ঘটনা ঘটে তখন তাদের সেই সহিংসতা দেখে বিস্মিত হওয়ার কোন অধিকারই নেই। আজ অথবা কাল তাদের বার্তা হিংসার জন্ম দেবে। মুসলিম যুবকদের মনমানসিকতার মধ্যে সর্বদাই আগুন জ্বলতেই থাকে - কোন ট্রেন, বাজার এলাকা বা সিনাগগ ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই।

মৌলবাদের জোয়ারের শক্তি বৃদ্ধি

ইউরোপের মুসলমানদের অধিকাংশই অরাজনৈতিক, তারা তাদের সন্তানদের সবথেকে ভালটুকু দিতে চায়, এবং অনেকেই বাস্তবে

ধর্মনিরপেক্ষ। সমস্ত মুসলিমই অপেক্ষারত সন্ত্রাসবাদী, এমন ঢালাও দৃষ্টিভঙ্গী বিপজ্জনক এবং সেইসাথে ভুলও বটে। বস্তুত, তাবৎ মুসলিমদের প্রতি সন্দেহ বা তাদের প্রতি খোলাখুলি শত্রুতা অতি সহজে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে যেমন পারে ইসলামি মৌলবাদ। কিন্তু যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নীরব হয়ে আছে তাদের কথা আমাদের শোনার প্রয়োজন আছে। তারা উগ্রবাদীদের বিরোধীতা করতে সক্ষম, যদিও তারা সালাফি এবং রক্ষণশীল ইসলামি গ্রুপের পাহাড়প্রমাণ প্রভাবের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে সক্ষম নয়। ফলে মুহনাদ খোরচাইড এবং ল্যামিয়া কাদ্দোরের মত সংস্কারের প্রচারকরা রত থাকে নিজেদের রক্ষা করতে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিকামী মুসলিমরা দর্শকের মত তাকিয়ে দেখে কারণ তারা ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। জার্মানীতে যখনই এমন ঘটে, সংখ্যালঘু অমুসলিমদের একটি অংশ বলে ইসলামি সংস্কারক বলে কেউ নেই, “ভোগেলবাদী” এবং জিহাদিরাই ইসলামের একমাত্র মুখ। এর ফলে অরাজনৈতিক মুসলিমরা তাদের দাগিয়ে দেয় সাম্প্রদায়িক এবং বিভেদকামী বলে। এই ভুলের চক্র চলতেই থাকে।

পূর্বতন কমিউনিস্ট শহর ড্রেসডেনে অবস্থিত জার্মানীর নবীনতম ইসলামবিরোধী গ্রুপ, ইংরেজীতে যার সংক্ষিপ্ত নাম PEGIDA-র দেশপ্রেমী ইউরোপীয়রা পাশ্চাত্যের ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে কাজ করে। ওরা মুসলিম দেশ থেকে অভিবাসী আসা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে চায়। এই গ্রুপের পত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মারকেল খানিকটা অস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, “ইসলাম জার্মানীর অংশ”, যদিও তিনি কোন ইসলামকে বোঝাচ্ছেন তা বলেননি। ইসলামি ফ্যাসিবাদের কথা তুললেই আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় ইসলাম সম্পর্কে আমারই তোলা প্রসঙ্গের উপর। আলোচকরা জানতে চায় আমি কোন ধরণের ইসলামের কথা বলতে চাইছি, যদিও জার্মানীর মুসলিমরা ঐ একই প্রশ্ন মারকেলকে করতে পারেনি। মনে হয় তারা পাত্তাই দেয়নি তিনি তাদের বিশ্বাসের কোন অংশের কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি কি সেই ইসলামের এত প্রশংসা করেছেন যাতে আছে শরীয়া, জিহাদ এবং লিঙ্গবৈষম্য নাকি আল গামা-আল ইসলামিয়ার বিশ্বাসের কথা বলছেন যাদের টাকার যোগান দেয় তুরস্ক এবং সৌদি আরব নাকি মুহনাদ খোরচাইড-এর মতো সংস্কারকদের ইসলাম।

মারকেলের মন্তব্যের এক সপ্তাহের মধ্যে, সশস্ত্র ইসলামপন্থীরা শার্লি এবদোর অফিসে গণহত্যা চালাল। বাক স্বাধীনতা এবং ফ্রান্সের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য বার্লিনের ব্রানডেনবুর্গ গেটের সামনে এক বিশাল জনসভায় মারকেল এসেছিলেন। কৌতুহলের বিষয়, খোরচাইডের মত ধর্মতাত্ত্বিক এবং ইসলামের সমালোচকরা লক্ষণীয়ভাবে আমন্ত্রিত হননি, অথচ রক্ষণশীল ইসলামি গ্রুপের ছোটখাটো নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন—যারা ক্রমাগত ইসলামের সংস্কারের চেষ্টার বিরোধীতা করে, আর তার পরিবর্তে জার্মানীতে নবীর সমালোচকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ধর্ম অবমাননা (blasphemy) আইনের পুনঃপ্রবর্তন চায়। অতি সামান্য কিছু মূল্যবান মুসলমান সেই বিশাল জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমি নিশ্চিতভাবে জানি, কেন “সাধারণ” মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসের উপর কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না (অন্তত অস্বস্তিকর অংশের), এবং কোলোন বা বার্লিনের মুসলিম ছাত্ররা আফগানিস্তানের সন্ত্রাসী কাজ বা ইরাণে নারীদের পাথর ছুঁড়ে হত্যার দায়িত্ব নিতে চায় না। মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র বা ইসলাম-বিরোধী সিনেমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যেমন মুসলমানরা বিশাল সংখ্যায় রাস্তায় নামে, আমার আশা ইসলামি গ্রুপগুলি এবং সালাফিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধেও মুসলমানরা বিশাল সংখ্যায় রাস্তায় নামবে। দিনশেষে, বিষয়টি সমাজে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন তেমনি তাদের ধর্মের ভাবমূর্ত্তি রক্ষার জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদেরকে রাষ্ট্রের থেকেও নিশ্চিত হতে হবে যেন সরকারী অফিসাররাও ইসলামি গ্রুপগুলির শক্তিবৃদ্ধিতে বাধা দেবে। বেশীরভাগ সময়ে যারা সরকারী মহলে প্রভাব খাটায় এবং ধর্মের নামে সংগঠন গড়ে সমাজে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখার চেষ্টা করে, তারা তাদের বিশ্বাস অনেকটা এগিয়ে দিতে পারবে যদি একবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈধতা পাওয়া যায়।

প্রগতিশীল মুসলিমরা সমবেতভাবে রক্ষণশীল মুসলিমদের থেকে অনেক কম সংখ্যায় বড় গ্রুপ তৈরী করে, কারণ তারা ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য আগ্রহী নয়। গোঁড়া ইসলামি গ্রুপগুলি এই সুযোগটা লুফে নিয়ে নিজেদেরকে ইসলামের মুখ হিসাবে তুলে ধরে। আর তখন ওদের

বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করার সাহসও কারো হয় না - না রাষ্ট্রের, না শান্তিকামী মুসলিমদের। ইসলামি গ্রুপগুলি ধর্মীয় বিভিন্ন নির্দেশনার উপর বিতর্কের আয়োজন করে, যার মধ্যে রয়েছে স্কুলে মুসলিম মেয়েদের সাঁতার না শেখানোর সুপারিশ, মুসলিম নারী বিচারপতি, নারী শিক্ষক, নারী চাকরিজীবীদের হিজাব পরিধান করে কাজ করার অনুমতি দেয়া যায় কিনা ইত্যাদি। আর এসব আয়োজনের পেছনে থাকে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো যারা নারীদেরকে অবদমিত করে রাখার জন্য অর্থের যোগান দেয় এবং আইনজীবী নিয়োগ করে। কিন্তু কেন? নামাজ পড়া ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ বা আবশ্যকীয় বিধান, পক্ষান্তরে হিজাব পরিধান করা ফরজ না। তাহলে তাঁরা কেন পশ্চিমা মুসলিম নারীদের নামাজ পড়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে হিজাব পরাটা আগে চায়? এর কারণ হচ্ছে হিজাব রাজনৈতিক ইসলামের একটি চিহ্ন, এবং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব মুসলিমদের উপর ব্যাপক। এছাড়াও হিজাব মুসলিমদেরকে শরিয়া আইনের প্রয়োগ করার ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে আরব দেশ সমূহের রাজনৈতিক দলগুলোর বেলায়ও - তারা সেখানকার অভিনেত্রী এবং গায়িকাদেরকে মোল্লাদের দিয়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হিজাব পরতে বাধ্য করেছে।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর পর জার্মান সরকার মুসলিমদের সাথে আলোচনার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে আলোচনাই একমাত্র সঠিক এবং উপযুক্ত উপায়। একসময়ে মুসলিমরা স্থানীয় মসজিদের সাধারণ কক্ষে একত্রিত হতো, এখন জাতিগত গ্রুপ যেমন তুর্কী, ইরাণীয় এবং মরোক্কানরা তাদের মূলস্রোতে রয়ে গেল। অথচ সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা উৎসাহিত হয়ে উঠে নতুন একটা গ্রুপের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে তাদেরকেই একক প্রতিনিধি দাবি করল।

আমেরিকা এবং ফ্রান্সের বিপরীতে, জার্মানী উনবিংশ শতকে একটি ভিন্নপথে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। লুথেরান-প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক চার্চের আনুগত্য নিশ্চিত করতে জার্মান সরকার প্রতিশ্রুতি দিল নাগরিকদের থেকে চার্চ-কর আদায় করবে এবং তা তুলে দেবে চার্চের হাতে। উপরন্তু, চার্চগুলিকে সংবাদ মাধ্যম, স্কুলে ধর্মশিক্ষা, এবং জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ধর্মবিভাগ, সেইসাথে তাদের স্বাস্থ্য

এবং দাতব্য সংস্থাগুলির উপর প্রভাব বজায় রাখতে দেওয়া হল। এই প্রাতিষ্ঠানিকতা এক সমস্যা হয়ে উঠল। ইসলামি গ্রুপগুলি দেশের তথাকথিত 'চার্চ-এবং-রাষ্ট্র' বিষয়টি তুলে ধরল—দাবি করল আইনি মীমাংসা যা স্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে হবে, বিগত শতাব্দীর কোন পদ্ধতি অনুসারে নয়। তারা আশা করেছিল আইনানুসারে খ্রীষ্টান চার্চ বা ইহুদী সম্প্রদায়ের গ্রুপগুলির মতো আইনসিদ্ধ সংস্থা হিসাবে ওরাও স্বীকৃতি লাভ করবে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় চলে যাওয়ার পর জার্মানীর চার্চগুলি সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেল, রাষ্ট্র তাদের হয়ে কর সংগ্রহের দায়িত্ব নিল, প্রতিদানে চার্চগুলিকে দায়িত্ব দিল জনস্বাস্থ্য এবং শিক্ষার। চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়মমাফিক ব্যবধান রাখতে জার্মান সরকারকে "পৃথিবী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ" রাখা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল; কিন্তু যেহেতু ধর্মীয় গ্রুপগুলি যে কাজ করত সেগুলি চার্চ-এবং-রাষ্ট্র নিয়মের কারণে "সরকারী" কাজের স্বীকৃতির বদলে "বেসরকারী" কাজ বলে বিবেচিত হতো। সরকার নিয়ম অনুযায়ী কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে উন্নত করার চেষ্টা করল তাদের কর্মসূচীকে আর্থিক এবং রাজনৈতিকভাবে সমর্থনের মাধ্যমে।

একবিংশ শতাব্দীর সমাজ ক্রমে আরও অনেক বেশী বৈচিত্র্যময় এবং বহুসাংস্কৃতিক হয়ে উঠল। অভিবাসীরা হয়ে উঠল প্রথম বিশিষ্ট ব্যক্তি; সর্বসাধারণের আগে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং প্রয়োজন আছে—শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নাগরিক অধিকারের। আমার মতে, এতে সাধারণ মুসলিমদের কোন উপকার হয়নি, বরং এটি তাদেরকে ক্রম-শক্তিমান ইসলামপন্থী সংগঠনসমূহের কাছে জিম্মি করে দিয়েছে। এসব ইসলামিক সংগঠনসমূহকে মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, জার্মানীর খ্রিস্টান চার্চগুলি যে সাংবিধানিক দায়িত্ব বর্তমানে পালন করে ঠিক সেটাই ইসলামের হাতেই যেন তুলে দেওয়া। কিন্তু ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ এবং ইউরোপকে ইসলামিকরণের চেষ্টার বিরুদ্ধেও যেমন সেখানে কিছু করা হয়নি, একইভাবে সেখানে উগ্র ডানপন্থা ও সর্বব্যাপী মুসলিম-বিরোধী মানসিকতার বিরুদ্ধেও কিছুই করা হল না। প্রকৃতপক্ষে অসন্তোষ এবং অবিশ্বাসের আগুন আরও উসকে দেওয়া হল। সংক্ষেপে উত্তর হল, অন্তত আমার যা মনে হয়, জার্মান চার্চগুলিকে যে সুবিধাগুলি দেওয়া হয় তা মুসলিম গ্রুপগুলিকে না দেওয়া। বরং চার্চগুলিকে সেগুলি ছেড়ে

দিতে হবে। তাদের কিছু জনকল্যাণমুখী কাজ সরকারের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। চার্চ-এবং-রাষ্ট্র পদ্ধতি একসময়ে যুক্তিযুক্ত ছিল, কিন্তু আমার মতে তা একুশ শতকের প্রয়োজন মিটাতে ব্যর্থ।

রাষ্ট্রের কর্তব্য হওয়া উচিৎ নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো, শিশুদের গভীরভাবে চিন্তা করার উপকরণ দেওয়া। তবে প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক বা ইসলামি ধর্মীয় “সত্য” পৌঁছে দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়। আমার বিশ্বাস ধর্মীয় শিক্ষা একটি বিশেষ বিষয়, যেখানে শিশুরা বিভিন্ন ধর্মের উৎস, শিক্ষা এবং সামগ্রিক প্রথা সম্বন্ধে জানবে—এর বেশীও নয় কমও নয়। আমার মতে, মুসলিমদের অনুরোধ করতে হবে তাদের প্রাচীন প্রথাগুলিকে পুনর্বিবেচনা করতে, সেই সঙ্গে জার্মান সরকারকেও বলতে হবে চার্চের সাথে সরকারের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে। ধর্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা, তা যেই করুক, মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়ে মুক্ত এবং খোলা আলোচনার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

ইসলামি গ্রুপগুলিকে আইনি সুবিধা উপহার দেওয়ার পরিবর্তে জার্মানীর উচিৎ মুসলিম যুবকদের উন্নত জীবনলাভের সুযোগ দেওয়া। অসংখ্য তুর্কী যুবক শুধুমাত্র তাদের নামের কারণে চাকরির ইন্টারভিউ থেকে বঞ্চিত হয় বা মানব-সম্পদ বিভাগের কর্মীরা তাদের জার্মান (ভাষা) শুনে বিস্মিত হয়। এই বাধাগুলিকে—যা শুধুমাত্র মানসিক বাধা নয়—অবশ্যই দূর করতে হবে। এই পদক্ষেপ ইসলামের উপর বহু আলোচনাসভার থেকে অনেক বেশী কার্যকর হবে; প্রকৃত অর্থে, চ্যান্সেলর মারকেল স্পষ্টভাবে তার যে অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন “ইসলাম জার্মানীর অংশ” বলে, তার থেকেও বেশী। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য বারাক ওবামার ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তে ইসলামের পক্ষে তার মন্তব্য সম্পর্কে “একটি ধর্ম যে শান্তি প্রচার করে” এবং সেইসাথে ক্রুসেডের প্রসঙ্গ তোলা।

রাজনীতিবিদদের কাজ নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করা। কোন ধর্মের প্রশংসা, সমালোচনা, স্বপক্ষে বলা বা মূল্যায়ন করা নয়, তিনি সে ধর্মে বিশ্বাসী হোন বা না হোন। ক্রুসেডের প্রসঙ্গ তুলে ইসলামের বর্তমান হিংসাত্মক কাজকে সম্পর্কিত করা তো একেবারেই নয়; যাতে মনে হয় মুসলিমরা এবং তাদের ধর্ম বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিচারের যোগ্যই

নয়, তাকে বিচার করতে হবে মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে। খ্রীষ্টাধর্মের ক্রুসেড বা তার বিচার তাদের অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে কখনোই মোগলদের হিংসাত্মক কাজের সাথে তুলনা করে করা হয়নি। পশ্চিমী সমাজকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাবে যদি এভাবে ডাইনি-পুড়িয়ে মারার ঘটনাকে তুচ্ছ করে দেখা হয়, সে জার্মানীর চ্যান্সেলর মারকেল বা হোয়াইট হাউসের ভাবী উত্তরসূরী হিলারী ক্লিন্টন হলেও নয়।

কোরআনের হিংসাত্মক অংশের সাথে মিলিয়ে বাইবেলের হিংসাত্মক অংশকে তুলে ধরা, যা অনেকেই করে থাকে, একটা মূর্খের কাজ। এতে মুসলিমদের কোন উপকার হয় না; তাদের পবিত্র গ্রন্থ যেমন ভয়ঙ্কর, অন্যদেরও তাই। সব সময়েই, কোন বিশেষ অংশ অনেক কম সমস্যাজনক যতটা বিশ্বাসীরা তার উপর আরোপ করে। বর্তমানে যে খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে বাইবেল ঈশ্বরের অবিমিশ্র এবং নির্ভুল বাণী তাদের সঠিক অর্থেই বলা হয় মৌলবাদী, অথচ যে মুসলমানরা ঠিক একইভাবে কোরআন সম্পর্কে ভাবে তাদেরকে মনে করা হয় শুধুই মুসলমান। ঠিক এই কারণেই যীশুকে নিয়ে মজা করা মামুলি ব্যাপার কিন্তু মহম্মদকে ব্যঙ্গ করা ভয়ানকভাবে নিষিদ্ধ। মুসলিমরা এই বিশেষ সুবিধাটি দাবি করে এবং অমুসলিম বক্তারা তা সমর্থন করে যারা সর্বক্ষণ সত্য ইসলামের কথা বলে অথচ ইসলাম সম্বন্ধে সত্যটি গোপন করে, এভাবে কখনো অগ্রগতি হতে পারে না।

বিতর্কের সব দিককেই আরও এগিয়ে যেতে হবে। মুসলিমদের অবশ্যই তাদের ধর্মের সমালোচনার প্রেক্ষিতে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা শিখতে হবে এবং অমুসলিমদেরও শিখতে হবে কালো চামড়ার মুসলমানদের ইউরোপীয় বলে গ্রহণ করতে। অবশ্যই সময় কখনো পরিবর্তনকে নিশ্চিত করতে পারে না, এবং আমাদের সমাজ কোন কাল্পনিক নিখুঁত বিষয় নয়, ইসলামি বিশ্বের যে সমস্যাগুলি এখন ইউরোপে উঠে আসছে তা সমাজের সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং পারস্পরিক বৈরিতাকে লালিত করছে। আমার বহুদিনের আশা ছিল যেসব মুসলমান যুবকরা আজ স্বাধীনতা, সমৃদ্ধির মধ্যে বেড়ে উঠছে এবং আধুনিক শিক্ষার সম্পূর্ণ সুফল ভোগ করছে তারাই ইসলামি বিশ্বে উদার মূল্যবোধকে বয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু মুসলিম সমাজের আদর্শগত এবং

গঠনগত বৈশিষ্ট্য, সেইসঙ্গে মুসলিমদের প্রতি ইউরোপীয় আচরণ প্রমাণ করে ঠিক বিপরীতটাই ঘটতে চলেছে।

বর্তমানে জার্মানীর প্রথম গাস্টারবেইটার (Gastarbeiter-অভিবাসী শ্রমিক)-দের পৌত্রদের শেখানো হয় পশ্চাৎমুখী মতবাদ এবং প্রথা, যার কিছু কাসাব্লাঙ্কা এবং ইস্তানবুলেও অতি প্রাচীন বলে বিবেচিত। ইসলামি দেশগুলিতেও যখন ইসলামি ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা উঠে আসছে, যা মিশরে মুসলিম ব্রদারহুডের পতনে প্রমাণিত, তখন পাশ্চাত্যে সালাফিবাদের পশ্চাৎমুখী এবং ফ্যাসিবাদি আদর্শ নিয়ে আরও অনেক বেশী সমর্থক অহঙ্কার প্রকাশ করে। জিহাদের ভাইরাস অত্যন্ত সংক্রামক এবং তা এত দ্রুত বেড়ে চলেছে মানুষ তা জানেই না।

দূর ভবিষ্যতে জয়ের জন্য উভয় দিকেই কষ্টসাধ্য লড়াই-এর প্রয়োজন। নিশ্চেষ্টতা, অনীহা এবং নীরবতা, ইসলামি ফ্যাসিবাদের মতোই ইউরোপের পক্ষে বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক। কোন আচরণ বা মুখের কথাই আমাদের কোথাও পৌঁছে দেবে না। ভীতিপ্রদর্শনকারী বা সন্দেহে ইন্ধন যোগানো মুসলিমদের সাথে ইসলাম বিষয়ে কোন আলোচনাই করা উচিৎ নয়। কারণ তাতে কিছুই লাভ হবে না যদি সমাজ দেওয়াল তুলে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। পরিবর্তে জনসধারণের উপর ধর্মের প্রভাব নিয়ে আলোচনা সম্ভব—যা ধর্মনিরপক্ষ জার্মানী সৃষ্টিতে অনেক সাহায্য করতে পারে।

অধ্যায় ১১

মেরুকরণ এবং সামাজিক শোধন—থিলো সারাজিন এবং রিসেপ তাইপ এরদোগান, উভয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

থিলো সারাজিন- এর বহুল বিক্রীত বই Deutschland schafft sich ab (জার্মানী নিজের বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে- Germany is abolishing itself) প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছর পর আমি নিশ্চিত হতে পারি না; ইসলাম এবং সামাজিক সৌহার্দ্য নিয়ে করা বিতর্ক--ভয় উসকে দেওয়া, ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ছড়ানো, নারকীয় তাণ্ডব ছাড়া আর কি করতে পেরেছে। সারাজিন বার্লিনের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং জার্মান ফেডেরাল ব্যাঙ্কের (Deutsche Bundesbank) প্রাক্তন CEO. তার বইতে তিনি সাবধান করে বলেছেন, মুসলিম অভিবাসীরা জার্মানীর সামাজিক ব্যবস্থার সুযোগ ব্যবহার করছে এবং শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাচ্ছে। তার মতে, আগামী একশ’ বছরের মধ্যে ইসলাম জার্মানীর ক্ষমতা দখল করবে। বুদ্ধিমত্তা এবং বংশানুক্রমিক বৈশিষ্টের উপর সারাজিনের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও, একটা সময় ছিল যখন আমি নিজেকে আশ্বস্ত করতাম এই ভেবে যে তিনি তার এই হিংসা উদ্রেককারী মন্তব্যে শুধুমাত্র শিক্ষা এবং সমাজ বিষয়ে নীতির ব্যর্থতা উল্লেখ করেছেন। আশা করতাম, তার এই বইয়ের অভিঘাতে হয়ত একটা সুস্থ, সৎ বিতর্কের বিকাশ ঘটবে যেখানে মতানৈক্য সত্ত্বেও ভাবমোক্ষণ হবে এবং অবদমিত তীব্র আবেগের প্রশমন ঘটবে। কিন্তু বিতর্ক বা বাদ-প্রতিবাদ কিছুই প্রশমিত করতে পারল না, শুধুমাত্র পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং মেরুকরণ তীব্র হল।

সারাজিনের গুণমুগ্ধরা তার মানসিক শক্তির প্রচুর প্রশংসা করল, নিষিদ্ধ বিষয়গুলির উপর মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা হল, কিন্তু তার নিন্দুকরা বিরুদ্ধ-যুক্তি দিল যে তিনি শুধু বিরক্তি সৃষ্টি করেছেন মাত্র, উত্তেজনার আগুন জ্বেলেছেন এবং সামাজিক সংবদ্ধতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। মনে হল প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যেন তার দেশ জার্মানীর এক অলৌকিক চেতনা, একা গত কয়েক বছর ধরে সংহতির উপর আলোচনাকে প্রভাবিত করে চলেছেন, যদিও সামান্য কিছু সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু কোন সমাধান দিতে পারেননি। সারাজিন একটা আবেগের ঝড় তুলেছেন—আমার মতে, তার তত্ত্বে সামান্য একবিন্দু সত্য

আছে বলে নয়, অসংখ্য জার্মানের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের উপর তিনি হৃদয়স্পর্শী দাগ কাটতে পেরেছেন। সমস্যার উভয় দিকে—মুসলিম এবং মুসলিম-বিরোধী গ্রুপগুলি ঐক্যবদ্ধ, স্পষ্টতই, সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচারের কারণে।

উত্তেজিত সারাজিন সমর্থকরা বলতে শুরু করল, "অবশেষে একজন ইসলাম সম্বন্ধে সত্যি কথাটা বলেছে!"—সর্বক্ষণ তারা লেখকের পক্ষে ছিল, যদিও তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই তার বইটি পড়েছিল। উত্তেজনার কারণে তারা স্বতস্ফূর্তভাবে বলতে শুরু করল যে সব সংবাদ মাধ্যমই সমান; সবসময় ইসলামের ভাবমূর্ত্তি রক্ষায় এবং তার হিংসা ঘটানোর ক্ষমতাকে চাপা দিতে ব্যস্ত। বর্তমানে জার্মানীতে কাউকে এমন সমালোচনা করতে দেওয়া হয় না, সারাজিন এবং অন্যান্য যারা সে চেষ্টা করেছিল তাদের স্তব্ধ করে দেওয়া হল।

মুসলিমরা বলতে শুরু করল, "আমরা নিজেদের খুবই অবাঞ্ছিত মনে করি"; যেন তারা বহু বছর অপেক্ষা করছিল সারাজিনের মতো কারও উপর ক্ষোভ উগরে দেওয়ার। এরা নিশ্চিত যে সংবাদমাধ্যম ইসলামভীত (Islamofobic) কারণ সারাজিনের সমর্থকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দমিয়ে রাখা। ওদের অভিযোগ সংবাদসংস্থাগুলি ইসলামের বিষয়ে মিথ্যা অপপ্রচার করে। তারা দাবি করল সারাজিনকে নিয়ে তৈরী করা গোলমাল প্রমাণ করে, হয় জার্মানীর সংহতির সমস্যা একটা মিথ্যা গল্প অথবা তিনি একটা মিথ্যা সমাধানের জন্ম দিয়েছেন।

সারাজিন অবশ্যই একটা ধাক্কা দিতে পেরেছেন—প্রকৃতপক্ষে, একটা নয়, দু'টো। প্রথম, তিনি এবং তার পক্ষের লোকেরা ইউরোপীয় মুসলিমদের ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রবণতাকে আঘাত করতে পেরেছেন, যারা নিজেদের শিকার হিসাবে দেখাতে চায় এবং এমন ঘৃণিত কাউকে খোঁজে যার উপরে তাদের হতাশা উগরে দেওয়া যায়। বর্তমানে এটা একটা প্রথা হয়ে উঠেছে—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাসাম টিবি (Bassam Tibi) একসময়ে এমন একজন মানুষ ছিলেন, তারপর সমাজবিজ্ঞানী নেকলা কেলেক (Necla Kelek)। শেষপর্যন্ত মুসলমানরা সারাজিনকে খুঁজে পেয়েছে একজন জার্মানী-জাত জার্মানকে যে একটা প্রমাণ, তারা মুসলমানদের তাড়িয়ে দিতে চায়।

দ্বিতীয়, একই ভাবে তার বক্তব্য ধাক্কা দিয়েছে জার্মানদের ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তাহীনতাকে। যারা ষাটোর্ধ তারা তার বক্তব্যকে গ্রহণ করল বিশেষ আগ্রহের সাথে, কারণ তারা কদাচিৎ অতীতে এসব বিতর্কে যোগ দিয়েছে। তারা ব্যস্ত ছিল অবসর জীবনের পরিকল্পনাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমানের বয়স্ক মানুষরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে যথেষ্ট সুস্থ, অনলাইনে দীর্ঘসময় কাটানোর কারণে অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ, এবং যৌবন ও সাফল্যমণ্ডিত সংস্কৃতিতে সমাজিক-রাজনৈতিক যুদ্ধে আগ্রহী। ফলে তাদের ছুটি কাটানো বা এখানে-ওখানে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কয়েক ঘন্টা কাজ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তাদের জীবন স্থবির কিন্তু তাদের চারপাশের পৃথিবী দুরন্তবেগে ধাবমান। একসময়ে তারা তাদের সমাজকে নাড়া দিয়েছিল, তবু এখন প্রতি পদক্ষেপে তারা মুখোমুখি হয় বিদেশী মুখ এবং বিদেশী ভাষার। হঠাৎ করেই বহু-সংস্কৃতি যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এক অলীক ভয় তাদের ঘিরে ধরে যে একসময় যেসব জিনিসকে তারা ভালবাসত তা হারিয়ে যাচ্ছে। তারা আর তাদের ইতিহাস এবং পরিচিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। এটা এমন একটা পরিবর্তন নয় যে, ভীত হয়ে আত্ম-বৈশিষ্ট্য বাঁচাতে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

জার্মানরা—অন্তত এই জার্মানরা—এক হতাশার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। প্রস্তাবিত স্টুটগার্ট ২১ রেলের বিরুদ্ধে পরিবেশগত কারণে প্রতিবাদ জেগে উঠল, প্রতিবাদকারীদের গড় বয়স লক্ষ্যণীয়ভাবে বেশী। তাদের অধিকাংশই এই দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের ফলাফল দেখা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে না। ইসলামি বিশ্বে সন্ত্রাসী আক্রমণ এবং গৃহযুদ্ধের খবর বর্তমানের সংবাদ মাধ্যমে একটা নিয়মিত ব্যাপার, ফলে এই বয়স্ক প্রতিবাদকারীদের, যারা জনমনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম, প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। তাদের অভিযোগ, “এখন তারা (মুসলমানরা) চায় বড় বড় মসজিদ গড়তে!”

হয়ত নিন্দাত্মক—তবে সারাজিনের বই সফলভাবে এই ভয় এবং হতাশাকে ন্যায্য প্রমাণ করেছে। স্বদেশীয় জার্মানদের মধ্যে তার সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই তুলনা টেনে আনে জার্মানীর তুর্কী জনগণের মধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রিসেপ তায়ইপ এরদোগানের (Recep Tayyip Erdogan) সাফল্যের সাথে। ২০০৩ সালে এরদোগান

যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন ইসলামি তাত্ত্বিকরা তাকে সম্মানিত করেছিলেন একজন উদারপন্থী বলে—এই অভিধা আমি কখনো মানতে পারি না। আমি মনে করি ইসলামপন্থা এবং উদারনীতি একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না। আশা করা গিয়েছিল রাজনৈতিক এবং আর্থিক বাস্তবতা এরদোগানকে বাস্তবমুখী ও কর্মতৎপর করে তুলবে। ইসলামপন্থীরা ক্ষমতালাভের আগে পর্যন্ত নিজেদেরকে শান্তিকামী, উদারপন্থী হিসাবে তুলে ধরে। কিন্তু ক্ষমতালাভের পরেই কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, ধর্মান্ধদের বহিষ্কার করে, কারণ তারা বিশ্বাস করে সমসত্ত্ব, সম্পূর্ণ আবদ্ধ সমাজে। এরদোগানের মত নেতারা ক্ষমতা হাতে পেলেই তাদের মুখোশ খসে পড়ে।

তুরস্কের প্রসিডেন্টের লক্ষ্য শুধু দেশের রাজনৈতিক প্রণালী এবং অর্থনীতি পরিচালনা করাই রইল না (প্রকৃতপক্ষে সেটাই হওয়া উচিৎ ছিল), তিনি গোটা সমাজকে নতুন করে শিক্ষিত করতে চাইলেন, নতুন নতুন নগর পত্তন করতে চাইলেন এবং নাগরিকদের সামাজিক এবং নৈতিক আচরণের উপর পুলিশী নজরদারি শুরু করলেন। নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন কে কোথায় বাস করবে বা কাকে ভালবাসবে—যা আজ অবধি চলছে। তিনি বিক্ষোভকারীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালালেন, তাদের অপরাধী এবং অবিশ্বাসী অভিহিত করলেন, সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করলেন তার পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের সমালোচনা করার কারণে। পৃথিবীর কোন দেশে তুরস্কের চেয়ে বেশী সাংবাদিক জেলে নেই, ২০১২ সালে জেলে ছিলেন ছিয়াত্তর জন—যা রাশিয়া, ইরাণ বা চীনের থেকেও অধিক। হাজার হাজার কর্মী এবং বুদ্ধিজীবিকে জেলে পাঠানো হল। তাদের মধ্যে কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা সন্ত্রাসী দলের সদস্য। তারা হয়তো এরদোগানের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন বা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন।

এরদোগান যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন দেশের বাইরে যে তুর্কীরা আছে তাদের প্রভাবিত করতে। ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এ কোলোনে ল্যাঙ্কসেস এরেনাতে (Lanxess Arena) তাকে যেমন জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল তা অনেকটা সেপ্টেম্বর ২০১০ এ মিউনিখের হাউস অব লিটারেচারে (House of Literature) সারাজিন যে বজ্রধ্বনিতুল্য

অভিনন্দন পেয়েছিলেন তারই মতো। উভয়েরই সমর্থকরা তাদেরকে রক্ষাকর্তা এবং পরিচয়ের উৎস বলে মনে করেছিল।

আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সীদের এরদোগানের অতি পছন্দ। যা স্পষ্ট ২০০৮ সালের সফরে তার নির্দেশমূলক শিক্ষার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে। আলোচ্য যুবকেরা জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেছে, সে দেশের স্কুলে পড়াশোনা করেছে, এবং তাকে তাদের নিজের বাড়ী বলেই মনে করে। তবুও একই সাথে তারা নিজের দেশে নিজেদের বিদেশী বলে মনে করে এবং ইসলামের ভাবমূর্ত্তি সংকটের কারণে এবং তুর্কীদের প্রতি জার্মানদের আচরণে ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরদোগান তাদের আশ্বস্ত করলেন, যেন প্রতিশ্রুতি দিলেন যদি তাদের সমাজ তাদের ত্যাগ করে তাহলে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে তাদের বুকে তুলে নেবেন।

যদিও ইসলামপন্থীরা যোগ দেয়নি, বহু জার্মানীতে জন্মানো তুর্কী তার সফরে উৎসব করল। তারা এরদোগান এবং তার পার্টি AKP-কে আশার আলো ভেবেছিল, হয়তো ইসলাম এবং গণতন্ত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তারা তার রাজনীতি এবং সরকারে একনায়কতন্ত্রের নিঃশব্দ উপস্থিতি দেখতেই পেল না। আজকের তুরস্কে আর ইসলাম এবং গণতন্ত্রের বিবাহবন্ধন টিকে নেই, যা একসময়ে ছিল। এ হয়ে উঠেছে অল্পমাত্রার ইসলামি ফ্যাসিবাদের বাসভূমি, এবং প্রবল সম্ভাবনা আরও বেশী মৌলবাদী হওয়ার। সিরিয়াতে ইসলামপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এরদোগানের ভূমিকা এখনও খুব একটা প্রচারিত হয়নি। এরদোগান সরকারের দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে জার্মানীর মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া প্রায়ই উদারপন্থী এবং কট্টর ইসলামপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ করে দেয়। প্রথমপক্ষ পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের কথা বলে, অপরপক্ষ—জিহাদী এবং সালাফিরা—বলে এরদোগান আল্লাহর বিচারে ভয়ঙ্কর শাস্তি পাবে শরীয়া প্রয়োগ না করার জন্য, যার মধ্যে আছে মদ এবং পতিতাবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা।

সারাজিন এবং এরদোগান উভয়েই নিজের নিজের দেশে তাদের সমর্থকদের বাস্তব জীবনের দুর্বল বিকল্প দিয়েছেন। যদিও কারও মতই জার্মানীর প্রকৃত সমস্যার উপর আলোকপাত করে না। জার্মানীতে কমপক্ষে তিনটি স্পষ্ট সামাজিক গ্রুপ আছে যারা একে অন্যকে প্লেগের

মত এড়িয়ে চলে। পৃথকভাবে বাস করা ভাল, যখন মানুষ নিজে বাঁচে এবং অন্যকেও বাঁচতে দেয়। কিন্তু এখানে সারা দেশের সমাজের ভাঙ্গন আদর্শগত কারণে, তার সাথে আছে পারস্পরিক অসন্তোষ।

অতি প্রাচীন, অপ্রচলিত, এবং তীব্র ধর্মীয় ব্যবস্থায় অভ্যস্ত অভিবাসীদের সংস্কৃতি এক মানসিক দেওয়াল তুলে দিয়েছে তাদের এবং তাদের সন্তানদের ও চারপাশের সমাজের মধ্যে। কারণ উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাগত এবং সামাজিক দক্ষতা কোনটাই তাদের নেই। সেই সঙ্গে জার্মানীর সংখ্যালঘু উচ্চবিত্তরা চায় তাদের সন্তানদের যেন "অভিবাসী সমস্যা"য় পড়তে না হয়। তারা সন্তানদের অল্পসংখ্যক ব্যয়বহুল স্কুলে পাঠায় এবং কখনো কখনো সমাজে ইসলামীকরণের প্রতিবাদ করে ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান হিসাবে। তারা বহুসাংস্কৃতিক সমাজের মুখোমুখি হতে চায় না এবং আঁকড়ে ধরতে চায় রোমান্টিক জার্মানীকে যেমন ছিল উনবিংশ শতকের শেষভাগে।

খ্রীষ্টান স্কুলগুলি আরও বেশী সংখ্যায় ছাত্র ভর্তি করছে, কারণ বেতন-প্রদেয় স্কুলগুলি ব্যয়ভার অধিকাংশ অভিবাসী পিতা-মাতারাই বহন করতে পারে না। উভয় ঘটনাই এক ধরণের সামাজিক শোধন এবং অভিজাতদের পৃথকীকরণ। একই সাথে, ক্রমবর্ধমান বেসরকারী তুর্কী স্কুল জার্মানীর তুর্কী মধ্যবিত্তদের প্রয়োজন মিটাচ্ছে যেখানে বিশেষভাবে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হয়। যে শিশুরা "পবিত্র" শিক্ষা পরিবেশে বড় হয়—স্কুল ছাড়ার পর যখন বাইরের জগতে আসে, সেখানকার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার যোগ্যতা তাদের থাকে না। তাদের সামাজিক এবং বহুসাংস্কৃতিক দক্ষতাও থাকে না, যা বিশ্বায়নের যুগে কার্যকরী সমাজ এবং অর্থনীতির ভিত গড়ে।

আর কিছু যদি নাও হয়, আমি আশা করি জার্মান সমাজের তৃতীয় এবং বৃহত্তম নির্বাচনকেন্দ্র গঠিত হবে অভিবাসী এবং নন-অভিবাসীদের নিয়ে যারা সমস্যার সমাধান করতে জানে, চুপচাপ হজম করে না, এবং সারাজিন ও এরদোগানের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভবিষ্যতে কোন জায়গা থাকবে না। মনে হয় বর্তমানে এই তৃতীয় গ্রুপের প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা কমে গিয়েছে, যার ফলে সংবাদ মাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে না; কারণ উসকানিদাতারাই সংবাদ তৈরী করে। কিন্তু আমার

আশা, এই গ্রুপ ধীরে ধীরে বড় হবে, জার্মানীর জাতীয় মানসিকতাকে বিষমুক্ত করবে, সংহতি সৃষ্টির জন্য কোন বড়রকম চেষ্টা বা সরকারীভাবে কোন আলাপ-আলোচনা না করেই। চরম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে শেষতম উপায়। প্রকৃত সমাধান হল শিক্ষার জন্য কার্যকরী নীতি এবং সারাদেশে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, অল্পবয়সীদের শিক্ষিত করা যাদের মেধার উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

বিশ্বায়নের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে চোখ ফেরালে সৃষ্টিশীলতা স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবকিছু বাদ দিয়ে সান্ত্বনা বা নিরাপত্তার অনুভূতির মাধ্যমে প্রাচীন ধর্মব্যবস্থা বা জাতীয় পরিচিতি থেকে কিছুই আসবে না। ভবিষ্যৎ নির্ভর করে উদার বহু সংস্কৃতির উপর। যারা সামাজিক শোধনে যুক্ত হয় এবং নিজেদের সংস্কৃতি এবং ধর্মকে ঘিরে উঁচু দেওয়াল তোলে তারা তাদের অবস্থানকে বহুকাল আগেই ধ্বংস করে ফেলেছে।

অধ্যায় ১২

সন্ত্রাসী এলাকার মানচিত্র - ইসলামপন্থা, ইসলাম এবং ইসলামি রাষ্ট্র

কিছু মানুষ ইসলামি ফ্যাসিবাদকে অঙ্গীভূত করেন ইসলামিক স্টেটের (IS) সাথে যে মতবাদ হত্যার সীমাহীন তৃষ্ণা নিয়ে সংখ্যালঘুর উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে, মানব সমাজের বাকী অংশের প্রতি গভীরতম ঘৃণা নিয়ে এক কাল্পনিক ধর্মীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে। আধুনিক পৃথিবী দেখছে নতুন বিশ্বব্যাপী জিহাদকে যার মাধ্যমে ইসলামের চরম মানসিকতা উন্মোচিত। যারা এই লড়াইএ যোগ দিয়েছে তারা সত্যিকারের ইসলাম পালন করে অথবা নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে; অত্যাচারের আতঙ্কটা রয়েই যায়। বর্তমান আরবে রাজনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য তীব্র উগ্রবাদের সাথে মিলে ইসলামকে টাইম বোমা বানানোর ভয় দেখাচ্ছে— অধিকাংশ মুসলমান হয়ত তা হতে দিতে চায় না, কিন্তু অন্যেরা মনে করে হিংসাত্মক কাজ প্রয়োজন স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য।

ইসলামি হিংসা এগিয়ে আসছে

২০১৪-এর গ্রীষ্মে ইসলামিক স্টেট যখন ইরাকে প্রবেশ করে, এর সমর্থকরা একটা কাল্পনিক বিশ্ব-খেলাফত রাষ্ট্রের মানচিত্র প্রকাশ করে, আর দাবি করে যেখানে যেখানে মুসলিমরা কখনো বাস করেছে তা সবই পাঁচ বছরের মধ্যে ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐ তালিকায় ছিল এশিয়ার অর্ধেক, আফ্রিকার তিন-চতুর্থাংশ, পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশ এবং স্বাভাবিক ভাবেই আন্দালুসিয়া। এটা কিভাবে সম্ভব হবে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, এর একজন সৈনিক বলেন ইসলামের বিজয় হবে না, “ছিন্নভিন্ন দেহ এবং থ্যাঁতলানো মুণ্ডু ছাড়া”। একটি শ্রুতি ভাষণে, সংগঠনের স্বঘোষিত খলিফা আবু বকর আল-বাগদাদি পরে দাবি করেন, বিশ্বব্যাপী জিহাদ জেগে উঠবে।

ইসলামিক স্টেটের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বলে, অবাধ নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের পথ বদলে দেবে, পৃথিবীতে নিয়ে আসবে আল্লাহর শাসন।

কেউ বলতে পারেন মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য পৃথিবী জয়ের আশায় যুদ্ধ করতেই পারে, কিন্তু প্রকৃত বিপদ অন্যত্র। রাজনৈতিক ইসলাম তার খুনী বাহিনীর মতোই একই ধারণা পোষণ করে। সকল মুসলমানের মনে বিশ্বজোড়া খলিফাতন্ত্রের মূর্ত্তি খোদিত, যা সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বাসের সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। অধিকাংশ আধুনিক মুসলমান হয়ত ইসলামিক স্টেট এবং তার নিষ্ঠুর কর্মপদ্ধতিকে অস্বীকার করতে পারে কিন্তু ভোট নিলে দেখা যায় বিশাল সংখ্যক মানুষ খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং শরীয়া আইনের প্রয়োগ চায়।

কাল্পনিক ধর্মীয় রাষ্ট্রের সমার্থক ইসলামিক স্টেট সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একবিংশ শতকের সিরিয়া এবং ইরাক সম্পূর্ণ ব্যর্থ রাষ্ট্র যেখানে জাতীয়তাবাদ এবং সমস্ত আরব রাষ্ট্রের ঐক্যসাধনে সময় ব্যয় হয়েছে কিন্তু গণতন্ত্র সেখানে অধরাই থেকে গেছে। নবীর প্রকৃত রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টার জন্য এই রাষ্ট্রগুলি উর্বর ক্ষেত্র। বলা হয় মহম্মদ ইসলামিক স্টেটের মতোই একটি মানচিত্র তৈরী করেছিলেন, চিঠি পাঠিয়েছিলেন বাইজান্টাইন সম্রাটকে, পার্সিয়ার সাসানীয় শাহ্কে, মিশরের রোমান শাসককে, এবং আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজাকে; প্রত্যেককে বলেছিলেন, “ইসলাম কবুল কর, নিরাপদে থাকবে”। তার মৃত্যুর পর ঐ সব অঞ্চলের অধিকাংশই ইসলামি শাসনের অধীনে আসে।

বর্তমানে বহু মুসলমান মনে করে ক্ষমতা গ্রহণের স্বপ্ন তাদের অক্ষমতা দূর করে দিয়েছে—এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, হাজার হাজার যুবকের ইউরোপ থেকে সিরিয়া এবং ইরাকে যাওয়া। আরব বসন্তের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, এক ভয়ানক ধর্মীয় আক্রমণ উঠে আসছে। নিজের দেশে যে মুসলিমরা নগণ্য ব্যক্তি ছিল—মিশর,তিউনিসিয়া, চেচনিয়া, বা জার্মানীর মতো ইউরোপীয় দেশে—তারা ছুটে আসছে ইসলামিক স্টেটের পক্ষে যুদ্ধ করতে। আল-কায়েদা আত্মঘাতী বোমারুদের প্রশিক্ষণ দিত, কিন্তু ইসলামিক স্টেট সৈন্য সংগ্রহ করে, উৎসাহিত করে আগ্রাসী যুদ্ধে বিশ্বজয় করতে, শত্রুপূর্ণ একুশ শতক ত্যাগ করে সপ্তম শতকে ফিরে যেতে। যাদের কোন শিক্ষা নেই এবং দেশে কোন ভবিষ্যৎও নেই, সেইসব সৈন্যরা ইরাকের ছোট শহরে শাসক হতে

পারে এবং সুলতানের মতো শাসন করতে পারে, ইচ্ছামতো ক্ষমা করতে পারে আবার মৃত্যদণ্ডও দিতে পারে এবং জীবন-মৃত্যুর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর হয়ে জীবন কাটাতে পারে। এই ক্ষমতার সুযোগ এতটাই প্রলোভন সৃষ্টিকারী যে ইসলামিক স্টেট কয়েক মাসের মধ্যে গোটা ইরাক এবং সিরিয়া দখল করে, ঠিক সপ্তম শতাব্দীর মুসলমানরা যেমনটি করত।

জ্ঞান, শিক্ষা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যতীত যা মহম্মদের অনুসারীদের সামরিক সাফল্য এনে দিয়েছিল তা হল আল্লাহর প্রতি ভক্তি এবং ইচ্ছাপূরণ করা। কোরআন বলে, "তোমরাই মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দাবি কর ন্যায় এবং পরিহার কর যা নিন্দনীয়"। ইউরোপে শরীয়া সমর্থকরা প্রায়ই এই আয়াতটি বলে ঠিক সৌদি আরব, ইরাণ, উত্তর নাইজেরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ্ (Banda Aceh) রাজ্যের নৈতিক অভিভাবকদের মতো। এইসব লোকেরা নিজেদের মনে করে স্বর্গীয় আইনের প্রতিষ্ঠাকারী, সাধারণ মুসলমানরা ধর্মীয় আইনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় সাধারণত মুসলমানেরা যেমন করে থাকে; এটাও একটা কারণ যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের শহরগুলি ইসলামিক স্টেট দখল করেছে সামান্য কয়েক হাজার সৈন্যের সাহায্যে।

একটি বই এবং একটি তরবারি

ইসলামিক স্টেটের সৈন্যদের অভিযান জিহাদের একটি নতুন দিক তুলে ধরে। মসুলে আল-বাগদাদি তার একমাত্র প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছিলেন, "আমি তোমাদের নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেব না যেমন অন্য শাসকেরা প্রজাদের দিয়ে থাকে। আমি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেব যা আল্লাহ কোরআনে আমাদের দিয়েছেন: পৃথিবীতে বিশ্বাসীরাই হবে তাঁর সেনা"। আল-বাগদাদি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলেছেন, জানিয়েছেন, "কোন ইসলামি রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে একমাত্র যখন আল্লাহর আইন পালিত হয়। তার জন্য আমাদের চাই শক্তি এবং ক্ষমতা, একটি বই আমাদের সেই পথ দেখাতে পারে, এবং একটি তরবারি পারে আমাদের ধর্মকে জয়ী করতে"।

বর্তমান সময়ে ঐ তরবারির নাম ইসলামিক স্টেট, বইটির নাম কোরান যেমন চিরকালই আছে। পৃথিবীর মানচিত্রে এক নজরেই দেখা যায় ইসলামিক স্টেট অসংখ্য ইসলামপন্থী সংগঠনের অন্যতম যার আদর্শ অনুসরণ করে অধিকাংশ ইসলামি সংগঠন। এর খলিফাতন্ত্রের ধারণা গোটা আরব বিশ্বে প্রতিধ্বনিত। লিবিয়া এবং আলজেরিয়ার ইসলামপন্থীরা বাগদাদির নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং সিনাই উপদ্বীপের সন্ত্রাসী গ্রুপ আনসার বেইট আল-মাকদিস (Ansar Bait al-Maqdis) নভেম্বর ২০১৪-তে ইসলামিক স্টেটের মিশরীয় শাখায় পরিণত হয়েছে। সংগঠনটি বিশাল সমর্থন পায় সৌদি আরব, ইয়েমেন, লেবানন, জর্ডন থেকে এবং এর অধিকাংশ যোদ্ধা আসে তিউনিসিয়া থেকে, আরব বসন্তের জন্মভূমি।

পৃথিবীর অন্যত্র থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বায়ন তিন ধরণের প্রতিক্রিয়া পেয়েছে—এশিয়া থেকে সৃষ্টিশীল, আরব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং আফ্রিকা থেকে নিষ্ক্রিয়। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো ইসলামি দেশগুলি প্রথমটির সুফল লাভ করেছে সর্বপ্রথম, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আধুনিকতা সম্ভব হয়েছে তাদের জাতিগত সংস্কৃতি এবং বৈচিত্রের কারণে, যদিও এই দেশগুলির প্রভাব ইসলামের আরবী কেন্দ্রবিন্দুর উপর দুর্বলই রয়ে গেছে। এমনকি কিছু দেশ অস্থির মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে আমদানী করেছে শরীয়া এবং জিহাদ।

মালয়েশিয়ার কিছু অংশে মুসলিম-অমুসলিম সহাবস্থান দিন দিন বিপন্ন হয়ে উঠছে ইসলামি আইন চালু করার জন্য ধর্মীয় চাপের কারণে। ইন্দোনেশিয়াতে ইতিমধ্যেই শরীয়া আইন প্রথম প্রযুক্ত হয়েছে বান্দা আচেহ্ রাজ্যে ১৯৯৯ সালে। প্রাথমিকভাবে চালু হয় পোষাক-বিধি এবং পারিবারিক আইন দিয়ে, কিন্তু ২০০৯ সালে অপরাধ আইনও তার সাথে যুক্ত হয়। সমকামিতা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বিভেদ ভঙ্গের শাস্তি বেত্রাঘাত; ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুঁড়ে হত্যা। আচেহে শরীয়া পুলিশের নজরদারি এবং পাপীদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা অপরিসীম। ২০০২ সালে ‘বালি’তে বোমাহামলা কাণ্ডের জন্য দায়ী সন্ত্রাসী গ্রুপ জেমাহ্ ইসলামিয়াহ্ (Jemaah islamiyyah) এক নবজাগরণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর নেতা আবু বকর তার দলের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আল-বাগদাদিকে খলিফা এবং ইসলামিক স্টেটের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ২০১৪ এর

জুলাইয়ে, এবং তার জন্য পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। ফিলিপাইনের সন্ত্রাসী দল আবু সায়াফ (Abu Sayyaf) থেকে পলাতকরা এবং আফগান যুদ্ধবাজরা ড্রাগ ব্যবসা থেকে প্রচুর মুনাফা করছে ইসলামকে ব্যবহার করে, প্রমাণিত হচ্ছে জিহাদকে ধর্মীয় হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইসলামপন্থী গ্রুপগুলির নিষ্ঠুরতা থেকে বোঝা যায় অত্যাচারিতদের ক্রোধ, অবশ্য আফ্রিকাতে যা ঘটে তার মতো অতটা প্রকাশ পায় না। মহাদেশটি আজও বিশ্বায়নের লাভ অর্জন করতে পারেনি। চীন এবং পাশ্চাত্য দেশগুলি আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, কিন্তু উভয়েই তাদের দেশের বাজারকে আফ্রিকা থেকে রপ্তানির জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। আফ্রিকাতে কেউই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র মৌলবাদী ইসলাম আফ্রিকার ক্রোধকে মানে। আফ্রিকাতেও খলিফাতন্ত্রের স্বপ্ন আশাহীন বাস্তবতা থেকে বাঁচার পথ দেখায়। এর নগ্ন উদাহরণ বোকো হারাম, একটি সন্ত্রাসী দল যারা একসময়ে শুধু পুলিশ স্টেশন এবং সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ করত, তারা তাদের আক্রমণ তীব্রতর করে যখন ২০০৯ সালে এর প্রতিষ্ঠাতা উস্তাজ মোহামেদ ইউসুফ (Ustaz Mohammed yusuf) নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা নিহত হয়। এর বদলা হিসেবে ২০১১ সালে এক আত্মঘাতী বোমারু আবুজাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নাইজেরীয় প্রধান কার্যালয় ধ্বংস করে। এই হামলায় দশ হাজারেরও বেশী মানুষ নিহত হয়। তবুও সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞরা এই বিপদকে গুরুত্ব দেয়নি। পাশ্চাত্য একমাত্র তখনই বিপদকে স্বীকার করল যখন বোকো হারাম ২৫০ এরও বেশী খ্রীষ্টান মেয়েকে (স্কুলছাত্রী) অপহরণ করল।

এটাই আল্লাহর ইচ্ছা

ইসলামিক স্টেটের পথেই বোকো হারাম তার নিজস্ব খলিফারাজ ঘোষণা করেছে নাইজেরিয়ার উত্তরপূর্বে বোর্নো রাজ্যে। উত্তর নাইজেরিয়া সবসময়েই ইসলামপন্থীদের দেশ, কিন্তু বোকো হারাম একটু নতুন ধরণের, যার বিভিন্ন অংশ সারা দেশ জুড়ে সক্রিয় এবং এর সদস্য সংখ্যা ২৮০,০০০। এই গ্রুপটি প্রায় বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত। সোমালিয়ার আল-শাবাব (al-shabaab) জঙ্গীগোষ্ঠী, মালিতে আনসার ডাইন (Ansar Dine),

কেনিয়া এবং ইরিত্রিয়ার ইসলামপন্থী গ্রুপগুলির সাথে যুক্ত। তবুও ইসলামিক স্টেট নাইজেরিয়ার ইসলামপন্থীদের প্রতি আল-কায়েদার থেকেও বেশী আগ্রহী।

সারা বিশ্বে আল্লাহর নামে সন্ত্রাস চলছে বহু দেশের সীমানা পেরিয়ে, জঙ্গী ইসলামবাদ সুযোগ নিচ্ছে জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত ভিন্নতার। এ যেদিকেই তাকায় এর ভাবনা একই প্রকার, এবং কর্মপদ্ধতি একই রকম নিষ্ঠুর। একসময়ে জিহাদি গ্রুপগুলির নিজস্ব কর্মসূচী ছিল, এখন একে অপরের এলাকায় ঢুকছে এবং সমর্থক সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করছে। ইসলামিক স্টেট একটি বিশেষ উদাহরণ যারা দ্রুত সামরিক এবং সংবাদ মাধ্যম জয়ের দ্বারা আল-কায়েদার মত প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলিকে কোণঠাসা করে দেয়। পাকিস্তান এবং আলজেরিয়াতে ইসলামপন্থীরা আল-কায়েদা থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসে ইসলামিক স্টেটে যোগ দিচ্ছে। নতুন একটা সেপ্টেম্বর ১১ না ঘটাতে পারলে আল-কায়েদা, যে সম্প্রতি ভারতীয় শাখা গঠনের ঘোষণা করেছে, নিজেই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমরা কি ইসলামকে ভয় করব? প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামপন্থী, যারা একই আল্লাহর এবাদত করে, তাদের পারস্পরিক শত্রুতার কারণে সম্ভাবনা আছে রসদ ও অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থতার, সেই কারণেই নতুন ক্ষতি করতে পারে। একই সাথে এই গ্রুপগুলির মধ্যে অনৈক্যের কারণে যুদ্ধ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়বে। তবে যদি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে ইসলামিক স্টেট তুচ্ছ হয়েও যায়—যেমন আল-কায়েদার ভাগ্য ঘটেছে—এর আদর্শ এবং মানসিকতা, যা আনুগত্যের জীবন দাবি করে, কল্পনার মধ্যে হলেও বেঁচে থাকবে। ইসলামিক স্টেট বলে "এটাই আল্লাহর ইচ্ছা, আর কোন পথ নেই"।

আরবী শব্দ ইসলাম –এর আক্ষরিক অর্থ "আত্মসমর্পণ", এবং আজও অসংখ্য মুসলমান বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের কাজ এবং চিন্তার উপর নজরদারি করে, প্রতিটি অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেয়। অবশ্যই কিছু মানুষ তাদের ধর্মীয় আইন মেনে চলে, কিন্তু অনেকেই নিজেদের পাপী বলে মনে করে। ঐশ্বরিক শাস্তির ভয়ে তারা নিজেদেরকে পাপমুক্ত করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই তীব্র ইচ্ছা তাদের দাস-মনোভাবাপন্ন করে

তোলে। আধুনিকতার একটি বড় সাফল্য শাস্তিদানকারী ঈশ্বরের ধারণা থেকে মুক্তি দেওয়া। সভ্যতার আলোক খ্রীষ্টানদের দাস-মনোভাব ভেঙ্গে মুক্ত করেছে—যা স্বাধীনতা এবং বিশ্লেষণী চিন্তার প্রাথমিক শর্ত। যাকে মুসলিম রক্ষণশীলরা পরিত্যাগ করে চলে, তারা মনে করে আল্লাহ্র আনুগত্য করাই জীবনের একমাত্র অর্থ। এইরকম ভাবনার প্রতি শিশুর মতো আনুগত্য সকল প্রকার সামাজিক অগ্রগতিকে পঙ্গু করে দেয়।

ইসলামপন্থীদের ভয় করার যথেষ্ট কারণ আছে যেমন বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব ফ্যাসিবাদীদের ভয় করত। ফ্যাসিবাদ তার নিজেরই সামরিক অভিযানে পরাজিত হয়েছিল। এর পুনরুত্থানের সম্ভাবনার আগেই এর আদর্শকে নীতিগতভাবে এবং সামরিকভাবে নিঃশেষ করা প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের প্রয়োজন হয়েছিল মার্শাল প্ল্যানের, বর্তমানের অধিকাংশ ইসলামি দেশের তেমনই কিছু প্রয়োজন। তবুও তাদের অবশ্যই ধর্মীয় হিংসার তত্ত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। যদি জার্মানরা মনে করত হিটলার এবং তার সহযোগীরা খারাপ হলেও তাদের জাতিগত বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত ছিল, ফ্যাসিবাদকে কখনই পরাজিত করা সম্ভব হতো না। ঠিক তেমনি, বর্তমান মুসলমানদেরও নিজেদের ইসলামের একনায়কতান্ত্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হবে।

অবশ্যই ইসলামপন্থার সব বৈশিষ্ট্যই ধর্মীয় নয়। কিন্তু যে হিংসাত্মক ধর্ম আজ পৃথিবীকে অত্যাচার করছে তাকে ধ্বংস করতে গেলে প্রথমেই বাস্তবের মুখোমুখী হতে হবে যে, এটা ইসলামের ফসল।

খ্রীষ্টধর্মের উপরে কর ধার্য

ইরাকী টেলিভিসন আশ্টার টিভিতে একজন খ্রীষ্টান যুবতীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল, যে মেয়েটি মসুল থেকে কুর্দিশ শহর আরবিল-এ পালিয়ে এসেছে। সবকিছু হারানোর পরেও সে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে কারণ সে বেঁচে আছে। সে বর্ণনা করছিল কিভাবে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধারা তার বাড়ী আক্রমণ করেছিল, তারা তার পরিবারকে চারটি বিকল্প দেয়: চলে যাও, জনকর দাও, ইসলাম কবুল কর, অথবা মর। কোন কিচ্ছু না নিয়ে, এমন কি পাশপোর্টও না নিয়ে সে পালিয়েছিল কারণ তার প্রাক্তন বাড়ী ইসলামিক স্টেটের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। সাক্ষাৎকারের

সময় মেয়েটি জিহাদিদের উদ্দেশে রাগ-ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছিল: "কোরআন কি অনাহূতভাবে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেনি?" সে বলছিল, খ্রীষ্টানদের এভাবে কুকুরের মতো তাড়ানো নবী মহম্মদের আদেশ বিরোধী। একটু পরেই আর একজন খ্রীষ্টান শরণার্থী বলে ওঠে, "এটা প্রকৃত ইসলাম নয়!"

নয়?

তাহলে প্রকৃত ইসলাম দেখতে কেমন?

ইরাক এবং সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধা সংখ্যা কুড়ি থেকে একত্রিশ হাজারের মধ্যে, অথচ একা মসুলেই দশ লক্ষেরও বেশী মুসলমান বাস করে, এবং তাদের অনেকের কাছেই অস্ত্র আছে। তাহলে তাদের খ্রীষ্টান প্রতিবেশীদের বিপদের সময়ে কেন একজন "প্রকৃত" মুসলমানকেও দেখা গেল না? তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে "প্রকৃত ইসলাম" তখনই উচ্চারণ করা হয় যখন ইসলামের নামকে পরিচ্ছন্ন দেখানোর প্রয়োজন হয়?

হায়! খ্রীষ্টানদের প্রতি ইসলামিক স্টেটের আচরণের সর্বাংশে সমর্থন আছে ইসলামের। কোরআন, নবীর হাদিস এবং ইসলামি অভিযানের ঘটনা এ সবকিছুতেই এদের কাজের উদাহরণ আছে। সূরা ৫৯-এ মহম্মদ আদেশ করেছেন ইহুদীদের, "যারা অবিশ্বাসী", তাদের বাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে; এবং মৃত্যুর আগে নবী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন "আরবকে ইহুদী এবং খ্রীষ্টান মুক্ত করবেন। মুসলমান ছাড়া আর কেউ ঐ অঞ্চলে থাকতে পারবে না। এমন কি ইসলামিক স্টেট খ্রীষ্টানদের থেকে জোর করে যে কর আদায় করছে, তারও ভিত্তি আছে কোরআনে। সূরা আত তাওবাহ (৯ নং সূরা)-এ আছে, "যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে না…যতক্ষণ না তারা স্বেচ্ছায় নতমস্তকে জিজিয়া (Jizyah-কর) দেয়"।

মহম্মদের মৃত্যুর পর স্বল্পকালের মধ্যেই তার উত্তরসূরিরা বর্তমান ইরাক, সিরিয়া এবং মিশর দখল করে, যেখানে অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিল খ্রীষ্টান। লক্ষ লক্ষ "অবিশ্বাসীদের" তাড়িয়ে না দিয়ে মুসলিম শাসকরা জিজিয়া কর চাপালেন প্রধান রাষ্ট্রীয় আয় হিসাবে, শুধু মাত্র ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের উপরেই নয়, জোরোয়াষ্ট্রিয়ানদের উপরেও। যারা তাদের

একেশ্বরবাদের শিক্ষা দিয়েছিল। জিজিয়া এবং বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার থেকে বাঁচতে বহু ইরাকি খ্রীষ্টান সপ্তম শতকের শেষভাগে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু শাসক আল-হাজ্জাজ (al-Hajjaj) তাদের জিম্মি (dhimmi- জিজিয়া-প্রদানকারী অ-মুসলিম) থাকতে বাধ্য করেন।

জিম্মি বিষয়ে আইনের সবথেকে প্রাচীন দলিল হল যেটি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবন আল-খাত্তাব (Umar ibn al-Khattab) বানিয়েছিলেন। যিনি ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম জয় করার পর খ্রীষ্টানদের সাথে একটি চুক্তি সই করেন, এতে তাদের চার্চ এবং বিশ্বাসকে মুসলিম নিরাপত্তার অধীনে অক্ষত রাখতে দিয়েছিলেন। ভয়াবহ একটি দেওয়া-নেওয়ার (quid pro quo) দাবি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টানদের জিজিয়া কর দিতে হবে, নতুন চার্চ তৈরী বা পুরানো চার্চ মেরামত করা যাবে না। ক্রুশ পরা, ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র বহন করা, মুসলিমদের বাড়ীর থেকে উঁচু বাড়ী বানানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সেই সঙ্গে পোষাক এবং চুলের স্টাইলের মাধ্যমে তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে (মাথার সামনের দিকের চুল কামিয়ে ফেলতে হবে এবং নোংরা হয়ে যাওয়া চুল সরিয়ে ফেলা যাবে না)। ইসলামিক স্টেট বর্তমানে খ্রীষ্টান বাড়ীগুলিতে 'N' অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করে (N = Nasrani, আরবীতে যার অর্থ খ্রীষ্টান), এটা মোটেই কোন নতুন বিষয় নয়। নবম থেকে একাদশ শতকে জনজীবনে শরীয়ার প্রভাব অনেকটা কমে আসে, জিম্মি আইন শিথিল হয়; তুলনামূলকভাবে একটি সহনশীল সহাবস্থানের অবস্থা ফিরে আসে। কিন্তু দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে ক্রুসেডের সময়ে মিশর এবং সিরিয়াতে খ্রীষ্টান-বিরোধী আইন আবার কঠিন হয়। পশ্চিমের খ্রীষ্টান অভিযানকারীদের অপরাধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের খ্রীষ্টানদের শাস্তি দেওয়া হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য তার বর্ণবৈষম্যমূলক বিচারব্যবস্থা বন্ধ করে, সৌদি আরবে জিম্মি আইন প্রয়োগ করা বন্ধ হয় কারণ মহম্মদের উত্তরসূরীরা ঐ এলাকা খ্রীষ্টান এবং ইহুদী মুক্ত করার উচ্চাশা পূরণ করে ফেলেছিল। বর্তমানে সিরিয়া এবং ইরাকের মসুলের মতো শহরগুলিতে ইসলামিক স্টেট খ্রীষ্টানদের থেকে ঠিক সেটাই চায় যা ইসলামের অতীত শাসকরা চেয়েছিল, তার বেশীও নয় কমও নয়।

আরবী ভাষার চ্যানেল RT (Russia Today)-তে এক সাক্ষাৎকারে নিকোডেমোস দাউদ মাট্টা (Nikodemos Dawuud Matta), সিরিয়াতে মসুলের গোঁড়া বিশপ, খ্রীষ্টানদের প্রতি ইসলামিক স্টেটের নিষ্ঠুরতার জন্য তার দুঃখ প্রকাশ করছিলেন, উল্লেখ করছিলেন সেখানে সংঘটিত গণহত্যা এবং জাতি নির্মূলকরণের কথা। সেখানে অনেক নরমপন্থী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, তারা এই অত্যাচারের নিন্দা করলেন এবং বললেন জিম্মিদের রক্ষা করা মুসলমানদের কর্তব্য। এই কথা বলা হচ্ছে ঠিক যেখানে এই সমস্যার মূল প্রোথিত: যখন অনুষ্ঠানের আরবীভাষী সঞ্চালক জিম্মি কথাটি উচ্চারণ করলেন, বিশপ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, প্রতিবাদ করে উঠলেন, "আমরা এই শব্দটাকে মানি না—আমরা দাস নই!" সে বেচারীকে সেই আপাত উদার মুসলিমদের বলতে হলো খ্রীষ্টানদের "জিম্মি" বা "অবিশ্বাসী" না বলতে। এতেই প্রমাণ হয় ইসলামিক স্টেটই ইসলামের একমাত্র সমস্যা নয়।

ইসলামপন্থা বনাম ইসলাম—পার্থক্য করা কি প্রয়োজনীয়?

এক সময়ে আমি বলেছিলাম ইসলামপন্থা এবং ইসলামের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন করতে হবে। ভেবেছিলাম এতে সাধারণ মুসলমানরা ঢালাও সন্দেহ থেকে রক্ষা পাবে। সময়ের সাথে আমার মনে হয় এতে অজ্ঞাতে ইসলামপন্থীদেরই সুবিধা করে দেওয়া হবে, অনেকটা ইসলামভীতি এবং উদার ইসলামপন্থার ধারণা যেটি করে থাকে। ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলার সাথে সাথে ইসলামপন্থীদের সমালোচনা করা যেন এমন কথা বলা যে রাজনৈতিক ইসলামের আদর্শ যথেষ্ট ভাল, শুধু এর সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন; এতে বাঁকা পথে একই বিতর্ক উসকানোর পথ সুগম হয়। পক্ষান্তরে, আমার মতে ইসলাম থেকে মুসলিমদের বিযুক্ত করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের অবশ্যই বহুমুখী ঐতিহ্য আছে, চিত্তাকর্ষকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুসারীরা তা পালন করে। সুফীরা সেনেগাল থেকে মালয়েশিয়া, শিয়ারা বাহরাইন থেকে ইরাণ, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে সুন্নীরা। এই তফাৎগুলি নৃবিজ্ঞানী, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে বিজ্ঞানী এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের আগ্রহের বিষয় হতে পারে কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এদের

তাৎপর্য খুবই কম। বিশ্বের মুসলিমরা প্রত্যেকেই কোন বিষয়টি বিশ্বাস করে তার থেকে তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তফাৎ অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই যা বিশ্বাস করে তা হলো ইসলামপন্থা, শরীয়া এবং খলিফাতন্ত্রের স্বপ্ন। ইরাণের শিয়া রাজত্ব বা ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহে সুন্নী, মালি বা গাজা স্ট্রিপে, করাচী বা কাসাব্লাঙ্কা যেখানেই হোক রাজনৈতিক ইসলাম, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে পাশে সরিয়ে রাখে। যারা এর ডাকে সাড়া দেয় তারা সকলেই মানব সমাজ এবং পৃথিবীকে একই চোখে দেখে। স্বর্গীয় আইন প্রয়োগ করে তারা উভয়কেই সমস্বত্ত্ব বানাতে চায়, তার জন্য যত হিংস্রতাই প্রয়োজন হোক।

ইসলামি বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণ শুভ, তারা লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে স্বস্তি দেয় এবং আশ্বস্ত করে; কিন্তু ইসলামপন্থাই তার মূল কেন্দ্রবিন্দু, যা ধর্মটির ইতিহাসকে বৈধতা দিতে চায় এবং আশা করে এক স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতি পূরণের। ইসলাম চিরকালই তার জন্মগত ত্রুটির দাস ছিল, শুরুর দিকে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করেছিল এবং এর নবীর সময়ে এক জাতি-রাষ্ট্র শাসন করেছে; আর কোন ধর্ম এভাবে জন্মগ্রহণ করেনি। মহম্মদ (যীশুর মতো নয়) ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক, সেনানায়ক, আইনপ্রণেতা, পুলিশ-প্রধান, এবং অর্থমন্ত্রী, সেইসঙ্গে ধর্মপ্রচারক; ইসলাম জন্মলগ্ন থেকেই ছিল রাজনৈতিক। কারণ রাষ্ট্রশাসন, অর্থনীতি, হিংস্রতা এবং যুদ্ধ একত্রে মিশে গেছে এর ধর্মীয় চরিত্রের সাথে এবং যথারীতি তার শুদ্ধিকরণ করা হয়েছে। এটাই এর অন্তর্নিহিত সমস্যা, কিতাবের আয়াতের বক্তব্য নয়। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান কোরআনের সাথে কতটা সম্পৃক্ত তার থেকে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ কোরআনে কি লেখা আছে। যেমন, কত সংখ্যক মুসলমান মহম্মদকে একুশ শতকের আদর্শ পুরুষ হিসাবে দেখে তার চেয়ে, কোরআন অপরিবর্তিত এবং সরাসরি আল্লাহ্র বাণী, শাশ্বত সত্য, ১৪০০ বছর আগে মহম্মদ কি করতে পারতেন অথবা পারতেন না; এসব অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনী অনুযায়ী মহম্মদ তার জীবনের শেষ আট বছরে সত্তর থেকে নব্বইটি যুদ্ধ করেছেন—প্রায় মাসে একটা। তিনি আরবকে খ্রীষ্টান এবং ইহুদী-মুক্ত করেছেন, তরবারির দ্বারা ইসলাম কায়েম করেছেন এবং একবার চারশ' থেকে নয়শ, নিরস্ত্র ইহুদীর শিরচ্ছেদ করেছেন একদিনে—

যা আধুনিক মানদণ্ডে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। ইসলাম থেকে ইসলামপন্থাকে পৃথক করতে হলে হয় মহম্মদকে সরাসরি অস্বীকার করতে হবে অথবা তাকে আধুনিক সময়ের আদর্শ ভাবা ত্যাগ করতে হবে। কোরআন এবং নবী চিরকালের জন্য অলঙ্ঘ্য, এটাই ইসলামের প্রধান সমস্যা। যারা এই ভাবনাকে আঁকড়ে রাখতে চায় তারাই ইসলামপন্থী, তারা ইসলামিক স্টেট থেকে যত দূরত্বই রাখুক না কেন।

তাহলে ইসলামপন্থা কি? এর কোথায় শুরু কোথায় শেষ? ইসলামিক স্টেট, বোকো হারাম, আল কায়েদা এরাই শুধু ইসলামপন্থী; হামাস, মুসলিম ব্রাদারহুড বা এরদোগানের AKP নয়? এদের মধ্যে কেউ কি এমন কিছুর জন্য সংগ্রাম করে যা মহম্মদ করেননি? পৃথিবীর প্রথম মুসলমানরা কি যুদ্ধ করেনি পৃথিবীকে দু'টো ভাগে ভাগ করার জন্য— বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, এবং জিহাদকে সকল মুসলিমের চিরকালীন কর্তব্য বলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য? মহম্মদ এবং তার অনুসারীরা সমস্ত অঞ্চল জয় করে খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের জন্য তিনটি বিকল্প দিয়েছিলেন; ইসলাম কবুল করা, জিজিয়া প্রদান করা অথবা মৃত্যু, ঠিক যা আজ ইসলামিক স্টেট করে থাকে। সেইসঙ্গে পরাজিত বাহিনীর নারী ও শিশুদের দাস বানানো তো আছেই। যে মুসলমানরা এগুলি বিশ্বাস করে তারাই ইসলামপন্থী, কিন্তু সেই সময়ে তারা শুধুই ইসলাম অনুসারী ছিল।

তাহলে ইসলামপন্থী কে? এ কি কোন জঙ্গী যে কালো পতাকা ওড়ায় এবং শিরচ্ছেদের আদেশ দেয়, অথবা ইসলামি আইনকে সমাজের উপরে স্থান দেয়? আমার মনে হয় একজন মুসলমান যে খুব সহজেই মেয়েকে সাঁতার শেখা থেকে বিরত করে অথবা যে মা তার মেয়েকে সাবধান করে, সে যেন শূকর মাংসভোগী, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। যেমন আল-কায়েদা এবং বোকো হারামের মতো ইসলামী দলগুলি ইসলাম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, ইসলামি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালায়, গাজা সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অথচ ইসলামিক স্টেটের বিরোধিতা করতে কিছুই করে না, এরা সবাই আমার মতে ইসলামপন্থী— তেমনি অনেকেই শরীয়া এবং গণতন্ত্রকে মেলাতে চায়, কারণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক ইসলামের ট্রয়ের ঘোড়া বানায়।

একমাত্র যখন ইসলাম তার জন্মত্রুটিকে কাটিয়ে উঠবে তখনই শুধু ইসলামপন্থা থেকে একে আলাদা করা সম্ভব হবে। তার জন্য, মুসলমানদের অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে ইসলামের আইনি এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং এর ফ্যাসিবাদী মানসিকতা। যতদিন ইসলাম বলতে থাকবে আল্লাহ একমাত্র আইনপ্রণেতা, তার আদেশ অপরিবর্তনীয় এবং সমালোচনার ঊর্ধ্বে, ততদিন ইসলামপন্থা থেকে একে আলাদা করা অসম্ভব। (মধ্যযুগের ইউরোপে ইহুদীধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম গণতন্ত্র বিষয়ে আগ্রহী ছিল না, এর ছত্রছায়ায় আসার আগে তারা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখনও মুসলমান হয়েও ইসলামকে রাজনীতি মুক্ত করা সম্পূর্ণ সম্ভব।) একমাত্র যখন মুসলমানরা ইসলামের আল্লাহকে ত্যাগ করবে—যিনি আসমান থেকে মানবজাতির উপর নজরদারি করেন, সামান্য অপরাধে দোজখের আগুনে পোড়ান, যখন তার নিজের অভ্রান্ততা প্রশ্নাতীত—শুধু তখনই ইসলামকে ইসলামপন্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা সম্ভব হবে। যখন ইসলামের মূল শিক্ষা—মানুষের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর এবাদতের জন্য এবং তার প্রণীত আইন পৃথিবীতে কায়েম করার জন্য—অস্বীকার করা হবে, তখনই এই পৃথকীকরণ সম্ভব।

একজন মুসলমান, প্যারিস, কোপেনহেগেন বা বার্লিন যেখানেই হোক, যে তার মেয়েকে হিজাব পরতে বাধ্য করে সেইলোক অবশ্যই যে সিরিয়ায় অবিশ্বাসীদের শিরচ্ছেদ করে সেই মানুষের থেকে শত যোজন দূরে। কিন্তু উভয়েই আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের তাগিদ দ্বারা চালিত, তারা নিজেকেই বলে তাদের আর কোন পথ নেই। এটাই মুসলিম বিশ্বাসের মূল সমস্যা: আরবীতে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকে কখনই “ইসলামপন্থা” বলে না, কারণ এরজন্য শব্দটি হল শুধুমাত্র “ইসলাম”।

মদের প্রতি আসক্তির সাথে মদের যে সম্পর্ক ঠিক তেমনি ইসলামপন্থার সাথে ইসলামেরও সেই সম্পর্ক: অল্প পরিমাণ তাজা করে এবং সুখপ্রদ, কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ বিপজ্জনক এবং আগ্রাসী করে তোলে। ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক স্বস্তি এবং সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত প্রভাব খাটায়। নিকটের ইসলামপন্থা ভয় দেখায়, কারণ ইসলাম মুসলিমদের ঘুম ভেঙে ওঠা থেকে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত

প্রতিটি মুহূর্তের উপর নজরদারি করে। ইসলাম যদি ইসলামপন্থা থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় তাহলে প্রথমেই তাকে ত্যাগ করতে হবে জিহাদ, শরীয়া, লিঙ্গবৈষম্য এবং দৈনন্দিন জীবনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ। প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলি ছাড়া "প্রকৃত" ইসলামের আর কতটুকু বাকি থাকবে?

ইসলামপন্থীদের নয়, মুসলিমদের পৃথক করতে হবে ইসলাম থেকে। প্রত্যেক মুসলমানই চলন্ত কোরআন নয়, সকল মুসলমানও তাদের বিশ্বাসের সব প্রথা এবং নৈতিক বিধিনিষেধ পালন করে না। মসজিদে যায় সামান্য কিছু মানুষ, ফলে সবাইকে একই চোখে দেখা বা একজনের দোষে সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা মারাত্মক অন্যায়। আরও কথা আছে, যারা মনে করেন তাদের বিশ্বাস একান্তই তাদের ব্যক্তিগত বিষয় তাদেরই যতটা সম্ভব সমর্থন প্রয়োজন । বিশেষত, যে মুসলমানরা প্রাচীন ধর্মীয় সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছেন তাদেরই প্রয়োজন সবথেকে বেশী। প্রগতিশীল মুসলিমদের সাহায্য ছাড়া ইসলাম থেকে রাজনীতি দূর করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এবং ইউরোপের ভবিষ্যৎও শূন্যে ঝুলে থাকবে।

অধ্যায় ১৩

শার্লি এবদো এবং ইসলামের ভয়ানক ক্রোধ

জানুয়ারী, ২০১৫, দুই সহোদর ভাই ফরাসী কার্টুন পত্রিকা শার্লি এবদো-র (Charlie Hebdo) অফিস তছনছ করে ফেলল এবংকর্মচারীদের গুলি করে হত্যা করল। দুজনেরই মনে হয়েছিল মহম্মদের কার্টুন চিত্র প্রকাশ করে পত্রিকাটি ইসলাম এবং নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যথেষ্ট গভীরভাবে এই বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে আক্রমণকারীরা ঠাণ্ডা মাথায় বারোজন নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালায়, তাদের বিশ্বাস এই কাজ ক'রে তারা ইসলামকে বিজয়ী করবে। এই যুদ্ধ এবং তাদের নবীর অসম্মান পুরোটাই তাদের কল্পনা কিন্তু যাদের তারা হত্যা করল তারা রক্ত মাংসের মানুষ।

শার্লি এবদো-র আক্রমণকারীদের পৃথিবীর ১.৫ বিলিয়ন মুসলমানের প্রতিনিধি ভাবা কখনই উচিৎ নয়, কিন্তু যে প্রতিক্রিয়াশীল নারকীয় নিষ্ঠুরতা তাদের এই কাজের জন্য উত্তেজিত করেছিল তা তামাম উম্মার মানসিকতার লক্ষণ। তাদের আক্রমণের ভয়াবহতা পশ্চিমের সাথে ইসলামের অসামঞ্জস্যেরই প্রতিফলন। কয়েক শতাব্দী ধরে বহু বিষয় এই অকারণ ভীতিকে শক্ত করেছে, তার মধ্যে আছে ঔপনিবেশিকতা, ক্রুসেড, এবং ইজরায়েল। বহু ইসলামি দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অসন্তোষ ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে উসকে দিয়েছে, কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের যে বিশ্বাস মুসলমানদের আছে তা ইসলামেরই সমবয়সী। কোরআনে কিছু জায়গায় বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা একে অপরকে জানতে পারে—কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইসলামের কিতাব বার বার বলেছে অমুসলমানদের বিশ্বাস না করতে।

মহম্মদ অসংখ্যবার তার অনুসারীদের সাবধান করেছেন অবিশ্বাসী দ্বারা প্রতারিত হওয়ার বিষয়ে। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। কোরআনে অন্যত্র আল্লাহ্ নবীকে জানিয়েছেন, "খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা তোমাদের মেনে নেবে না যতক্ষণ না তোমরা তাদের ধর্ম অনুসরণ করছ" (সূরা আল বাক্বারাহ, ০২/১২০)। মৃত্যুশয্যায় মহম্মদ এমনও দাবি করেছেন যে একজন ইহুদী মহিলা তাকে বিষ খাইয়েছে,

যদিও তিনি নিজেই মদিনার সমস্ত ইহুদীকে বিতাড়িত করেছিলেন এ ঘটনার বহু বছর আগে। মৃত্যুর অল্পকাল আগে নাকি মহম্মদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পৃথিবীর মুসলমানরা একসময় সংখ্যায় অনেক হওয়া সত্ত্বেও মানুষেরা তাদের উপর একপাল শিকারীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে, আর এর কারণ হচ্ছে মুসলমানরা মৃত্যুর চেয়ে জীবনকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয়ে পড়বে। ইসলামপন্থীরা প্রায়ই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানরা উঠে দাঁড়িয়েছে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সফল করতে, তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মৃত্যুকে ভালবেসে তারা তাদের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করবে।

যখন আত্মশক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস নিঃসঙ্গতার সাথে যুক্ত হয় তখনই মস্তিস্কবিকৃতি ঘটে। আমৃত্যু হিটলারের বিশ্বাস ছিল শুধু ইহুদী এবং তাদের সহযোগীদের জার্মানী বিরোধীতাই নয়, কোন অদৃশ্য শক্তি ব্যক্তিগতভাবে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। ২০০৫-এ প্রথম প্রকাশিত নথি প্রমাণ করে ফুয়েরার তার শৌচাগার এবং ডিম সিদ্ধ করার জল পরীক্ষা করাতেন যে সেখানে বিষ আছে কি না! হিটলার তার নিরাপত্তার অভাবের জন্য বাস্তব এবং কাল্পনিক শত্রুদের দায়ী করতেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন মৃত্যুর পর তার দেহ যেন এমনভাবে পোড়ানো হয় যাতে চিনতে পারা না যায়। যাতে যোশেফ স্ট্যালিন যেন সেটি দেখানোর জন্য কাঁচের বাক্সে না রাখতে পারে। তার জীবন শুরু হয়েছিল ভার্সাই চুক্তিতে (Treaty of Versailles) জার্মানীর অপমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে, আর সমাপ্তি হল পুরনো শত্রু কমিউনিস্টদের দ্বারা মৃত্যুপরবর্তী অসম্মানের ভয় দিয়ে।

দার্শনিক উম্বার্তো ইকো-র মতে আমজনতার মধ্যে “তীব্র অসুখী মানসিকতার অনুভূতি এবং ক্ষয়” ফ্যাসিবাদের উত্থানের লক্ষণ। যার সমর্থকরা মনে করে তারা সর্বক্ষণ তাদের শত্রুদের ইচ্ছাকৃত আক্রমণের শিকার। আক্রমণের শিকার এই তত্ত্বের মধ্যে তারা আশ্রয় খোঁজে। তারা তাদের শত্রুর শক্তিকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলে এবং নিজেদের শক্তি কমিয়ে দেখায় কারণ তারা বিশ্বাস করে তাদের যথেষ্ট শক্তি (প্রকৃত অর্থে দায়িত্ব) আছে শত্রুদের গুঁড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু তারা সবসময়েই পরাজিত হয় কারণ তাদের মস্তিস্কবিভ্রম এবং ক্ষমতার প্রতি লালসা ভিতর থেকে অন্তর্ঘাত ঘটায়। হাসান আল-বান্না, মিশরের মুসলিম

ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা, আশা করেছিলেন বিশ্বজয় করবেন কিন্তু রাস্তায় রক্ত ঝরিয়ে তার জীবন শেষ হলো, প্রায় গুলিতে নিহত হওয়া যে কোন ইসলামপন্থীর মতো। ১৯৬৭ সালে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তার দেশের ছয় দিনের যুদ্ধের সময়ে, প্রায় সমস্ত আরব রেডিও স্টেশন দাবি করল মিশরীয় সেনা ইহুদী রাষ্ট্রটাকে পৃথিবী থেকে মুছে দেবে—এক সপ্তাহের মধ্যে প্রচণ্ড মার খেয়ে তারা ফিরে এল। ঠিক যেমন অনাদিকাল থেকে হেজবোল্লাহ এবং হামাস বলে আসছে তারা ইজরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। ওসামা বিন লাদেন আবেগের সাথে ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের অপমানের কথা বলেছিলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একটা সন্ত্রাসী আক্রমণই যথেষ্ট পাশ্চাত্যকে হারাতে। এখন ইসলামিক স্টেট কঠোরভাবে বিশ্বাস করে তাদের বিশ্ববিজয়ে, এভাবেই তারা ইসলামকে জয় এনে দেবে চিরকালের জন্য।

রক্ত, সম্মান, এবং (আত্ম-) ধ্বংস—এইগুলিই ইসলামপন্থী এবং ফ্যাসিবাদীদের পাওনা।

গৌরব এবং লজ্জার ইতিহাস

বহু প্রজন্ম ধরে ইসলামি বিশ্বে যে সাংস্কৃতিক ধারা চলে আসছে তা প্লেটোর “গুহার রূপক”-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। একটা জাতিগোষ্ঠীর সমস্ত মানুষ জন্ম থেকে এক গুহার অন্ধকারে শিকল দিয়ে বাঁধা আছে, তারা শুধু তাদের সামনের দেওয়ালটাই দেখতে পায়। প্লেটোর এই চিন্তাভিত্তিক পরীক্ষায়, তাদের পিছনে উজ্জ্বল আগুন জ্বলছে, যার ফলে সেই দেওয়ালে ছায়া পড়ছে। মানুষগুলি ছায়াটাই শুধু দেখে, কিন্তু তাদের কোন ধারণা নেই সেটা কিসের ছায়া। যদি কেউ কথা বলে, তা পিছনের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। বন্দীরা বিশ্বাস করে ঐ ছায়াগুলিই কথা বলছে। এই রূপক গল্পের মূল প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বন্দীরা যদি মুক্ত হয় এবং সামনের দেওয়াল থেকে মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরে দেখে তাহলে তারা কি করবে। প্লেটো মনে করেন, আগুনের আলোয় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে, তারপর তাদের মনে ভয় ধরবে এবং ভাববে, যাদের কথার শব্দ তারা আগে শুনেছিল সেটা মনের ভুল। তারপর শীঘ্রই

তারা গুহায় ফিরে যাবে এবং সামনের দেওয়ালের ছায়ার দিকে ফিরে স্বস্তিদায়ক সেই কাল্পনিক ছায়া দেখতে চাইবে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামি বিশ্ব মানবজাতির অন্য অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের সীমানার বাইরে কোন বিস্তৃত বিশ্ব নেই। তারপর আরো উন্নত “অন্য” লোকেরা এসে কঠিন আঘাতে সেই গুহা ভেঙ্গে খুলে দিল। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নৌবহর যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় পা রাখে, এক অসম যুদ্ধ হয় টেকনোলজিতে উন্নত ইউরোপীয় শক্তির সাথে আরবের তালাবন্ধ স্থবির শক্তির। পাশ্চাত্য-বিরোধী ইসলামি নেতারা ভেবেছিলেন সমাজের আধুনিকীকরণ ওদের সামনে আত্মসমর্পণের সমান—যা মুসলিমদের প্রকৃত ইসলামি চরিত্রকেই মুছে দেবে। এতে স্বৈরাচারী বাদশাহদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল, কারণ গোঁড়া ধর্মান্ধরা সবসময়েই সমাজের ঘড়িকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে নতুন করে শুরু করার জন্য, জাগিয়ে তুলেছে নবীর সময়ের স্মৃতি। ক্রুসেড এবং ঔপনিবেশিকতার সময়ে ইসলামি ধর্মীয় চিন্তা এবং রাজনীতিতে পুনর্জাগরণের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল: অস্থিরতার সময়ে মানুষকে একত্র করতে সমাজ সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে টেনে আনে, মুছে ফেলে সমস্ত ধার করা চরিত্রের চিহ্ন। ইসলাম প্রমাণ করল যে ইসলামই একমাত্র আশ্রয়ের জায়গা যখন মানুষ রক্ষণাত্মক হয়, গোপন করে নগ্ন নীচতার লজ্জা। লজ্জা ডেকে আনে ভয়, ভয় ডেকে আনে বিশ্বাস। রক্ষণশীলরা যখনই বুঝল তাদের আবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তারা সেই সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণ শুরু করল।

কয়েক শতাব্দী ধরে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে কাল্পনিক অত্যাচারের অনুভূতি জাগে। বাইরের যে কোন সমালোচনাকে মানুষ তখন বলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা; প্রত্যেক বিরোধী মতকেই মনে করা হয় বিধর্মী বা বিশ্বাসঘাতক। সমাজ যত বেশী আবদ্ধ হয়, ততই তীব্র শপথ করে বলে বাইরের জগৎ তার শত্রু এবং মানুষকে চাপ দেয় অবিচল আনুগত্য প্রকাশ করতে, যা শুরু হয় মানসিক এবং বৌদ্ধিক আত্ম-প্রতারণা দিয়ে। জার্মান জোতির্বিদ ফাউস্ট (Faust)-এর মতের মতো মতবাদ যদি সৃষ্টিও হয় তা বাতিল বলে গণ্য হয়, অথচ অনধিকার প্রবেশকারী এবং যারা পালাতে চায় তাদেরকে ভয় এবং ঘৃণা করা হয়।

[ফাউস্টের লেনদেন, একটি চুক্তি যার দ্বারা কোন মানুষ কোন চরম নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়, যেমন ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা আত্মাকে বিক্রী করতে চায় কিছু পার্থিব বা বস্তুগত লাভের বিনিময়ে, যেমন জ্ঞান, ক্ষমতা, বা সম্পদ। শব্দটি এসেছে ফস্টের রূপকথা থেকে, তিনি তার আত্মাকে জ্ঞান এবং যাদুশক্তির বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পরে শয়তানের কাছে বিক্রী করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি জাগতিক সুখ ভোগ করতে পারেন] বহির্বিশ্বের প্রভাব যত বাড়তে থাকে, যারা সীমানার বাইরে পা রাখে, আবদ্ধ সমাজ তাদের তত বেশী শাস্তি দেয়; বেঁচে থাকে ঐক্য, নীরবতা, এবং নজরদারির পথ অবলম্বন করা হয়, যেমনটি সাধারণত করা হয়ে থাকে। যার ফলে সাংস্কৃতিক অজাচারে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এর নেতারা জঘন্য নৃশংসতাকে লুকিয়ে রাখে, অধিকাংশ অত্যাচারিতরাও সেকথা গোপন করে। যারাই সাহস করে এর বাইরে যায় তার ফল খুব ভাল হলে নির্বাসন, খারাপ হলে আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যু। ইসলামের সংস্কারকরা বারবার জীবন দিয়ে কঠিন মূল্য দিয়েছে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করার জন্য। অন্য সময়ে লোকে শুধু মুখ ফিরিয়ে থেকেছে, ফিরে গেছে তাদের গুহায় স্বেচ্ছায় নিজেদের শিকলবন্দী করতে। তারপর সোজা তাকিয়ে থেকেছে সামনের দেওয়ালের দিকে।

বহু বহু মুসলমান আধুনিকতাকে মনে করে বিদেশী বস্তু, ভূমধ্যসাগরের ওপার থেকে আমদানী করা হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক বা দেশীয় স্বৈরাচারী সুলতানদের দ্বারা গায়ের জোরে প্রয়োগ করা হয়েছে, কখনও কোন মুসলিম সংস্কৃতির ধারক মানুষকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেনি। মুসলিম বিশ্বের কোথাও আধুনিকতাকে সৃষ্টিশীলতার সাথে ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত করা হয়নি, যেমন করা হয়েছে জাপানে। সেখানে আধুনিকতা হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে সদ্য হওয়া ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করেছে এবং আমেরিকার সাহায্য নিয়ে দেশের পুনর্গঠন সফল হয়েছে। অপরদিকে, ইসলাম বিশ্ব ঔপনিবেশিক যুগের শেষে তার ক্ষত চাটতে থেকেছে। ফলে জেগে উঠেছে ক্রোধ এবং জাতিগঠনের ধারণা আসালা —যার অর্থ "সত্যতা", "সার্বভৌমত্ব", বা "মৌলিকত্ব"—যা আধুনিক যুগের প্রভাবের ফসল। এটি মুসলমানদের এক সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছিল নিষ্ঠার সাথে প্রয়োগ করে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যখন তারা নিজেদের পরিচয় খুঁজছিল নিষ্ঠুর মোল্লাতন্ত্রের মধ্যে অথবা

আপাত ধর্মনিরপেক্ষ একনায়কের মধ্যে যিনি লৌহকঠিন হাতে এবং প্রাচীন আদিবাসী নেতাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী দেশ শাসন করবেন। দুই ধরণের শাসনই কামনা করে শত্রু, দেশে এবং বিদেশে।

১৯৯২ সালে, মিশরীয় ফারাগ ফোডা (Farag Foda) উগ্রপন্থীদের দ্বারা তার বাড়ীর বাইরেই খুন হন কারণ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমরা তার বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার ফতোয়া দেন। ফোডা আল্লার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেননি বা নবীকে শিশু ধর্ষক বলেননি; তার একমাত্র অপরাধ তিনি প্রকাশ্যে মসজিদ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের পক্ষে সওয়াল এবং হিজাব নিয়ে কৌতুককর মন্তব্য করেছিলেন, এজন্যই তাকে জীবন দিতে হল। এর সাত বছর আগে সুদানের ধর্মতত্ত্ববিদ মাহমুদ মহম্মদ তাহা (Mahmoud Mohammed Taha) নিহত হন খার্তুম-এ, কারণ তিনি বলেছিলেন শরীয়া একটি ঐতিহাসিক বিষয় যা এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। তিনি ছিলেন আরবের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদের একজন যারা ১৯৬০ এর দশকে জাতীয়তাবাদের গৌরবের সময়ে ইজরায়েলের সাথে মিটমাট করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় না গিয়ে বরং আরব তার শক্তি এবং সম্পদ সঞ্চয় করে দেশের উন্নতিতে ব্যয় করুক। শুধু এই কারণেই তাকে বিধর্মী ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে এখন সময় এসেছে মুসলিমদের ক্রমাগত ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্য নিজেদের নিন্দা করার। তারা নিজেদেরকে দেখে এক অতি উচ্চ সংস্কৃতির উত্তরসূরী হিসাবে কিন্তু মানতে পারে না পৃথিবীজুড়ে একক আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা তারা হারিয়েছে বহুকাল আগেই। তিউনিসিয় ফরাসী লেখক আবদেল ওয়াহাব মেদ্দেবকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, “ইসলাম ক্ষমতা হারানোকে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ”। ফলে অসন্তোষ জন্ম দিয়েছে মৌলবাদিতার, যাকে মেদ্দেব আখ্যা দিয়েছেন “ইসলামি অসুখ”-এর সবথেকে জ্বলন্ত সমস্যা। সম্মান এবং প্রতিরোধের এক অতি প্রাচীন সংস্কৃতি আজও বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমের সাথে ফলপ্রসূ সম্পর্ক তৈরীর পথে। পশ্চিমকে একুশ শতকের মুসলিমদের “শত্রু” বলে মনে করে, যেহেতু প্রতিশোধের চিন্তা বিকারগ্রস্ত কল্পনার জন্ম দেয় যাকে এড়ানো সম্ভব নয়।

কখনো কখনো আমার অবিশ্বাস করা শক্ত বলে মনে হয় যে পশ্চিমের উপরে রাগটাকে মুসলমানরা বেশ উপভোগ করে। লাগাতার আক্রমণ যেন মর্ষকামী খেলার অংশ এবং মুসলমানদের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজেদেরকেই আশ্বস্ত করার বৃথা চেষ্টা। অনেককেই মনে হয় যে তারা 'চায়' পশ্চিম তাদের শত্রু থাকুক, PEGIDA-র (in English, Patriotic Europeans against the Islamization of the West) মতো এবং জার্মানীতে থিলো সারাজিন, নেদারল্যাণ্ডে গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্স (Geert Wilders), ফ্রান্সে মেরিন লে পেন (Marine Le Pen) এবং ইংলিশ ডিফেন্স লীগ নতুন নতুন আক্রমণের কারণ সৃষ্টি করুক। এই বিষয়টি মুসলিমদের আহত করে, কিন্তু একইসাথে তাদের আত্মরতিপ্রিয় মন কামনা করে শক্তিশালী পশ্চিমারা যেন তাদেরকে গুরুত্ব দেয়ার যোগ্য মনে করে অথবা নির্মূল করার চেষ্টা করে। কারণ পাশ্চাত্য যদি তাদের সম্পূর্ণভবে উপেক্ষা করত, তারা হঠাৎই দিশাহারা হয়ে পড়ত।

"অবশ্যই এটা আমাকে অসন্তুষ্ট করে। আমি একজন মুসলমান!"

আমার জীবনের অর্ধেক সময় আগে, আমি আউষবার্গের (Augsburg) ব্যাভেরিয়া শহরে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলাম। সেখানে ধর্মতত্ত্বের ছাত্র, আমার এক জার্মান বন্ধু, আমাকে ধর্মীয় নির্দেশ শেখানোর জন্য আমাকে একটি জোক বলে, যা আমাকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ এবং বিচলিত করেছিল।

জোকটি এইরকম; এক ব্যাভেরিয় কশাই মৃত্যুর পর স্বর্গে গেছে। সেইন্ট পিটার তাকে প্রবেশদ্বারে থামিয়ে তার ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখলেন সেখানে বড় একটি বাছুরের মাংসের সসেজ এবং (তিনি কখনও ব্যাভেরিয়াতে যাননি) তিনি কশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন "এটা কি?" কশাই বলল "এটা খাবার। এ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না"।

সন্তুষ্ট না হয়ে সেইন্ট পিটার তাকে আটকালেন এবং যীশুকে সসেজটি শনাক্ত করতে বললেন। যীশু বললেন, "পিটার, আমি বলতে পারব না। তুমি আমার মা কে জিজ্ঞাসা কর। তিনিই বাজারে যেতেন, আমি খুব একটা যাইনি। আর খাবারের ব্যাপারে উনি আমার থেকে ভাল জানেন"।

সেইন্ট পিটার কুমারী মেরীর কাছে গিয়ে সসেজটি তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ওটি চেনেন কি না। পবিত্র মা সেটি হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, “আমি কখনও এটি দেখিনি, কিন্তু হাত দিয়ে অনুভব হয় অনেকটা পবিত্র আত্মার মত”।

আমি বিস্মিত এবং আহত হলাম, হাসতে পারিনি। একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টান—যে কিনা সেই বিশ্বাস প্রচারের শিক্ষা নিচ্ছে, পবিত্র চরিত্রদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারে! সাধারণভাবে মুসলমানদের কোন রসবোধ নেই—আমি এমন একটা সংস্কৃতি থেকে এসেছি যেখানে সমস্ত কিছুই জোকের গুঁতো অর্থাৎ হাস্যকর—কিন্তু ইসলাম এবং তার নবীকে নিয়ে কোন তামাশা করা যাবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিশরীয়রা এখনও আবৃত্তি করে মহম্মদের বাধ্যতামূলক বক্তব্য, যারা তাদের পিতামাতা বা সন্তানদের থেকে তাকে বেশী ভালবাসে না তারা বিশ্বাসী মুসলিম হতে পারবে না। যেহেতু কেউই নিজের পিতামাতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে রেহাই পেতে পারে না, সেটা মহম্মদের ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী প্রযোজ্য। তার জীবদ্দশায়, মহম্মদের সাহাবীদের অনেকেই যারা মহম্মদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে তাদের হত্যা করে মহম্মদের প্রতি তাদের ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছে। আরবীতে “সুখরিয়া” (sukhriyyah) বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যে ধারণা, কোরআনে তাকে তীব্রভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অমুসলিম মক্কাবাসীরা মহম্মদকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত, তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলত এবং কোরআনকে বলত “প্রাচীন গালগল্পকে নতুন করে বলা”। নবীর প্রতি তার অনুসারীদের অন্ধ ভক্তি সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে, যারা তার প্রতি অপমানসূচক কিছু বলত বা করত তিনি ভক্তদের দিয়ে তাদের শিরচ্ছেদ করিয়েছিলেন। নিহতদের মধ্যে অনেক কবিও ছিলেন যেমন ইবনু খতল, কাব বিন আশরাফ এবং আসমা বিনতে মারওয়ান।

আমার বন্ধু যখন জোকটি বলেছিল, তখন নবীর পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আমার কোন উপায় ছিল না। নিজেকে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, একজন ধর্মতত্ত্বের ছাত্র যদি তার নিজের ধর্মকে এমন তীব্র ব্যঙ্গ করতে পারে তাহলে আমার ধর্মকে নিয়ে কি বলবে! যদি সে যীশু এবং মেরীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারে তাহলে মহম্মদকে নিয়ে কি বলবে? সে সময়ে আমি চিন্তিত বোধ করলাম, আমিও কি এমন স্বাধীনতার লোভ সংবরণ

করতে না পেরে আমার ধর্মকেই উপহাস করব? আমি দেখলাম আমার সামনে দু'টো পথ। স্বাধীনতার ফসল হিসাবে ব্যঙ্গকে মেনে নেওয়া অথবা মুক্ত জীবনধারার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা। প্রথমে আমি দ্বিতীয়টি বেছে নিলাম। আমি আমার বিশ্বাসের ছায়ায় আশ্রয় নিলাম এবং আরও বেশী মৌলবাদী হয়ে উঠলাম, এমনকি আমার সহপাঠীদের সাথে বন্ধু-বিচ্ছেদ করলাম। যত আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলাম ততই ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ-মাধ্যমে বা সহকর্মীদের মন্তব্য আমাকে আহত এবং অসুস্থ করে তুলত। "অবশ্যই এটা আমাকে অসন্তুষ্ট করে," আমার হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিগত নীতিবোধ ফিরে এল। "আমি একজন মুসলমান!"

মাত্র কয়েক বছর পর, অনেক বিশ্লেষণাত্মভাবে ইসলামকে পরীক্ষা করে আমি অনুভব করলাম ব্যঙ্গ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ২০০৫ এ ডেনমার্কে প্রকাশিত মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র ইসলাম সম্পর্কে আমার মন পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল যখন মুসলমানরা বিপুল সংখ্যায় রাস্তায় নেমে পশ্চিমী দূতাবাসগুলিতে বোমা মেরে তাদের নবীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছিল; সেই হিংসাত্মক ঘটনায় ১৫০ জন মুসলমান প্রাণ হারায়। সংবাদমাধ্যমের কয়েকটি সাহস করে অভিযোগ করেছিল যে তাদের মৃত্যু মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্রের থেকে কিছুটা খারাপ। এর কিছু দিন পর ফ্লেমিং রোজ-এর (Flemming Rose) সাক্ষাৎকার নিতে কোপেনহেগেন গিয়েছিলাম। ইনিই সেই ড্যানিশ সম্পাদক যিনি ছবিগুলি প্রকাশ করেছিলেন। দেখলাম তিনি বেশ যৌক্তিক এবং চিন্তাশীল মানুষ, যার মধ্যে ঘৃণা বা বর্ণবিদ্বেষ ভরা নয়, বরং সভ্যতার আলোকের মূল্যবোধ আছে। তিনি আমাকে বললেন, মহম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গের উত্তর গণপ্রত্যাখ্যান হতে পারে না, মুসলিমদের ব্যঙ্গের সাথে বাঁচতে শিখতে হবে। আমি সাক্ষাৎকারটি একটি প্রধান মিশরীয় সংবাদপত্রকে দিয়েছিলাম, সেটি অনলাইনে প্রকাশিত হয়, কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। লেখাটি আলোর মুখ দেখামাত্র, পাঠকদের থেকে প্রতিবাদের প্রবল ঢেউ সেই উদার সংবাদপত্রকে বাধ্য করল সেটি প্রত্যাহার করে নিতে।

হঠাৎই আমি আউষবার্গে আমার সহপাঠীদের আচরণকে বুঝতে পারলাম। আমার বন্ধু তার বিশ্বাসকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল এইজন্য নয় যে, সে তার মূল্য অনুভব করতে ব্যর্থ। বরং সে ছিল যুক্তিবোধসম্পন্ন,

কোনরকম বাধ্যবাধকতাহীন, ব্যঙ্গ এবং আত্ম-সমালোচনাকে জায়গা দেওয়ার জন্য তার বিশ্বাসকে পাশে সরিয়ে রাখতে পারে। স্বাধীন সংস্কৃতির এটি একটি সম্ভাবনা, সেইসঙ্গে এটি একটি চ্যালেঞ্জ যার মোকাবিলা করতে মুসলিমরা ব্যর্থ।

ইউরোপে ব্যঙ্গের ইতিহাস স্বর্গীয় আইন থেকে বন্ধনমুক্তির ইতিহাস—অন্যভাবে বললে, সভ্যতার আলোকের ইতিহাস। অনাদিকাল থেকে দার্শনিকরা তাদের দেবতাদের নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করে আসছে; পুনর্জাগরণের (Renaissance) সময়ে ব্যঙ্গ ছিল শিক্ষিত শ্রেণীর পছন্দের শিল্প। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত ইরাসমাস অব রটারডাম (Erasmus of Rotterdam)-এর “নির্বুদ্ধিতার প্রশংসা” (The Praise of Folly) চার্চের একটি মানবিক সমালোচনা করে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বিশ্বাসীদের এবং দৈবপ্রসাদের, অথচ তখনও ক্রোধের আগুন জ্বলছিল।

সভ্যতা ব্যঙ্গের উত্থানকে দেখেছিল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে, শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্যপূরণের আন্দোলনের প্রেরণা হিসাবে। ইরাসমাস-এর উত্তরসূরী ভলতেয়ার (Voltaire)-এর হাত ধরে ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ ফ্রান্সকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছিল, যা আমাদের বর্তমান নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। এমন কি সভ্য বিষয় নিয়েও মজা করা হতো। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জোনাথন সুইফ্টের “গালিভার’স ট্রাভেলস” (gulliver’s Travels), যেটি সেই সময়ের বিশিষ্ট তত্ত্বগুলির এবং তাদের মানবতার আদর্শীকৃত মতের বিদ্রূপাত্মক প্রকাশ। মন্টি পাইথন, মিস্টার বীন, এমন কি জন স্টুয়ার্ট এবং বিল মাহের শার্লি এবদোর ধারারই অনুসারী। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এবং সামাজিক ব্যঙ্গ সবসময়েই সমাজের আস্তাবল পরিস্কারের পদ্ধতি।

রসিকতা গোটা সংস্কৃতিকে আরাম দেয়, স্বস্তিব দেয়; প্রাচীন রূপকথা এবং বিশেষ চরিত্রদের আবরণ খুলে দেয়, এবং মানুষকে নতুন নতুন প্রেক্ষিত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। চরম সত্যগুলিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে, এমন কি মানুষকে তার স্ব-আরোপিত ছেলেমানুষী ঝেড়ে ফেলতে সাহসী করে তোলে। যেহেতু রসিকতা মানুষকে অত্যাচারীর ভয় থেকে মুক্ত করে, সেই কারণেই অত্যচারীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রতি এত অসহিষ্ণু। যখন ১৯৮৯ সালে আয়াতোল্লাহ খোমেইনি সলমন রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি

করেন, তা শুধু রুশদি তার উপন্যাস ‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস-এ (The Satanic verses) নবী এবং তার স্ত্রীদের ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই নয়, বইটি খোমেইনিকে ব্যক্তিগতভাবে হাস্যাস্পদও করেছিল। গোটা ইসলামের ইতিহাসে, “নবীর অসম্মান” কথাটি শাসকরা ব্যবহার করেছে ভিন্নমতের কন্ঠরোধ করতে।

যদি ধর্ম নিয়ে মস্করা করা হয় তখন রাষ্ট্রের পাহারা এবং ইসলামপন্থীদের সন্ত্রাসবাদের ভয়ের চেয়েও অনেক খারাপ স্বআরোপিত পাহারা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আহত বোধ করার প্রবণতা। যেন ইসলামি দেশগুলির নিজস্ব সমস্যা অসন্তোষের জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। বহু মুসলমান দৈনিক সংবাদপত্র এবং উপগ্রহ চ্যানেলগুলিতে চিরুনী-তল্লাসী চালায় চীন, ইউরোপ বা ফিলিপাইনসে অত্যাচারিত মুসলিম সংখ্যালঘুর কাহিনীর খোঁজে, ইসলামের বিরুদ্ধে পৃথিবীজোড়া ষড়যন্ত্রের প্রমাণ যোগাড়ের জন্য। যেদিন তারা কিছুই পায় না—তখন তারা খোঁজে মহম্মদের নগ্ন ছবি, পোপের কোন বিবৃতি যেখানে তিনি ইসলামকে অমানবিক বলেছেন, এমন কি কোন ফুটবল দলের দলীয় সঙ্গীতে বলে নবীর ফুটবল সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না, যে কোন কিছু, যা তাদের ভালবাসার জিনিস ‘ক্রোধের অনুভূতি’-কে জাগিয়ে রাখে, সে যে কোন ভাবেই হোক। নবী মহম্মদ সন্ত্রাসবাদকে উসকে দিয়েছিলেন এই অভিযোগ থেকে তাকে মুক্ত করতে, তারা মলোটভ ককটেল দিয়ে দূতাবাস উড়িয়ে দেয়, অন্যেরা ভয়ানক প্রতিবাদ জানায় পোপ বেনেডিক্টের বিবৃতির, কারণ তারা ইসলামকে মানবিক প্রমাণ করতে মরিয়া, তার জন্য যত হিংসাত্মক কাজেরই প্রয়োজন হোক। ২০০৬ এর জুন মাসে জার্মানীর রোজেনসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতায় পোপ ইসলাম সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। যা চতুর্দশ শতকের শেষদিকে বাইজান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল দ্বিতীয় পালাইওলোগোসের বক্তব্য থেকে নেওয়া। পোপ যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেছিলেন সেটি এই, “আমাকে দেখান মহম্মদ নতুন কি করেছিলেন, সেখানে দেখবেন শুধুমাত্র ক্ষতিকর এবং অমানবিক কাজ, যেমন, যে বিশ্বাস তিনি প্রচার করেছিলেন তরবারির দ্বারা তার প্রসার ঘটানোর নির্দেশনা প্রদান!’’

২০০৭ সালে ব্রটিশ স্কুলশিক্ষিকা গিলিয়ান গিবনস (Gillian Gibbons) সুদানে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তার ক্লাসে টেডি বিয়ারের নাম মহম্মদ

রেখেছিলেন বলে। মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল জার্মান ফুটবল দল শালকে ০৪ (Shalke 04)-র দলীয় সঙ্গীতের প্রতি, কারণ সেখানে আছে, "নবী মহম্মদ এই খেলার কিছুই জানতেন না"। মহম্মদকে টেডি বিয়ারের পোষাক পরিয়ে, যাতে তার মুখ দেখা না যায়, আমেরিকার অ্যানিমেটেড কৌতুক ছবি 'সাউথ পার্ক'-এর নির্মাতারা মৃত্যু হুমকি পেয়েছিলেন; যদিও তারা নিয়মিত মোজেস, যীশু, বুদ্ধকে নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক করে, কোন প্রতিবাদ বা মৃত্যু হুমকি আসে না।

ফেব্রুয়ারী ২০১০ এ দু'জন মিশরীয় অভিবাসী কাকতালীয়ভাবে একই পরিস্থিতিতে নিহত হন; একজনকে পিটিয়ে মারা হয় মিলানে এক দক্ষিণ আমেরিকানের সাথে ঝগড়ার সূত্রে, অন্যজন মারা যান সৌদি আরবে এলোপাথাড়ি গুলিতে। প্রথম জনের মৃত্যুর ভয়ানক কাহিনী মিশরের সংবাদপত্রগুলিতে নিয়মিত শীর্ষসংবাদ হয়েছে কিন্তু সৌদি আরবে হত্যার ঘটনাটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। দু'একটি কাগজে অন্যান্য খবরের মাঝে সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে যেন সম্পাদক সৌদি আরব এবং হত্যা এই শব্দদু'টি এক সাথে উচ্চারণ করতেও ভয় পান! উভয় ক্ষেত্রেই, কোথায় মারা গেছে এবং কাদের দ্বারা মারা গেছে, তার থেকে কে মারা গেছে সেটি অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি একজন মিশরীয় ইটালির উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার ডাক দিলেন, যে অভিবাসী সৌদি আরবে নিহত হলেন তার জন্য সামান্য শোক প্রকাশ করা হলো মাত্র।

মুসলিমদের কাছে নিহতের পরিচয় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকারীর চেয়ে, এই বিষয়টিকে এড়ানো খুবই কঠিন। সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলিমরা গণবিক্ষোভ দেখায় নবীর ব্যঙ্গচিত্র বা গাজায় সংঘর্ষের বিরুদ্ধে, কিন্তু তারা কখনই প্রতিবাদ করে না আল-কায়েদা, বোকো হারাম বা ইসলামিক স্টেটের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। যদিও এই তিনটে গ্রুপ একাই অনেক মুসলমান হত্যা করেছে যা ইজরায়েলের সাথে যুদ্ধে নিহতের সংখ্যার থেকে বেশী।

মুসলমানরা যে নবীর পবিত্রতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে তা শুধুই স্বৈরাচারী শাসকদের হাত শক্ত করে, যারা নবীর নামে অত্যাচার চালায়, যে কোনরকম সংস্কারের প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে এবং শার্লি এবদোর আক্রমণকারীদের মতো সন্ত্রাসীদের সক্ষমতা বাড়ায়, যে আক্রমণকারীরা

সামান্য কয়েকটা ছবির জন্য প্রতিশোধের হিংসায় মেতে ওঠে। পাশ্চাত্যে ইসলামের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা প্রায়ই চেষ্টা করে মহম্মদের অলঙ্ঘনীয় ভাবমূর্ত্তি রক্ষা করে দেশে শান্তি বজায় রাখতে—যদিও মুসলিমদের আলাদা কোন সুবিধা তারা দেয় না, কারণ প্রকৃত সম্মানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি আশা যে তারাও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো ব্যঙ্গ বা সমালোচনাকে সহজভাবে নেবে। অনেকেই বলেন মহম্মদকে একা থাকতে দেওয়া হোক কারণ তিনিই "মুসলমানদের আত্মপরিচিতির ভিত্তি"। এতে একটা বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী তাকে 'ফ্রী পাশ' দেওয়ার পরও তিনি কেন এমন ভূমিকায় থাকেন।

এমন দিন আসবে যখন মুসলিমরা তাদের সমর্থক এবং তোষণকারীদের থেকে বিধর্মী, ব্যঙ্গকারী, এবং ইসলামের সমালোচকদের প্রতি বেশী কৃতজ্ঞ বোধ করবে—যে জন্য আমার মনে হয় শার্লি এবদো একটা সুযোগ—দৈবক্রমে ঘটা একটি ঘটনা যার ফলে মুসলমানরা অবশেষে তাদের ধর্মীয় কিতাব এবং নেতাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে। বুঝতে পারবে একটি ভঙ্গুর জীবনদর্শনকে বাইরের শক্তির থেকে রক্ষা করতে হুমকি এবং ভীতির উঁচু দেওয়ালের প্রয়োজন হয়। শার্লি এবদোর ব্যঙ্গচিত্রের মতো বিষয় এখনও মুসলিমদের জন্য "এক্সপোজার থেরাপি"র (Exposure therapy involves exposing the target patient to the anxiety source to treat anxiety disorders) কাজ করতে পারে। তারা এটুকু অন্তত বুঝবে সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলামের নামে যা ঘটানো হচ্ছে তার তুলনায় পাশ্চাত্যের কাছে ইসলামের ভাবমূর্ত্তি অনেক ছোট সমস্যা। এবং সেই কারণে আজ তাদের প্রধান বিরোধ ইসলামের সমালোচকদের সাথে নয়, বিরোধ ইসলামের সাথে, তার কিতাবের সাথে এবং সাধারণভাবে পৃথিবী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে।

শার্লি এবদোর ব্যঙ্গচিত্র এবং তার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া কর্মীরা হয়তো মহম্মদের সমালোচনার প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার শেষ সূচিত করবে; কারণ একজন মানুষের জীবনের থেকে কোন কিছুই বেশী পবিত্র হতে পারে না, বা স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের থেকে বেশী মূল্যবান হতে পারে না। পৃথিবী কখনও মুসলমানদের সম্মান করবে না যতদিন তারা হত্যা করতে থাকবে বা দূতাবাস জ্বালাবে। একমাত্র যখন তারা ১৪০০ বছর আগে মৃত একজন মানুষের "সম্মানের" চেয়ে বর্তমান দিনে

মানবাধিকার এবং স্বাধীনতাকে বেশী সম্মান জানাবে, তাদের মধ্যে চিন্তা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হবে, সে যতই কঠোর এবং অন্যায্য হোক, তখনই তারা তাদের কাঙ্খিত সম্মান অর্জন করবে। এজন্যই ইসলামি বিশ্বের মধ্যে কোন ইসলামি মার্টিন লুথার কিং এর প্রয়োজন নেই, সংস্কারকে উজ্জীবিত করার জন্য ইসলামের প্রয়োজন তার নিজের ইরাসমাস, ভলতেয়ার বা শার্লি এবদো।

শেষকথা

ইসলামপন্থা এবং শেষ যুদ্ধ

সমাজবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে আর্নেস্ট গেলনার (Ernest Gellner) এবং ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) ইসলামপন্থী আন্দোলনকে দেখতে চান আজকের ইসলামি বিশ্বের অংশীদারীত্বের উৎস হিসাবে, অনেকটা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদীরা যেমন ছিল। আমি একমত নই। ইসলামপন্থা কখনই আত্মপরিচিতির উৎস ছিল না—এ শুধুমাত্র একটা ক্রাচের মত। ইসলামপন্থীদের একে প্রয়োজন একটা সহায়ক হিসাবে, এবং তারা এটাকে ব্যবহার করে অস্ত্র হিসাবে। ইসলামপন্থীদের সামগ্রিক অবস্থা যেন একজন স্থবির বৃদ্ধের মতো, যে তার লাঠিটা বিপজ্জনকভাবে চারিদিকে ঘোরাচ্ছে। এর অনুসারীদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুধু দুর্বলতা প্রকাশ করে, শক্তি নয়; যেন জনহীন জায়গায় একা দুর্বার ক্রোধের প্রকাশ। এতদসত্ত্বেও, দুর্বলতাই ইসলামপন্থীদের আরও বেশী বিপজ্জনক করে তুলেছে।

জার্মান জাতি এবং ইতালীয়দের (প্রথম অধ্যায় দেখুন) ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ প্রকাশ পেয়েছিল এক “আমরা বনাম পৃথিবী” সময়ে; দেশ দু’টি আটকা পড়ে গিয়েছিল তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং পৃথিবীর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে। বর্তমানে, সারা পৃথিবীর মুসলমানরা ঠিক তেমনই বাস্তব জীবন এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের দাবির দোটানায় আটকে গেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই একই অসামঞ্জস্য গোটা পৃথিবীকে দু’বার বিশাল বিপর্যয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল যার ফলশ্রুতি ইসলামি ফ্যাসিবাদের উত্থান, যা আজ তার অসংখ্য সমর্থকের জন্য অহঙ্কার করে। তবে ফ্যাসিবাদ যে ধরণেরই হোক, যত বৈচিত্রপূর্ণ বা ভয়ঙ্করই হোক তাতে কিছু যায় আসে না, শেষ পর্যন্ত তা একটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ দর্শন।

ফ্যাসিবাদের উত্থানের জন্য উপযোগী পরিমণ্ডল বা যারা তাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করে; কোনটাই চিরস্থায়ী হতে পারে না। ফ্যাসিবাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন লাগাতার যুদ্ধের আগুন, মগজধোলাই করা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাসী অনুসারী, এবং অনিঃশেষ আত্মোৎসর্গ। ফ্যাসিবাদকে

পরাজিত করা যায় কি না, এটা কোন প্রশ্নই নয়, দিনশেষে সে পরাজিত হবেই। প্রশ্ন হলো তাকে হারাতে কত সময় লাগবে এবং তার শত্রুদের কতটা মূল্য দিতে হবে? যে সময়ে ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা যেত, তখনই মহাদেশটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিংসায় জড়িয়ে পড়ল, হারিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ প্রাণ। যুদ্ধে শুধু নগরগুলিই জঞ্জালে ভর্তি হয়নি, গোটা অঞ্চলই জঞ্জালে পরিণত হলো। যুদ্ধে বিজয়ীরা লাভ করল কয়েক দশক ব্যাপী ঠাণ্ডা লড়াই-এর অনিশ্চয়তা। ইসলামি বিশ্ব কি ঐ একই অবস্থা কোনভাবে এড়াতে পারবে? মুসলিম দেশগুলিতে কি আধুনিকীকরণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার জনগণ যদি কোন মূল্যই না দেয়, যে কঠিন এবং তিক্ত মূল্য পাশ্চাত্য জগৎ একসময় দিয়েছিল? এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যে কাজ তাদের করা উচিৎ ছিল তা করতে না পারার ব্যর্থ্যতার কোন কুফল হবে না? আমার গভীর সন্দেহ আছে।

মিশরে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টায় মুসলিম ব্রাদারহুড এখনকার মতো ব্যর্থ হতে পারে, তার অর্থ এই নয় যে অন্য সর্বত্র ইসলামপন্থা শেষ হয়ে গেছে এমন কি ব্রাদারহুডও শেষ হয়ে গেছে। এর সমর্থকরা অন্য সত্তরটি দেশে অত্যন্ত সক্রিয়, তাদের সংগঠন যথেষ্ট মজবুত এবং তার সাথে আছে কোটি কোটি ডলার। ইসলামি খলিফাতন্ত্রের পুনর্জন্ম ঘোষণা ক'রে, ইসলামিক স্টেট অতি দ্রুত সিরিয়া এবং ইরাককে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে—কিন্তু সেটা নামেই রাষ্ট্র, তার নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, নিয়মতান্ত্রিক সরকার নেই, পাশপোর্ট, মুদ্রা, বিদেশে দূতাবাস কিছুই নেই। মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামপন্থীদের পক্ষে এখন অনেক কঠিন হবে; যদিও একথাও সত্য যে, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে ইরাণে ইসলামি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আজও তা চলছে। ঠাণ্ডা লড়াই এবং পেট্রোডলারের বদৌলতে ইরানের শাসকবর্গ ইরানকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পেরেছে, আর অর্থনৈতিক অবরোধ যেন বিচ্ছিন্নতাবাদের এই শাসকীয় রক্ষণশীলতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে ওদের এই অবদমন এখন প্রচন্ড চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষতঃ যোগাযোগের নতুন সব মাধ্যম এবং বিশ্বায়নের অর্থনীতি স্বৈরাচারী শাসকবর্গ কর্তৃক তাদের সমাজকে বিদেশের এবং দেশের ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার যে চেষ্টা তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। ইন্টারনেটের সাহায্যে এক নতুন গ্লাসনস্ত ঘটতে চলেছে ক্ষমতাসীনদের

বজ্রকঠিন নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও (অথবা হয়ত সেই কারণেই)। আজ অথবা কাল তুর্কমেনিস্তান বা উত্তর কোরিয়ার মত দেশও আর নিজেদেরকে পর্দার আড়ালে রাখতে পারবে না।

সেপ্টেম্বর ২০১৩, বার্লিনে একটি সভা শুরুর আগে আমি ফ্রান্সিস ফুকুয়ামাকে "ইতিহাসের অবসান" (End of history) সম্পর্কে তার ধারণা জানতে চেয়েছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর, ফুকুয়ামা সমস্ত মতাদর্শের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শুধুমাত্র উদার গণতন্ত্রই হবে পৃথিবীর সমস্ত দেশের জন্য স্থায়ী উপায়। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম এটা ইসলামি মতাদর্শের প্রতি প্রযোজ্য কি না এবং ইসলামি সমাজ দ্রুত গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে কি না, ফুকুয়ামা বললেন অসংখ্য মুসলিম যুবকের হতাশা এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলির দরিদ্র অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে ইসলামপন্থার অবসান এখনও বহুদূরে। চীনের জনসংখ্যার বিপুল অংশ অর্থনৈতিক জোয়ারের কারণে বিরাট পরিমাণ লাভ করে এবং এখনও যথেষ্ট লোভনীয় বাজার অথচ ইসলামি রাষ্ট্রগুলি এখনও স্থবির হয়ে আছে। যদিও তিনি নিশ্চিতভাবে মনে করেন সেখানকার জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অবশ্যই পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা জানবে, অবাঞ্ছিত একনায়কদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে এবং হয়ত পদচ্যুত করবে। ফুকুয়ামা বললেন কিন্তু এ সবই শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, অর্থনৈতিক বা অন্য কোনভাবে। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও বিদ্রোহ বা সেনা অভ্যুত্থান হবে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সেই একই জায়গায় রয়ে যাবে। কিছু মৌলবাদী আরও উর্বর ক্ষেত্র পাওয়ার আশা করবে আরও মৌলবাদী তৈরীর জন্য।

ইসলামপন্থীরা হয়ত কোনদিনই জাতি-রাষ্ট্র গড়তে বা রক্ষা করতে পারবে না কিন্তু তারা এখনও ব্যর্থ রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শরীয়াকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, যেমন ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, এবং মালি। এই দেশগুলিতে তারা যদিও অর্ধ সক্রিয়, তবু সমাজকে ওরা শত্রু এবং মিত্র এ দু'ভাগে ভাগ করতে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ওরা ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের জনগণ সমস্যার সমাধানে মনোযোগ না দিয়ে শুধু ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কথাই বলে। মুসলমানদের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগের বয়স তিরিশের নীচে, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব বিশেষভাবে যুবকদের মধ্যে অতি দ্রুত, যাদের

কর্মশক্তি এবং ক্রোধ মৌলবাদের আগুনে নতুন জ্বালানি ঢালে। মনে হয় না তাদের প্রজন্মের ক্ষমতাকে অদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। সেই সাথে ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক ও শিক্ষাগত সমস্যাসমূহ তার সমাধানের ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতি সম্পন্ন।

মুসলিম দেশগুলিতে, যুবকদের প্রয়োজন মেটাতে বা তাদেরকে উন্নততর জীবন দিতে রাষ্ট্র ব্যর্থ। বর্তমানে, সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ, তাদেরকে অবদমিত করে রাখা হচ্ছে নিরাপত্তা রক্ষীদের সাহায্যে। এ সবই ইসলামপন্থীদের সপক্ষে যায়, তারা লাফ দিয়ে ওঠে দুর্বল শাসকগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য। ক্ষমতা দখল করার লোভ তাদের অতৃপ্ত, এ যেন পুরানো দিনের কর্মহীন লাভজনক পদকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। কারণ ইসলামপন্থীরা যখন এখানে সেখানে ছোটখাটো লড়াইয়ে সাহায্য করেছে, তাদের নজর কখনও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি: তা হলো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জয়, প্রয়োজনে শহীদ হওয়ার মাধ্যমে। ইসলামপন্থীরা বিশ্বাস করতে চায় না যে রাজনীতি অথবা অর্থনীতির মাধ্যমে তাদের সমাজের সংস্কার সম্ভব। তাদের দৃষ্টিতে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাতে, মানুষের হাতে নয়। তারা ভালো এবং মন্দের মধ্যে অন্তহীন যুদ্ধে বিশ্বাস করে, সেই সাথে অবশেষে ভালোরই হবে চূড়ান্ত বিজয়। তারা বিশ্বাস করে, একবার যদি পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং মানবজাতির সকলে ইসলাম কবুল করে, একমাত্র তখনই শান্তি এবং সমৃদ্ধি সম্ভব, এবং ততদিন পর্যন্ত, জিহাদ চলতেই থাকবে।

একই সাথে, অসংখ্য গোষ্ঠী এবং মতবাদ পরস্পর লড়াই করে রাজনৈতিকভাবে এবং ধর্মতাত্ত্বিকভাবে; ফলে মুসলিম ঐক্য নিছকই কল্পনা। মহম্মদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মুসলমানরা বাহাত্তরটা উপদলে ভেঙে যাবে, তার মধ্যে একাত্তরটি ভুল পথ অবলম্বন করে দোজখে যাবে, একটি মাত্র দল, যাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন, “প্রতিজ্ঞা পালনকারী”, ওরাই কেবল সত্যের পথে থাকবে। আজ প্রতিটি মুসলিম উপদল দাবি করে তারাই সত্য পথের পথিক, বাকী সবাইকে চিহ্নিত করে অবিশ্বাসী বলে। এটাই কারণ শিয়াদের প্রতি সুন্নীদের ঘৃণার, এবং আহমদিয়া, সুফী ও অ্যালেভিস্টদের প্রতি সুন্নীদের ঘৃণার। আবার সুন্নীদের নিজেদের মধ্যেই আছে অনেক ভাগ যারা দীর্ঘকাল ধরে

পরস্পরের শত্রু; যেমন সালাফি, মুসলিম ব্রাদারহুড, হাম্বলীপন্থী, মালিকীপন্থী, শাফিয়ীপন্থী, হানাফিপন্থী, এবং আশায়েরাপন্থী। এমনকি সিরিয়াতে যে জিহাদীরা আসাদের বিরোধিতা করে তারা একে অপরকে আক্রমণ করে। এই অসংখ্য উপদলের কামড়া কামড়ির কারণে ইউরোপে ইসলামি আক্রমণের ভয় নিতান্তই অমূলক—ভাল করে লক্ষ্য করুন, পাশ্চাত্যের উপর ধর্মীয় আক্রমণের চেয়ে মুসলমানরা অনেক বেশী ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে মারামারিতে। কোন ইসলাম সত্য এই প্রশ্নে তারা সাময়িক ভাবেও একমত হয় না। এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই তাদের শেষ সময়ের জন্য প্রস্তুত হতে দেয়নি।

৯/১১ এর এক দশক পর আল কায়েদা আর কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত নয়, এত বছরের "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" একে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে। ইসলামিক স্টেটের জঙ্গীদেরও শীঘ্রই এমন অবস্থা হবে। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ দলগুলি যদি বিলীন হয়ে যায়, ব্যক্তিভিত্তিক বিদ্রোহের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আল কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট উভয়েই এখন পরিচালিত হয় বিকেন্দ্রীকরণ সিস্টেমের মাধ্যমেই, কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য একই আছে: বায়ুনিরোধী একটি বদ্ধ বিশ্ব দর্শন দিয়ে ওরা যুবকদেরকে ঘৃণার বিষে বিষাক্ত করে ফেলে। আর এভাবেই ইসলামি মতাদর্শ পার্থিব অসন্তোষকে ধর্মীয় ক্রোধে ও পবিত্র ঘৃণায় রূপান্তরিত ক'রে তার শিকারদের অমানুষে পরিণত করে। ২০১৪-তে বস্টন ম্যারাথন বোমারু, সেই বছরের শেষে খবরের শিরোনামে আসা সিডনীর অপহরণকারী, এবং যে ঘাতকেরা শার্লি এবদোর সম্পাদকদের হত্যা করেছিল, এ সবই রাজনৈতিক ইসলামের ইতিহাসে পরবর্তী কাজের ভূমিকামাত্র। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভয়ঙ্কর অভিঘাত সৃষ্টির জন্য লোক সংগ্রহ, পৃথিবীময় যাতায়াত, বা কঠিন সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ; এ সবের কোন প্রয়োজনই নেই। বর্তমানে যে কেউ বোমা বানাতে চাইলে ইন্টারনেটে বিস্তারিত নির্দেশ পেয়ে যাবে, নিজেই বানিয়ে ফেলবে, এবং তার শহরেই পছন্দমত কোন আকাশছোঁয়া বাড়ী উড়িয়ে দেবে। জিহাদের জন্য এতকিছু জটিলতারও প্রয়োজন নেই, কারণ এর সৈন্যরা প্রকাশ্য রাস্তায় রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে "অবিশ্বাসীদের" শিরচ্ছেদ করতে সক্ষম, অথবা তাদের অপহরণ করতে। যুবক মুসলিমরা ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে নিজেরাই পরিকল্পনা স্থির

করতে পারে আল কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটের কোন আদেশ ব্যতিরেকেই।

যে সব সন্ত্রাসবাদী একা অথবা ছোট ছোট দলে কাজ করে, প্রায়শই তারা নিজ উদ্যোগে করে, আপাদমস্তক প্রশিক্ষিত জিহাদীদের নিখুঁত নৈপুণ্য তাদের নেই, কিন্তু তারা এবং তাদের সৃষ্ট আতঙ্ক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা নিহতের সংখ্যা নিয়ে ততটা আগ্রহী নয়, তারা আগ্রহী কতটা সংবাদ-মাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল এবং তাদের আক্রমণে কতটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। ইসলামি খিলাফতের অবাস্তব স্বপ্ন যত স্পষ্ট হবে, ইরাক এবং সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেটের উপর যত চাপ বাড়বে; ততই পাশ্চাত্য তার নিজের ঘরে এদের উপর সহানুভূতিশীলদের কাজকর্মের মোকাবিলা করতে বাধ্য হবে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে ইসলামিক স্টেট এবং তার প্রধান চরিত্রদের উপর, সে কারণে "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" সিডনীর অপহরণকারীর মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়ে মাথা ঘামায় না। (ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪, মান মনিস (Man Monis) নামে এক ইরাণী সন্ত্রাসবাদী অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর কেন্দ্রে লিণ্ড চকোলেট কাফেতে (Lindt chocolate café) ঝড়ের মত ঢুকে সতেরো জনকে পণবন্দী করে। ষোল ঘন্টা পর ঘটনার নিষ্পত্তি হয় অস্ট্রেলিয়ান স্পেশাল ফোর্স কাফেতে ঢুকে পণবন্দীদের মুক্ত করার পর। সন্ত্রাসবাদী এবং দু'জন বন্দী নিহত হয়।) এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত?

গোয়েন্দা সংস্থাগুলি পরিকল্পিত সন্ত্রাসী আক্রমণকে কষ্ট করে হলেও চিহ্নিত করতে পারে, যেখানে একাধিক লোক জড়িত থাকে দেশে এবং বিদেশে। কিন্তু একক নেকড়েদের (লোন উলফ) খুঁজে বের করা নিরাপত্তাকর্মীদের পক্ষে কঠিন কাজ। কারণ তারা ঘটনা ঘটায় তাৎক্ষণিকভাবে, অন্য কাউকেই তাদের পরিকল্পনার কথা জানায় না। জিহাদে এখন আর কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই, এর পদ্ধতি-প্রকরণ ধীরে ধীরে আরও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কায়রোতে আমার দেখা হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং প্রাক্তন মুসলিম ব্রাদারহুড সদস্য মোহামেদ আবদেল রসুল (Mohamed Abdel Rasoul)-এর সাথে, যিনি এক দশকেরও বেশী ঐ দলের সাথে ছিলেন।

সেই সময়ে এর সমস্ত নথি এবং কর্মপদ্ধতি তিনি পড়েছেন। তার মতে, ব্রাদারহুডের জাতি-রাষ্ট্র পরিচালনার কোন ধারণাই নেই, পরিবর্তে তারা শুধু তাদের শত্রুদের সাথে শেষ যুদ্ধের কথাই ভাবে। আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখনও ব্রাদারহুড মিশরের ক্ষমতায়। তবুও তিনি আমাকে বললেন, "রাজনৈতিকভাবে তারা ব্যর্থ হবেই। তারপর তারা আবার ফিরে যাবে সন্ত্রাসবাদে, কারণ ওটাই তারা খুব ভাল বোঝে। তারা একটা যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হবে সমস্ত যুদ্ধ শেষ করার জন্য, শুধু মিশরে নয়, সারা পৃথিবীতে। অনেকেই মনোযোগ দিয়ে সেই ডাক শুনবে—কিন্তু তাদের জয়ের জন্য তা অবশ্যই যথেষ্ট হবে না, কিন্তু সারা পৃথিবীকে বেশ কয়েক বছরের জন্য সন্ত্রাসে ডুবিয়ে রাখতে যথেষ্ট। এটা কখনই সহজ ছিল না কোন মুসলিম যুবককে বোঝানো যে, আত্মঘাতী আক্রমণই তার জীবনের সবথেকে ভাল কাজ"।

সিরিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, লেবানন, এবং ইয়েমেনে সংঘর্ষ; উপসাগরীয় দেশগুলিতে মৌলবাদের বৃদ্ধি; এবং সৌদি-ইরাণ ধর্মীয় উত্তেজনার নয়া উত্থান—এ সবই ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে মৌলবাদের তাজা ঢেউয়ের যা আগের থেকে অনেক বেশী তীব্র হবে। এই সংঘর্ষ শুধুমাত্র ইসলামি বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েনি, এর বিস্তৃতি ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত, যার ফলে সেখানে মৌলবাদের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠা অবশ্যম্ভাবী। আবদেল রসুল আমাকে বললেন, তিনি ভেবেছিলেন পশ্চিমের ইসলামপন্থীদের কাজ আগের থেকে অনেক সহজ হয়ে যাবে। কারণ তারা অবাধে সংগঠন মজবুত করতে পারে, লোক সংগ্রহ করতে পারে, পুলিস-রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বে যেতে হয় না, এমন কি আর্থিক সমস্যাও নেই। যাদের চাকরী নেই তারা রাষ্ট্রের সাহায্য পায়, মৌলবাদী দলগুলি উপসাগরীয় দেশ থেকে মুক্তহস্তে দান পায়।

ফুকুয়ামা এবং আবদেল রসুল উভয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে আদর্শের মৃত্যু ইসলামধর্ম পর্যন্ত পৌঁছাবে কি না, অন্তত অদূর ভবিষ্যতে। ইসলামি রাষ্ট্রগুলির ব্যর্থতা এর একটা কারণ, কিন্তু এটাই কি একমাত্র বিবেচ্য বিষয়?

জার্মানীতে নাৎসীবাদ পরাজিত হয়েছিল বারো বছর ক্ষমতায় থাকার পর। অন্যত্র, কমিউনিজম বেঁচে ছিল বাহাত্তর বছর। অপরদিকে, বহুবার

পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামপন্থা নতুন এলাকা এবং অনুসারী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা করতে সমর্থ হয়েছে কারণ তারা দাবি করে তাদের লক্ষ্য স্বর্গীয়, সেই সাথে বহু মুসলিম মনে করে সেই লক্ষ্য অর্জন তাদের অবশ্যকর্তব্য। উপরন্তু বহির্জগতের চাপ জার্মানী এবং জাপানে ফ্যাসিবাদকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল। উভয় রাষ্ট্রই নৈতিক ও সামরিক পরাজয় মেনে নিয়েছিল এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছিল। কাজটা এতই কষ্টসাধ্য ছিল যে, জার্মানীর জনগণ তাদের বিচার করার জন্য মিত্রশক্তিকে দোষারোপ করেনি। এমন কি ড্রেসডেন, মিউনিখ, হামবুর্গ এবং বার্লিনকে শত্রু বোমারুরা ধ্বংস করে ধোঁয়ায় পরিণত করলেও শত্রুদের দানব রূপে দেখার প্ররোচনা তারা দমন করেছিল। তারা ধীরে ধীরে অনুভব করেছিল যে নাৎসীরা যে যুদ্ধ শুরু করেছিল তা ছিল অন্যায়। এমনকি হিরোসিমা এবং নাগাসাকি, যেখানে আরও অনেক বড় ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিল সেখানেও কেউ প্রতিশোধের কথায় কর্ণপাত করেনি।

কিছু জার্মান প্রথম থেকেই ভয়ঙ্করভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নাৎসি ছিল, অন্যেরা একনায়ক শাসনে দ্রুত সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে পরে যোগ দেয় বা শুধুই নতুন ব্যবস্থার সাথে শান্তিতে মিলে থাকার জন্য আপোষ করে নেয়। একমাত্র যখন নাৎসী শাসনের হিংস্রতার প্রতি নিন্দা হিটলার এবং তার ঘনিষ্ঠদেরকেও ছাপিয়ে গেল তখন জার্মানরা তাদের নিজের দোষ বুঝতে পারল—বুঝতে পারল ফ্যাসিবাদী মানসিকতা জেঁকে বসেছে এবং তার বিকৃত বর্ণবাদী মতবাদ এবং মানবতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী তাদের সমাজকে মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। এই আত্ম-সমীক্ষা ঘটেছিল ধীরে এবং হয়ত সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নয়, কিন্তু ঘটেছিল। এখানেও আর একবার ইসলামপন্থীরা আলাদা: আজ পর্যন্ত সামরিক বা নৈতিক পরাজয়, ভিতরের এবং বাইরের চাপ তার অনুসারীদের বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামপন্থীদের নিজেদের ধারণাকে প্রশ্ন করার কোন কারণই নেই কারণ তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে দোষ সব সময়েই অন্যের।

মিশরের ইতিহাসে মুসলিম ব্রাদারহুড তিনবার নিষিদ্ধ হয়েছে—১৯৪০ এ, ১৯৫০ এ, এবং সাম্প্রতিককালে ২০১৩ সালে—তবু যে মানসিকতা থেকে এর জন্ম তা কখনও বিনষ্ট হয়নি, যা আজ পর্যন্ত মিশরের সমস্ত স্কুলপাঠ্য বইতে আছে। ইসলামের পবিত্রতাই সেই পিছনের দরজা যার

মাধ্যমে সে বারবার সমাজের কেন্দ্রে ফিরে এসেছে। জিহাদের আকাঙ্খা এক স্বর্গীয় লক্ষ্য, ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন, এবং অবিশ্বাসীরা পশুর চেয়েও ইতর প্রাণী—এর সবগুলিই ইসলামি দেশগুলিতে শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতিহাসের বাছাইকরা পছন্দসই অংশে বিশ্বাস, কল্পিত শত্রুর প্রতি মনগড়া ভয়, এবং এক বিশ্বাস যে মুসলমানরাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; এই মনোভাবগুলিই সন্ত্রাসের ভিত্তি।

যদিও বহু মুসলমান সালাফি এবং মুসলিম ব্রাদারহুড উভয়েরই বিরোধিতা করে, তবুও তারা ইসলামিক স্টেটের ধারণার সাথে যোগসূত্র নষ্ট করতে অনিচ্ছুক। কারণ তারা মনে করে ধারণাটি ভাল কিন্তু প্রয়োগের ভুলে ব্যর্থ হয়ে গেছে। অনেকে ইসলামপন্থার মানসিকতা এবং ইসলামের দাবিগুলির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পান। তারা গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করতে দারুণ আগ্রহী, কিন্তু সেই গণতন্ত্র হবে ইসলামসৃষ্ট। যা রাজনৈতিকভাবে ইঞ্জিনবিহীন মার্সিডিজের সমতুল্য, যাকে টানে দু'টো গাধা। এই ধরণের স্ব-বিভ্রান্ত মনোভাব সবসময়েই ইসলামপন্থাকে পুনরুদ্দীপ্ত হতে সাহায্য করেছে। বার বার নতুন বোতলে পুরানো মদ ঢালা হয়, ফলে বর্তমানের ইসলামপন্থীদের অবসান বহুদূরে।

গণতন্ত্র বা আধুনিকীকরণ কোনটাই জাপানে সফল হয়নি যতদিন না সেখানকার জনগণ তাদের সম্রাটকে উচ্চাসন থেকে টেনে মাটিতে নামিয়েছে, তাকে একজন সাধারণ মানুষে পরিণত করেছে। তার আগে অর্থহীন যুদ্ধে জড়িয়ে "Tennoheika Banzai!" উচ্চারণ করে বহু আত্মঘাতী পাইলট তার জন্য জীবন দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বের খুব কম মানুষই পৃথিবীতে আল্লাহর শাসনকে পুনর্মূল্যায়ন করতে সাহস করবে, তাহলে সে নিজেই তার পতন ডেকে আনবে। বহু মুসলমান বুঝতেই পারে না যে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র, আকাশ থেকে নেমে আসা আদেশের মাধ্যমে মানবতার ধারণার সাথে একাসনে বসতেই পারে না। অনেকেই আজও মানতে পারে না কারো কাজ তার বিশ্বাসের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ; এবং কোন আদর্শই হত্যার জন্য উপযুক্ত নয়, নিজের মৃত্যুর জন্য তো নয়ই।

লেখক সম্পর্কে

হামেদ আবদেল-সামাদ একজন জার্মান-মিশরীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং লেখক। তিনি কায়রোর আইন শামস ইউনিভার্সিটিতে (Ain Shams University) ইংরাজী এবং ফরাসী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন, জার্মানীর আঙউষবার্গ ইউনিভার্সিটিতে পাঠ নেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং জাপানের কোয়ানসেই গাকুইন ইউনিভার্সিটিতে (Kwansei Gakuin University) শেখেন জাপানী ভাষা। তিনি আরবের শিক্ষা বিষয়ে UNESCO-র প্রাক্তন পরামর্শদাতা। মিশরীয় শহর গিজা-র (Giza) একজন সুন্নী ইমামের পুত্র, তিনি এখন ইসলামের তীব্রতম সমালোচক। তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয় জার্মান জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে, যেমন Dai Zeit, Die Welt, এবং Cicero.

আবদেল-সামাদের পাঁচটি বইয়ের সবকটিই জার্মানীতে উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আরব বসন্তের কয়েক মাস আগে প্রকাশিত তাঁর বই "ইসলামি বিশ্বের অবসান" (The end of the Islamic World) বিক্রী হয়েছিল আশি হাজার কপিরও বেশী। সেখানে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বহু রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং গৃহযুদ্ধের, যা এখন আরব বিশ্বকে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করেছে। "ইসলামি ফ্যাসিবাদ" (Islamic Fascism) আর একটি বহুবিক্রীত বই। আবদেল-সামাদ জার্মান-ভাষী এলাকায় প্রায়ই সংবাদ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেন। তাঁর বই এখনও পর্যন্ত ছ'টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

জুন, ২০১৩ তে কায়রোতে ইসলামি ফ্যাসিবাদের উপর তিনি একটি বক্তৃতা দেন। তিনজন বিশিষ্ট মিশরীয় ধর্মপ্রচারক আবদেল-সামাদের মৃত্যু চেয়ে ফতোয়া জারী করেন। তাদের দাবি, তাঁর বক্তব্য ইসলাম এবং তার নবীকে অসম্মান করেছে।

Table of Contents

টাইটেল
প্রকাশনা তথ্য
Disclaimer
উৎসর্গ
অনুবাদকের অনুভূতি
ভূমিকা: মৃত্যু চাই
প্রথম অধ্যায় - বিসদৃশ জুটি ? সাম্প্রতিক ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ এবং ইসলামপন্থা
দ্বিতীয় অধ্যায় - সংস্কারবাদী নাকি ফ্যাসিবাদী ইসলামপন্থী? মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড
তৃতীয় অধ্যায় - ইসলামি ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক আদিকথা, আব্রাহাম থেকে সাইয়্যেদ কুতব
চতুর্থ অধ্যায় - আমার লড়াই থেকে (মাইন কাম্ফ) থেকে আমাদের লড়াই—আরব এবং ইহুদী-বিদ্বেষ
পঞ্চম অধ্যায় - গুটেনবার্গ থেকে জুকেরবার্গ—সাংস্কৃতিক একাধিপত্য এবং ইসলামের একনায়কতন্ত্র
ষষ্ঠ অধ্যায় - “ওসামা দীর্ঘজীবী হোক!”- ব্যর্থ রাষ্ট্র এবং সফল সন্ত্রাসবাদীরা
সপ্তম অধ্যায় - পর্ণোটোপিয়া—জিহাদ এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি
অষ্টম অধ্যায় - ইসলামি বোমা এবং শিয়া ফ্যাসিবাদ
নবম অধ্যায় - অবিশ্বাসীরা এগিয়ে আসছে—ইসলামি বিশ্বের পাঁচজন নাস্তিকের কথা
দশম অধ্যায় - সালাফি, জিহাদি এবং ইউরোপে ইসলামি ফ্যাসিবাদ
একাদশ অধ্যায় - মেরুকরণ এবং সামাজিক শোধন—থিলো সারাজিন এবং রিসেপ তাইপ এরদোগান, উভয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
দ্বাদশ অধ্যায় - সন্ত্রাসী এলাকার মানচিত্র—ইসলামপন্থা, ইসলাম এবং ইসলামি রাষ্ট্র
ত্রয়োদশ অধ্যায় - শার্লি এবদো এবং ইসলামের ভয়ানক ক্রোধ
শেষকথা: ইসলামপন্থা এবং শেষের খেলা
লেখক পরিচিতি

সংশয়

চিন্তার মুক্তির আন্দোলন

“ইসলামিক ফ্যাসিজম” গ্রন্থটি সংশয় ডট কম থেকে প্রকাশিত একটি অনুবাদ গ্রন্থ, যা সমসাময়িক ধর্মীয় মৌলবাদ, কর্তৃত্ববাদ এবং রাজনৈতিক ইসলামের প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে। সংশয় ডট কম দীর্ঘদিন ধরে মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিনির্ভর আলোচনা প্রচারের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। তারি ধারাবাহিকতায় এই বইটির প্রকাশনা।

আমাদের পাঠকদের প্রতি অনুরোধ—সংশয় ডট কমের অন্যান্য প্রবন্ধ ও বিশ্লেষণ পড়ুন, সমালোচনা করুন, চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করুন এবং যুক্তিবাদী আলোচনার অংশ হয়ে উঠুন। এছাড়া, এই বই ও সংশয়ের লেখাগুলো অনলাইনে শেয়ার করে মুক্তচিন্তার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখুন।

আপনার অংশগ্রহণ আমাদের মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে। যুক্ত থাকুন, প্রশ্ন তুলুন, মুক্তচিন্তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান!

ওয়েবসাইট: shongshoy.com

জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, যুক্তি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব